PART- 05

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

আত্ তাওবা

৯

নামকরণ

এ সূরাটি দু'টি নামে পরিচিত ঃ আত্ তাওবাহ ও আল বারাআতু। তাওবা নামকরণের কারণ, এ সূরার এক জায়গায় কতিপয় ঈমানদারের গোনাহ মাফ করার কথা বলা হয়েছে। আর এর শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে বলে একে বারাআত (অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ

এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম লেখা হয় না। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু মতভেদ ঘটেছে। তবে এ প্রসংগে ইমাম রাযীর বক্তব্যটিই সঠিক। তিনি লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখাননি, কাজেই সাহাবায়ে কেরামও লেখেননি এবং পরবর্তী লোকেরাও এ রীতির অনুসরণ অব্যাহত রেখেছেন। পবিত্র কুরআন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হুবহু ও সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যেভাবে তিনি দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তাকে সংরক্ষণ করার জন্য যে সর্বোচ্চ পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, এটি তার আর একটি প্রমাণ।

নাযিলের সময়-কাল ও সূরার অংশসমূহ

এ সূরাটি তিনটি ভাষণের সমষ্টি। প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম রুকূ'র শেষ অবধি চলেছে। এর নাযিলের সময় হচ্ছে ৯ হিজরীর যিলকাদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে বছর হযরত আবু বকরকে (রা) আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কায় রওয়ানা দিয়েছিলেন। এমন সময় এ ভাষণটি নাযিল হয়। তিনি সংগে সংগেই হযরত আলীকে (রা) তাঁর পিছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে হজ্জের সময় সারা আরবের প্রতিনিধিত্বশীল সমাবেশে তা শুনানো হয় এবং সে অনুযায়ী যে কর্মপদ্ধতি নির্দেশিত হয়েছিল তা ঘোষণা করা যায়।

দ্বিতীয় ভাষণটি ৬ রুকূ'র শুরু থেকে ৯ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটি ৯ হিজরীর রজব মাসে বা তার কিছু আগে নাযিল হয়। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে মুমিনদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর যারা মুনাফিকী বা দুর্বল ঈমান অথবা কুড়েমি ও অলসতার কারণে আল্লাহর পথে

ধন-প্রাণের ক্ষতি বরদাশত করার ব্যাপারে টালবাহানা করছিল তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণটি ১০ রুকূ' থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর এ অংশটি নাযিল হয়। এর মধ্যে এমনও অনেকগুলো খণ্ডিত অংশ রয়েছে যেগুলো ঐ দিনগুলোতে বিভিন্ন পরিবেশে নাযিল হয় এবং পরে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ইংগিতে সেগুলো সব একত্র করে একই ধারাবাহিক ভাষণের সাথে সংযুক্ত করে দেন। কিন্তু যেহেতু সেগুলো একই বিষয়বস্তু ও একই ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট তাই ভাষণের ধারাবাহিকতা কোথাও ব্যাহত হতে দেখা যায় না। এখানে মুনাফিকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হয়েছে। আর যে সাচ্চা ঈমানদার লোকেরা নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ছিলেন ঠিকই কিন্তু আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন তিরস্কার করার সাথে সাথে তাদের ক্ষমার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আয়াতগুলো যে পর্যায়ক্রমিক ধারায় নাযিল হয়েছে তার প্রেক্ষিতে প্রথম ভাষণটি সবশেষে বসানো উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিক দিয়ে সেটিই ছিল সবার আগে। এ জন্য কিতাব আকারে সাজাবার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রথমে রাখেন এবং অন্য ভাষণ দু'টিকে তার পরে রাখেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিলের সময়-কাল নির্ধারিত হবার পর এ সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর একটু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এ সূরার বিষয়বস্তুর সাথে যে ঘটনা পরম্পরার সম্পর্ক রয়েছে, তার সূত্রপাত ঘটেছে হোদাইবিয়ার সন্ধি থেকে। হোদাইবিয়া পর্যন্ত ছ' বছরের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফলে আরবের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকায় ইসলাম একটি সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ সমাজের ধর্ম, একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। হোদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর এ ধর্ম বা দীন আরো বেশী নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে চারদিকে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পেয়ে যায়।[১] এরপর ঘটনার গতিধারা দু'টি বড় বড় খাতে প্রবাহিত হয়। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে ঐ দু'টি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে একটির সম্পর্ক ছিল আরবের সাথে এবং অন্যটির রোম সাম্রাজ্যের সাথে।

আরব বিজয়

হোদাইবিয়ার সন্ধির পর আরবে ইসলামের প্রচার, প্রসারের জন্য এবং ইসলামী শক্তি সুসংহত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তার ফলে মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ইসলামের প্রভাব বলয় এত বেড়ে যায় এবং তার শক্তি এতটা পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী

১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা মায়েদা ও সূরা ফাত্হ-এর ভূমিকা।

হয়ে ওঠে যে, পুরাতন জাহেলিয়াত তার মোকাবিলায় অসহায় ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অবশেষে কুরাইশদের অতি উৎসাহী লোকেরা নিজেদের পরাজয় আসন্ন দেখে আর সংযত থাকতে পারেনি। তারা হোদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে। এ সন্ধির বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ চুক্তি ভংগের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আর গুছিয়ে নেবার কোন সুযোগ দেননি। তিনি ৮ হিজরীর রমযান মাসে আকস্মিকভাবে মক্কা আক্রমণ করে তা দখল করে নেন।[১] এরপর প্রাচীন জাহেলী শক্তি হোনায়েনের ময়দানে তাদের শেষ মরণকামড় দিতে চেষ্টা করে। সেখানে হাওয়াযিন, সাকীফ, নদর, জুসাম এবং অন্যান্য কতিপয় জাহেলিয়াতপন্থী গোত্র তাদের পূর্ণ শক্তির সমাবেশ ঘটায়। এভাবে তারা মক্কা বিজয়ের পর যে সংস্কারমূলক বিপ্লবটি পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তার পথ রোধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। হোনায়েন যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের সাথে সাথেই আরবের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যায়। আর এ ফায়সালা হচ্ছে, আরবকে এখন দারুল ইসলাম হিসেবেই টিকে থাকতে হবে। এ ঘটনার পর পুরো এক বছর যেতে না যেতেই আরবের বেশীর ভাগ এলাকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। এ অবস্থায় জাহেলী ব্যবস্থার শুধুমাত্র কতিপয় বিচ্ছিন্ন লোক দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সে সময়ে যেসব ঘটনা ঘটে চলছিল তা ইসলামের এ সম্প্রসারণ ও বিজয়কে পূর্ণতায় পৌঁছুতে আরো বেশী করে সাহায্য করে। সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুঃসাহসিকতার সাথে ৩০ হাজারের বিরাট বাহিনী নিয়ে যান এবং রোমীয়রা যেভাবে তাঁর মুখোমুখি হবার ঝুঁকি না নিয়ে পিঠটান দিয়ে নিজেদের দুর্বলতার প্রকাশ ঘটায় তাতে সারা আরবে তাঁর ও তাঁর দীনের অপ্রতিরোধ্য প্রতাপ ও অজেয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে তাবুক থেকে ফিরে আসার সাথে সাথেই তাঁর কাছে একের পর এক প্রতিনিধি দল আসতে থাকে আরবের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁর বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করে।[২] এ অবস্থাটিকেই কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا

"যখন আল্লাহর সাহায্য এসে গেলো ও বিজয় লাভ হলো এবং তুমি দেখলে লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে।"

তাবুক অভিযান

মক্কা বিজয়ের আগেই রোম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হোদাইবিয়ার সন্ধির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে

১. সূরা আনফালের ৪৩ টীকা দেখুন।

২. মুহাদ্দিসগণ এ প্রসংগে যেসব গোত্র, সরদার, আমীর ও বাদশাহদের প্রতিনিধি দলের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌঁছে। এরা আরবের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম সব এলাকা থেকেই এসেছিল।

আরবের বিভিন্ন অংশে যেসব প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি দল গিয়েছিল উত্তর দিকে সিরিয়া সীমান্তের লাগোয়া গোত্রগুলোর মধ্যে। তাদের বেশীর ভাগ ছিল খৃষ্টান এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। তারা 'যাতুত্ তালাহ' (অথবা যাতু–আত্‌লাহ) নামক স্থানে ১৫ জন মুসলমানকে হত্যা করে। কেবলমাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা হযরত কা'ব ইবনে উমাইর গিফারী প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। একই সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুসরার গবর্ণর শুরাহ্‌বীল ইবনে 'আমরের নামেও দাওয়াত নামা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেও তাঁর দূত হারেস ইবনে উমাইরকে হত্যা করে। এ সরদারও ছিল খৃষ্টান এবং সরাসরি রোমের কাইসারের হুকুমের অনুগত। এসব কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৮ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে তিন হাজার মুজাহিদদের একটি সেনাবাহিনী সিরিয়া সীমান্তের দিকে পাঠান। ভবিষ্যতে এ এলাকাটি যাতে মুসলমানদের জন্য নিরাপদ হয়ে যায় এবং এখানকার লোকেরা মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে তাদের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার সাহস না করে, এ–ই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ সেনাদলটি মা'আন নামক স্থানের কাছে পৌঁছার পর জানা যায়, শুরাহবীল ইবনে আমর এক লাখ সেনার একটি বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় আসছে। ওদিকে রোমের কাইসার হিম্‌স নামক স্থানে সশরীরে উপস্থিত। তিনি নিজের ভাই থিয়োডরের নেতৃত্বে আরো এক লাখের একটি সেনাবাহিনী রওয়ানা করে দেন। কিন্তু এসব আতংকজনক খবরাখবর পাওয়ার পরও তিন হাজারের এ প্রাণোৎসর্গী ছোট্ট মুজাহিদ বাহিনীটি অগ্রসর হতেই থাকে। অবশেষে তারা মুতা নামক স্থানে শুরাহবীলের এক লাখের বিরাট বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ অসম সাহসিকতা দেখানোর ফলে মুসলিম মুজাহিদদের পিষ্ট হয়ে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সারা আরব দেশ এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলো যে, এক ও তেত্রিশের এ মোকাবিলায়ও কাফেররা মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হতে পারলো না। এ জিনিসটিই সিরিয়া ও তার সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী আধা স্বাধীন আরব গোত্রগুলোকে এমনকি ইরাকের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী পারস্য সম্রাটের প্রভাবাধীন নজ্‌দী গোত্রগুলোকেও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। তাদের হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে। বনী সুলাইম (আব্বাস ইবনে মিরদাস সুলামী ছিলেন তাদের সরদার), আশজা, গাত্‌ফান, যুবৃইয়ান ও ফাযারাহ গোত্রের লোকেরা এ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময়ই রোম সাম্রাজ্যের আরবীয় সৈন্য দলের একজন সেনাপতি ফারওয়া ইবনে আমর আলজুযামী মুসলমান হন। তিনি নিজের ঈমানের এমন অকাট্য প্রমাণ পেশ করেন, যা দেখে আশেপাশের সব এলাকার লোকেরা বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে পড়ে। ফারওয়ার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে কাইসার তাঁকে গ্রেফতার করিয়ে নিজের দরবারে আনেন। তাঁকে দু'টি জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেন। তাঁকে বলেন, ইসলাম ত্যাগ করো। তাহলে তোমাকে শুধু মুক্তিই দেয়া হবে না বরং আগের পদমর্যাদাও বহাল করে দেয়া হবে। অথবা মুসলমান থাকো। কিন্তু এর ফলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তিনি ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করে ইসলামকে নির্বাচিত করেন এবং সত্যের পথে প্রাণ বিসর্জন দেন। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে কাইসার তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উদ্ভূত এক ভয়াবহ 'হুমকির' স্বরূপ উপলব্ধি করেন, যা আরবের মাটিতে সৃষ্ট হয়ে তার সাম্রাজ্যের দিকে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

তাবুক যুদ্ধকালীন অবস্থায় আরবের চিত্র
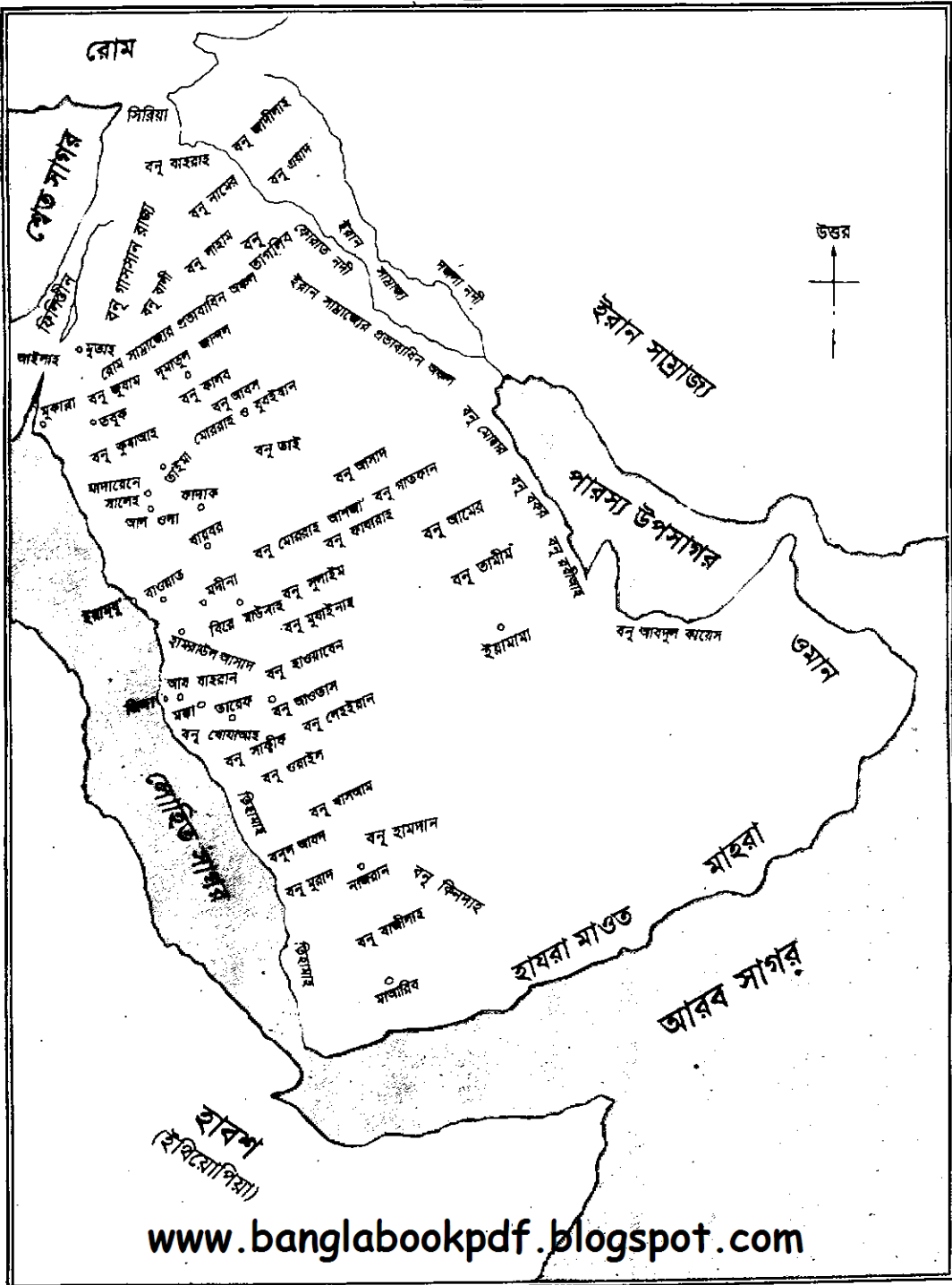
পরের বছর কাইসার মুসলমানদের মুতা যুদ্ধের শাস্তি দেবার জন্য সিরিয়া সীমান্তে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তার অধীনে গাস্সানী ও অন্যান্য আরব সরদাররা সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে বেখবর ছিলেন না। একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ যেসব ব্যাপার ইসলামী আন্দোলনের ওপর সামান্যতমও অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তিনি সর্বক্ষণ সচেতন ও সতর্ক থাকতেন। এ প্রস্তুতিগুলোর অর্থ তিনি সংগে সংগেই বুঝে ফেলেন। কোন প্রকার ইতস্তত না করেই কাইসারের বিশাল বিপুল শক্তির সাথে তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ফায়সালা করে ফেলেন। এ সময় সামান্যতমও দুর্বলতা দেখানো হলে এতদিনকার সমস্ত মেহনত ও কাজ বরবাদ হয়ে যেতো। একদিকে হোনায়েনে আরবের যে ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু জাহেলিয়াতের বুকে সর্বশেষ আঘাত হানা হয়েছিল তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো এবং অন্যদিকে মদীনার যে মুনাফিকরা আবু আমের রাহেবের মধ্যস্থতায় গাসসানের খ্রীস্টান বাদশাহ এবং স্বয়ং কাইসারের সাথে গোপন যোগসাজশে লিপ্ত হয়েছিল। উপরন্তু যারা নিজেদের দুষ্কর্মের ওপর দীনদারীর প্রলেপ লাগাবার জন্য মদীনার সংলগ্ন এলাকায় "মসজিদে দ্বিরার" (ইসলামী মিল্লাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরী মসজিদ) নির্মাণ করেছিল, তারা পিঠে ছুরি বসিয়ে দিতো। সামনের দিক থেকে কাইসার আক্রমণ করতে আসছিল। ইরানীদের পরাজিত করার পর দূরের ও কাছের সব এলাকায় তার দোর্দণ্ড প্রতাপ ও দাপট ছড়িয়ে পড়েছিল। এ তিনটি ভয়ংকর বিপদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইসলামের অর্জিত বিজয় অকস্মাত পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারতো। তাই, যদিও দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল, আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম, ফসল পাকার সময় কাছে এসে গিয়েছিল, সওয়ারী ও সাজ–সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। অর্থের অভাব ছিল প্রকট এবং দুনিয়ার দু'টি বৃহত্তম শক্তির একটির মোকাবিলা করতে হচ্ছিল ; তবুও আল্লাহর নবী এটাকে সত্যের দাওয়াতের জন্য জীবন–মৃত্যুর ফায়সালা করার সময় মনে করে এ অবস্থায়ই যুদ্ধ প্রস্তুতির সাধারণ ঘোষণা জারি করে দেন। এর আগের সমস্ত যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাউকে বলতেন না কোন্‌দিকে যাবেন এবং কার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। বরং মদীনা থেকে বের হবার পরও অভীষ্ট মনযিলের দিকে যাবার সোজা পথ না ধরে তিনি অন্য বাঁকা পথ ধরতেন। কিন্তু এবার তিনি এ আবরণটুকুও রাখলেন না। এবার পরিষ্কার বলে দিলেন যে, রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং সিরিয়ার দিকে যেতে হবে।

এ সময়টি যে অত্যন্ত নাজুক ছিল তা আরবের সবাই অনুভব করছিল। প্রাচীন জাহেলিয়াতের প্রেমিকদের মধ্যে যারা তখনো বেঁচে ছিল তাদের জন্য এটি ছিল শেষ আশার আলো। রোম ও ইসলামের এ সংঘাতের ফলাফল কি দাঁড়ায় সে দিকেই তারা অধীর আগ্রহে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিল। কারণ তারা নিজেরাও জানতো, এরপর আর কোথাও কোন দিক থেকেই আশার সামান্যতম ঝলকও দেখা দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। মুনাফিকরাও এরি পেছনে তাদের শেষ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিল। তারা নিজেদের "মসজিদে দ্বিরার" বানিয়ে নিয়েছিল। এরপর অপেক্ষা করছিল, সিরিয়ার যুদ্ধে ইসলামের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটা মাত্রই তারা দেশের ভেতরে গোমরাহী ও অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবে। এখানেই শেষ নয়, বরং তারা তাবুকের এ অভিযানকে ব্যর্থ করার জন্য সম্ভাব্য

সব রকমের কৌশলও অবলম্বন করে। এদিকে নিষ্ঠাবান মুসলমানরাও পুরোপুরি অনুভব করতে পেরেছিলেন, যে আন্দোলনের জন্য বিগত ২২টি বছর ধরে তারা প্রাণপাত করে এসেছেন বর্তমানে তার ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা হবার সময় এসে পড়েছে। এ সময় সাহস দেখাবার অর্থ দাঁড়ায়, সারা দুনিয়ার ওপর এ আন্দোলনের বিজয়ের দরজা খুলে যাবে। অন্যদিকে এ সময় দুর্বলতা দেখাবার অর্থ দাঁড়ায়, খোদ আরব দেশেও একে পাত্তাড়ি গুটিয়ে ফেলতে হবে। কাজেই এ অনুভূতি সহকারে সত্যের নিবেদিত প্রাণ সিপাহীরা চরম উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করার ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজের সামর্থের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমান (রা) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বিপুল অর্থ দান করেন। হযরত উমর (রা) তাঁর সারা জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে রেখে দেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সঞ্চিত সম্পদের সবটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করেন। গরীব সাহাবীরা মেহনত মজদুরী করে যা কামাই করতে পেরেছিলেন তার সবটুকু উৎসর্গ করেন। মেয়েরা নিজেদের গহনা খুলে নযরানা পেশ করেন। চারদিক থেকে দলে দলে আসতে থাকে প্রাণ উৎসর্গকারী স্বেচ্ছাসেবকদের বাহিনী। তারা আবেদন জানান, বাহন ও অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যারা সওয়ারী পেতেন না তারা কাঁদতে থাকতেন। তারা এমনভাবে নিজেদের আন্তরিকতা ও মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকতেন যার ফলে রাসূলে পাকের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। এ ঘটনাটি কার্যত মুমিন ও মুনাফিক চিহ্নিত করার একটি মানদণ্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এ সময় কোন ব্যক্তি পেছনে থেকে যাওয়ার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, ইসলামের সাথে তার সম্পর্কের দাবী সত্য কিনা সেটাই সন্দেহজনক হয়ে পড়তো। কাজেই তাবুকের পথে যাওয়ার সময় সফরের মধ্যে যেসব ব্যক্তি পেছনে থেকে যেতো সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাদের খবর পৌছিয়ে দিতেন। এর জবাবে তিনি সংগে সংগেই স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ফেলতেন :

دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وان يك غير ذلك فقد اراحكم الله منه -

"যেতে দাও, যদি তার মধ্যে ভালো কিছু থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে আবার তোমাদের সাথে মিলিয়ে দেবেন। আর যদি অন্য কোন ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে শোকর করো যে, আল্লাহ তার ভণ্ডামীপূর্ণ সাহচর্য থেকে তোমাদের বাঁচিয়েছেন।"

৯ হিজরীর রজব মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩০ হাজারের মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার পথে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে ছিল দশ হাজার সওয়ার। উটের সংখ্যা এত কম ছিল যে, এক একটি উটের পিঠে কয়েক জন পালাক্রমে সওয়ার হতেন। এর ওপর ছিল আবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা। পানির স্বল্পতা সৃষ্টি করেছিল আরো এক বাড়তি সমস্যা। কিন্তু এ নাজুক সময়ে মুসলমানরা যে সাচ্চা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেন তার ফল তারা তাবুকে পৌছে হাতে হাতে পেয়ে যান। সেখানে পৌছে তারা জানতে পারেন, কাইসার ও তার অধীনস্থরা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পরিবর্তে নিজেদের সেনা বাহিনী সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এখন এ সীমান্তে আর কোন দুশমন নেই। কাজেই

এখানে যুদ্ধেরও প্রয়োজন নেই। সীরাত রচয়িতারা এ ঘটনাটিকে সাধারণত এমনভাবে লিখে গেছেন যাতে মনে হবে যেন সিরিয়া সীমান্তে রোমীয় সৈন্যদের সমাবেশ সম্পর্কে যে খবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে তা আদতে ভুলই ছিল। অথচ আসল ঘটনা ছিল এই যে, কাইসার সৈন্য সমাবেশ ঠিকই শুরু করেছিল। কিন্তু তার প্রস্তুতি শেষ হবার আগেই যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোকাবিলা করার জন্য পৌঁছে যান তখন সে সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোন পথ দেখেনি। মুতার যুদ্ধে এক লাখের সাথে ৩ হাজারের মোকাবিলার যে দৃশ্য সে দেখেছিল তারপর খোদ নবী করীমের (সা) নেতৃত্বে ৩০ হাজারের যে বাহিনী এগিয়ে আসছিল সেখানে লাখ দু'লাখ সৈন্য মাঠে নামিয়ে তার সাথে মোকাবিলা করার হিম্মত তার ছিল না।

কাইসারের এভাবে পিছু হটে যাওয়ার ফলে যে নৈতিক বিজয় লাভ হলো, এ পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যথেষ্ট মনে করেন। তিনি তাবুক থেকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করার পরিবর্তে এ বিজয় থেকে যত দূর সম্ভব রাজনৈতিক ও সামরিক ফায়দা হাসিল করাকেই অগ্রাধিকার দেন। সে জন্যই তিনি তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করে রোম সাম্রাজ্য ও দারুল ইসলামের মধ্যবর্তী এলাকায় যে বহু সংখ্যক ছোট ছোট রাজ্য এতদিন রোমানদের প্রভাবাধীনে ছিল। সামরিক চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসলামী সাম্রাজ্যের অনুগত করদ রাজ্যে পরিণত করেন। এভাবে দুমাতুল জানদালের খৃষ্টান শাসক উকাইদির ইবনে আবদুল মালিক কিন্দী, আইলার খৃষ্টান শাসক ইউহান্না ইবনে রুবাহ এবং অনুরূপ মাকনা, জারবা ও আযরুহের খৃষ্টান শাসকরাও জিযিয়া দিয়ে মদীনার বশ্যতা স্বীকার করে। এর ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা সরাসরি রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। রোম সম্রাটরা যেসব আরব গোত্রকে এ পর্যন্ত আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আসছিল এখন তাদের বেশীর ভাগই রোমানদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সহযোগী হয়ে গেল। এভাবে রোম সাম্রাজ্যের সাথে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সংঘর্ষে লিপ্ত হবার আগে ইসলাম সমগ্র আরবের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধন মজবুত করে নেবার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। এটাই হয় এ ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় লাভ। এতদিন পর্যন্ত যারা প্রকাশ্যে মুশরিকদের দলভুক্ত থেকে অথবা মুসলমানদের দলে যোগদান করে পরদার অন্তরালে মুনাফিক হিসেবে অবস্থান করে প্রাচীন জাহেলীয়াতের পুনর্বহালের আশায় দিন গুণছিল তাবুকের এ বিনা যুদ্ধে বিজয় লাভের ঘটনা তাদের কোমর ভেংগে দেয়। এ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত হতাশার ফলে তাদের অধিকাংশের জন্য ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর যদি বা তাদের নিজেদের ইসলামের নিয়ামতলাভের সুযোগ নাও থেকে থাকে, তবে কমপক্ষে তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সম্পূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। এরপর একটি নামমাত্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তাদের শিরক ও জাহেলী কার্যক্রমে অবিচল থাকে। কিন্তু তারা এত বেশী হীনবল হয়ে পড়ে যে, ইসলামের যে সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য আল্লাহ তাঁর নবীকে পাঠিয়েছিলেন তার পূর্ণতা সাধনের পথে তারা সামান্যতমও বাধা সৃষ্টি করতে সমর্থ ছিল না।

আলোচ্য বিষয় ও সমস্যাবলী

এ পটভূমি সামনে রেখে আমরা সে সময় যেসব বড় বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং সূরা তাওবায় যেগুলো আলোচিত হয়েছে, সেগুলো সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে।

১। এখন যেহেতু সমগ্র আরবের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে মুমিনদের হাতে এসে গিয়েছিল এবং সমস্ত প্রতিবন্ধক শক্তি নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, তাই আরবদেশকে পূর্ণাঙ্গ দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা অপরিহার্য ছিল তা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে আর বিলম্ব করা চলে না। তাই নিম্নোক্ত আকারে তা পেশ করা হয় ঃ

(ক) আরব থেকে শিরককে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করতে হবে। প্রাচীন মুশরিকী ব্যবস্থাকে পুরোপুরি খতম করে ফেলতে হবে। ইসলামের কেন্দ্র যেন চিরকালের জন্য নির্ভেজাল ইসলামী কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্য কোন অনৈসলামী উপাদান যেন সেখানকার ইসলামী মেজায ও প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ করতে এবং কোন বিপদের সময় আভ্যন্তরীণ ফিত্‌নার কারণ হতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে মুশরিকদের সাথে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ বাতিল করার কথা ঘোষণা করা হয়।

(খ) কাবা ঘরের ব্যবস্থাপনা মুমিনদের হাতে এসে যাবার পর, একান্তভাবে আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য উৎসর্গীত সেই ঘরটিতে আবারো আগের মত মূর্তিপূজা হতে থাকবে এবং তার পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব এখনো মুশরিকদের হাতে বহাল থাকবে, এটা কোনক্রমেই সংগত হতে পারে না। তাই হুকুম দেয়া হয় ঃ আগামীতে কাবা ঘরের পরিচালনা ও অভিভাবকত্বের দায়িত্বও তাওহীদবাদীদের হাতেই ন্যস্ত থাকা চাই। আর এ সংগে বায়তুল্লাহর চতুসীমার মধ্যে শিরক ও জাহেলীয়াতের যাবতীয় রসম-রেওয়াজ বল প্রয়োগে বন্ধ করে দিতে হবে। বরং এখন থেকে মুশরিকরা আর এ ঘরের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারবে না। তাওহীদের মহান অগ্রণী পুরুষ ইবরাহীমের হাতে গড়া এ গৃহটি আর শিরক দ্বারা কলুষিত হতে না পারে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে জাহেলী রসম রেওয়াজের যেসব চিহ্ন এখনো অক্ষুণ্ন ছিল নতুন ইসলামী যুগে সেগুলোর প্রচলন থাকা কোনক্রমেই সমিচীন ছিল না। তাই সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। "নাসী" (ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম নির্দিষ্ট করে নেয়া)'র নিয়মটা ছিল সবচেয়ে খারাপ প্রথা। তাই তার ওপর সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে। এ আঘাতের মাধ্যমে জাহেলীয়াতের অন্যান্য নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয় কী। তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

২। আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পূর্ণতায় পৌঁছে যাবার পর সামনে যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি ছিল সেটি হলো, আরবের বাইরে আল্লাহর সত্য দীনের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত করা। এ পথে রোম ও ইরানের রাজনৈতিক শক্তি ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। আরবের কার্যক্রম শেষ হবার পরই তার সাথে সংঘর্ষ বাধা ছিল অনিবার্য। তাছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অমুসলিম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাগুলোর সাথেও এমনি ধরনের

সংঘাত ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়া ছিল স্বাভাবিক। তাই মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, আরবের বাইরে যারা সত্য দীনের অনুসারী নয়, তারা ইসলামী কর্তৃত্বের প্রতি বশ্যতা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসন কর্তৃত্ব খতম করে দাও। অবশ্য আল্লাহর সত্য দ্বীনের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি তাদের ইচ্ছাধীন। তারা চাইলে ঈমান আনতে পারে, চাইলে নাও আনতে পারে। কিন্তু আল্লাহর যমীনে নিজেদের হুকুম জারি করার এবং মানব সমাজের কর্তৃত্ব ও পরিচালনা ব্যবস্থা নিজেদের হাতে রেখে মানুষের ওপর এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ওপর নিজেদের গোমরাহীসমূহ জোরপূর্বক চাপিয়ে দেবার কোন অধিকার তাদের নেই। বড় জোর তাদেরকে এতটুকু স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে যে, তারা নিজেরা চাইলে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু সে জন্য শর্ত হচ্ছে, তাদের জিযিয়া আদায় করে ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের অধীন থাকতে হবে।

৩। মুনাফিক সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাময়িক বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত উপেক্ষা ও এড়িয়ে যাবার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিলো। এখন যেহেতু বাইরের বিপদের চাপ কমে গিয়েছিল বরং একেবারে ছিলই না বললে চলে, তাই হুকুম দেয়া হয়, আগামীতে তাদের সাথে আর নরম ব্যবহার করা যাবে না। প্রকাশ্য সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে যেমন কঠোর ব্যবহার করা হয় তেমনি কঠোর ব্যবহার গোপন সত্য অস্বীকারকারীদের সাথেও করা হবে। এ নীতি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে সুওয়াইলিমের গৃহে আগুন লাগান। সেখানে মুনাফিকদের একটি দল মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যোগদান করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযান চালাবার জন্য জমায়েত হতো। আবার এ নীতি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে আসার পর সর্বপ্রথম "মসজিদে দ্বিরার" ভেংগে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দেন।

৪। নিষ্ঠাবান মুমিনদের কতকের মধ্যে এখনো পর্যন্ত যে সামান্য কিছু সংকল্পের দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল তার চিকিৎসারও প্রয়োজন ছিল। কারণ ইসলাম এখন আন্তরজাতিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চলেছে। যে ক্ষেত্রে মুসলিম আরবকে একাকী সারা অমুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হবে সে ক্ষেত্রে ইসলামী সংগঠনের জন্য ঈমানের দুর্বলতার চাইতে বড় কোন আভ্যন্তরীণ বিপদ থাকতে পারে না। তাই তাবুক যুদ্ধের সময় যারা অলসতা ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিল অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের তিরস্কার ও নিন্দা করা হয়। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ন্যায়সঙ্গত ওযর ছাড়াই পিছনে থেকে যাওয়াটাকে একটা মুনাফেকসুলভ আচরণ এবং সাচ্চা ঈমানদার না হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে জানিয়ে দেয়া হয়, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার সংগ্রাম এবং কুফর ও ইসলামের সংঘাতই হচ্ছে মুমিনের ঈমানের দাবী যাচাই করার আসল মানদণ্ড। এ সংঘর্ষে যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য ধন-প্রাণ, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে ইতস্তত করবে তার ঈমান নির্ভরযোগ্য হবে না। অন্য কোন ধর্মীয় কাজের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রের কোন অভাব পূরণ করা যাবে না।

এসব বিষয়ের প্রতি নজর রেখে সূরা তাওবা অধ্যয়ন করলে এর যাবতীয় বিষয় সহজে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١﴾ فَسِيْحُوْا
فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ
مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢﴾ وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ
الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣﴾

সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হলো[১] আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে, যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে তাদের সাথে।[২] কাজেই তোমরা দেশের মধ্যে আরো চার মাসকাল চলাফেরা করে নাও[৩] এবং জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম ও শক্তিহীন করতে পারবে না। আর আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের অবশ্যই লাঞ্ছিত করবেন।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে বড় হজ্জের[৪] দিনে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ "আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রসূলও। এখন যদি তোমরা তাওবা করে নাও তাহলে তা তোমাদেরই জন্য ভাল। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে খুব ভাল করেই বুঝে নাও, তোমরা আল্লাহকে শক্তি সামর্থহীন করতে পারবে না। আর হে নবী! অস্বীকারকারীদের কঠিন আযাবের সুখবর দিয়ে দাও।

১. এ সূরার ভূমিকায় আমি বলে এসেছি, ৫ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত এ ভাষণটি ৯ হিজরীতে এমন এক সময় নাযিল হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকরকে (রা) হজ্জের জন্য রওয়ানা করে দিয়েছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর এটি নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করেন ঃ এটি হযরত আবু বকরের (রা) কাছে পাঠিয়ে দিন, তিনি হজ্জের সময় লোকদের এটি শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি বলেন, এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ঘোষণা আমার পক্ষ থেকে

আমারই ঘরের এক জনের করা উচিত। কাজেই তিনি হযরত আলীকে (রা) এ কাজে নিযুক্ত করেন। এ সংগে তাঁকে নির্দেশ দেন, হাজীদের সাধারণ সমাবেশে আল্লাহর এ বাণী শুনিয়ে দেবার পর নিম্নলিখিত চারটি কথাও যেন ঘোষণা করে দেন। এক, দীন ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এমন কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। দুই, এ বছরের পরে আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে আসতে পারবে না। তিন, বাইতুল্লাহর চারদিকে উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। চার, যাদের সাথে আল্লাহর রসূলের চুক্তি অক্ষুণ্ন আছে অর্থাৎ যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি, চুক্তির সময়সীমা পর্যন্ত পূর্ণ করা হবে।

এ প্রসংগে জানা থাকা দরকার, মক্কা বিজয়ের পর ইসলামী যুগে প্রথম হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় ৮ হিজরীতে প্রাচীন পদ্ধতিতে। ৯ হিজরীতে মুসলমানরা এ দ্বিতীয় হজ্জটি সম্পন্ন করে নিজস্ব পদ্ধতিতে এবং অন্যদিকে মুশরিকরা করে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে। এরপর ১০ হিজরীতে তৃতীয় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় খালেস ইসলামী পদ্ধতিতে। এটিই বিখ্যাত বিদায় হজ্জ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দু'বছর হজ্জ করতে যাননি। তৃতীয় বছর শিরকের পুরোপুরি অবসান ঘটার পর তিনি হজ্জ আদায় করেন।

২. সূরা আনফালের ৫৮ আয়াতে একথা আলোচনা করা হয়েছে যে, কোন জাতির পক্ষ থেকে যখন তোমাদের খেয়ানত করার তথা অঙ্গীকার ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতা করার আশংকা দেখা দেয় তখন প্রকাশ্যে তার চুক্তি তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দাও এবং তাকে এ মর্মে সতর্ক করে দাও যে, এখন তোমাদের সাথে আমাদের আর কোন চুক্তি নেই। এরূপ ঘোষণা ও বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে কোন চুক্তিবদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম শুরু করে দেয়া মূলত বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। এ নৈতিক বিধি অনুযায়ী চুক্তি বাতিল করার এ সাধারণ ঘোষণা এমনসব গোত্রের বিরুদ্ধে করা হয়েছে যারা অংগীকার করা ও চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সবসময় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতো এবং সুযোগ পেলেই সকল অংগীকার ও চুক্তি শিকেয় তুলে রেখে শত্রুতায় লিপ্ত হতো। সে সময় যেসব গোত্র শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের মধ্য থেকে কিনানাহ্ ও বনী দ্বামরাহ এবং হয়তো আরো এক আধটি গোত্র ছাড়া বাদবাকি সকল গোত্রের অবস্থা এ রকমই ছিল।

এ দায়িত্ব মুক্তি ও সম্পর্কচ্ছেদ সংক্রান্ত ঘোষণার ফলে আরবে শিরক ও মুশরিকদের অস্তিত্বই যেন কার্যত আইন বিরোধী (Out of Law) হয়ে গেলো। এখন আর তাদের জন্য সারাদেশে কোন আশ্রয়স্থল রইল না। কারণ দেশের বেশীরভাগ এলাকা ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের আওতাধীন হয়ে গিয়েছিল। এরা নিজেদের জায়গায় বসে অপেক্ষা করছিল, রোম ও পারস্যের পক্ষ থেকে ইসলামী সালতানাত কখন বিপদের সম্মুখীন হবে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখন ইন্তিকাল করবেন, তখনই এরা অকস্মাত চুক্তি ভংগ করে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেবে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) তাদের প্রতীক্ষিত সময় আসার আগেই তাদের পরিকল্পনার ছক উলটে দিলেন এবং তাদের থেকে দায়িত্ব মুক্তির কথা ঘোষণা করে তাদেরকে তিনটি পথের একটিকে বেছে নিতে বাধ্য করলেন। এক, তাদের যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হতে হবে এবং ইসলামী শক্তির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। দুই, তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তিন, তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে হবে এবং দেশের বৃহত্তর অংশ আগেই যে শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন চলে এসেছে তারই আয়ত্বে নিজেদেরকে ও নিজেদের এলাকাকে সোপর্দ করে দিতে হবে।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ④

তবে যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো তারপর তারা তোমাদের সাথে নিজেদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি তাদের ছাড়া। এ ধরনের লোকদের সাথে তোমরাও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে। কারণ আল্লাহ তাকওয়া তথা সংযম অবলম্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন।[৫]

এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রকৃত রহস্য ও যথার্থ যৌক্তিকতা অনুধাবন করার জন্য আমাদেরকে পরবর্তীকালে উদ্ভূত ইসলাম বর্জন আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। আলোচ্য ঘটনার দেড় বছর পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরই দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ অশুভ তৎপরতা ও গোলযোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ফলে ইসলামের নব নির্মিত প্রাসাদটি আকস্মিকভাবে নড়ে ওঠে। ৯ হিজরীর এ সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার মাধ্যমে যদি শিরকের সংগঠিত শক্তিকে খতম করে না দেয়া হতো এবং সারাদেশে ইতিমধ্যে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা প্রাধান্য বিস্তার না করতো, তাহলে হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফত আমলের শুরুতেই মুরতাদ হওয়ার যে হিড়িক লেগে গিয়েছিল তার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশী শক্তি নিয়ে বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডব শুরু হয়ে যেতো। এ অবস্থায় ইসলামের ইতিহাসের চেহারাই হয়তো সম্পূর্ণ পাল্টে যেতো।

৩. এ ঘোষণাটি হয়েছিল ৯ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে। নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা–ভাবনা করার জন্য এ সময় থেকে ১০ হিজরী ১০ রবিউস সানী পর্যন্ত ৪ মাসের অবকাশ তাদেরকে দেয়া হয়। তারা যুদ্ধ করতে চাইলে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হোক। দেশ ত্যাগ করতে চাইলে এ সময়ের মধ্যে নিজেদের আশ্রয়স্থল খুঁজে নিক। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তাহলে স্থিরমস্তিষ্কে ভেবে–চিন্তে তা গ্রহণ করুক।

৪. অর্থাৎ ১০ যিলহজ্জ। একে "ইয়াওমুন নহর" বা যবেহ করার দিন বলা হয়। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে : বিদায় হজ্জে ভাষণ দিতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞেস করেন : আজকের এ দিনটি কোন্ দিন? লোকেরা জবাব দেয় : "ইয়াওমুন নহর"–আজ যবেহ করার দিন। তিনি বলেন : هذا يوم الحج الاكبر অর্থাৎ আজ হজ্জে আকবর তথা বড় হজ্জের দিন। এখানে বড় হজ্জ শব্দটি এসেছে ছোট হজ্জের বিপরীত শব্দ হিসেবে। আরববাসীরা "উমরাহ"কে ছোট হজ্জ বলে থাকে। এর মোকাবিলায় যিলহজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে যে হজ্জ করা হয় তাকে বলা হয় বড় হজ্জ।

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

অতএব, হারাম মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে গেলে[৬] মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো এবং তাদের ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকো। তারপর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদের ছেড়ে দাও।[৭] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। আর যদি মুশরিকদের কোন ব্যক্তি আশ্রয় প্রার্থনা করে তোমার কাছে আসতে চায় (যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে) তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শোনা পর্যন্ত আশ্রয় দাও, তারপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌছিয়ে দাও। এরা অজ্ঞ বলেই এটা করা উচিত।

৫. অর্থাৎ যারা তোমাদের সাথে চুক্তি ভংগ করেনি তোমরা তাদের সাথে চুক্তি ভংগ করবে, এটা হবে তাকওয়া বিরোধী কাজ। আল্লাহর কাছে তারাই প্রিয় ও পছন্দনীয়, যারা সব অবস্থায় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

৬. পারিভাষিক অর্থে যে মাসগুলোকে হজ্জ ও উমরাহ করার সুবিধার জন্য হারাম মাস গণ্য করা হয়েছে, এখানে সে মাসগুলোর কথা বলা হয়নি। বরং মুশরিকদের যে চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়েছিল সেই চারটি মাসের কথা এখানে বলা হয়েছে। যেহেতু এ অবকাশকালীন সময়ে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয ছিল না তাই এগুলোকে হারাম মাস বলা হয়েছে।

৭. অর্থাৎ কুফর ও শিরক থেকে নিছক তাওবা করে নিলেই ব্যাপারটি খতম হয়ে যাবে না। বরং তাদের কার্যত নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে হবে। এটা না হলে তারা যে কুফরী ত্যাগ করে ইসলামকে অবলম্বন করেছে, একথা মেনে নেয়া যাবে না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদ হবার ফিতনা দেখা দেবার সময় এ আয়াত থেকেই যুক্তি সংগ্রহ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর যারা গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল তাদের একটি দল বলতো, আমরা ইসলামকে অস্বীকার করি না। আমরা নামায পড়তে প্রস্তুত কিন্তু যাকাত দেবো না। সাহাবায়ে কেরাম সাধারণভাবে এ ভেবে বিব্রত হচ্ছিলেন যে, এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ⑦ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ⑧ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑨

২ রুকূ'

মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে কোন নিরাপত্তার অংগীকার কেমন করে হতে পারে? তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছিলে মসজিদে হারামের কাছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র।[৭] কাজেই যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য সোজা–সরল থাকে ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা–সরল থাকো। কারণ আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন। তবে তাদের ছাড়া অন্য মুশরিকদের জন্য কোন নিরাপত্তা চুক্তি কেমন করে হতে পারে, যখন তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারলে তোমাদের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তার পরোয়া করবে না এবং কোন অংগীকারের দায়িত্বও নেবে না। তারা মুখের কথায় তোমাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের মন তা অস্বীকার করে।[১০] আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক।[১১] তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্যতম মূল্য গ্রহণ করে নিয়েছে।[১২] তারপর আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৩] তারা যা করতে অভ্যস্ত, তা অত্যন্ত খারাপ কাজ।

কেমন করে তরবারি ওঠানো যেতে পারে? কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) এ আয়াতটির বরাত দিয়ে বললেন, আমাদের তো কেবলমাত্র যখন এরা শিরক থেকে তাওবা করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে তখনই এদেরকে ছেড়ে দেবার হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন এ তিন শর্তের মধ্য থেকে একটি শর্ত এরা উড়িয়ে দিচ্ছে তখন আমরা এদের ছেড়ে দেই কেমন করে?

৮. অর্থাৎ যুদ্ধ চলার মাঝখানে যদি কোন শত্রু তোমাদের কাছে আবেদন করে, আমি ইসলামকে জানতে ও বুঝতে চাই তাহলে তাকে নিরাপত্তা দান করে নিজেদের কাছে আসতে দেয়া এবং তাকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝানো মুসলমানদের উচিত। তারপর যদি সে

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾

কোন মুমিনের ব্যাপারে তারা না আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে, আর না কোন অঙ্গীকারের ধার ধারে। আগ্রাসন ও বাড়াবাড়ি সবসময় তাদের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। কাজেই যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই। যারা জানে, তাদের জন্য আমার বিধান স্পষ্ট করে বর্ণনা করি।[১৪] আর যদি অঙ্গীকার করার পর তারা নিজেদের কসম ভংগ করে এবং তোমাদের দীনের ওপর হামলা চালাতে থাকে তাহলে কুফরীর পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ করো। কারণ তাদের কসম বিশ্বাসযোগ্য নয়। হয়তো (এরপর তরবারির ভয়েই) তারা নিরস্ত হবে।[১৫]

ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে নিজেদের নিরাপত্তায় তাকে তার আবাস স্থলে পৌছিয়ে দেয়া উচিত। এ ধরনের লোক, যারা নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে আসে, ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে তাদের "মুস্তামিন" তথা নিরাপত্তা প্রার্থী বলা হয়।

৯. অর্থাৎ বনী কিনানাহ্, বনী খুযাআহ ও বনী দ্বাম্‌রাহ।

১০. অর্থাৎ বাহ্যত তারা চুক্তির শর্তাবলী নির্ণয় করে কিন্তু মনে থাকে তাদের চুক্তি ভংগ করার কুমতলব। অভিজ্ঞতা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেখা গেছে, যখনই তারা কোন চুক্তি করেছে, ভংগ করার জন্যই তা করেছে।

১১. অর্থাৎ তারা এমন লোক, যাদের নৈতিক দায়িত্বের কোন অনুভূতি নেই এবং নৈতিক বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করতেও তারা কখনো কুণ্ঠিত বা শংকিত হয় না।

১২. অর্থাৎ একদিকে আল্লাহর আয়াত তাদের সৎকাজ করার, সত্য পথে থাকার ও ন্যায়নিষ্ঠ আইন মেনে চলার আহবান জানাচ্ছিল এবং অন্য দিকে তাদের সামনে ছিল দুনিয়ার জীবনের মুষ্টিমেয় কয়েকদিনের সুখ-সুবিধা-আরাম-ঐশ্বর্য। প্রবৃত্তির আশা-আকাংখার লাগামহীন আনুগত্যের দ্বারা এগুলো অর্জন করা যায়। তারা এ দু'টি জিনিসের মধ্যে তুলনা করে প্রথমটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় জিনিসটি নিজেদের জন্য বেছে নিল।

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم
بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَـٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ
وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُو
بِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن
تُتْرَكُوا۟ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِ
ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

তোমরা কি লড়াই করবে না[১৬] এমন লোকদের সাথে যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভংগ করে এসেছে এবং যারা রসূলকে দেশ থেকে বের করে দেবার দুরভিসন্ধি করেছিল আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের জন্য অধিক সমীচীন। তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবেন, তাদের মোকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবেন এবং অনেক মুমিনের অন্তর শীতল করে দেবেন। আর তাদের অন্তরের জ্বালা জুড়িয়ে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা তাওবা করার তওফীকও দান করবেন।[১৭] আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী। তোমরা কি একথা মনে করে রেখেছো যে, তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্য থেকে কারা (তাঁর পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালালো এবং আল্লাহ, রসূল ও মুমিনদের ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করলো না?[১৮] তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা জানেন।

১৩. অর্থাৎ এ জালেমরা শুধুমাত্র হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে নিজেদের জন্য বেছে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং আরো অগ্রসর হয়ে তারা যাতে সত্যের দাওয়াতের কাজ কোনক্রমেই না চলতে পারে এবং কল্যাণ ও সৎবৃত্তির এ আওয়াজ কেউ শুনতে না পায় সে জন্যও অপচেষ্টা চালিয়েছে। বরং তারা চেয়েছে, যে মুখ থেকে এ ডাক দেয়া হয় সেই মুখই বন্ধ করে দিতে। মহান আল্লাহ যে সত্যনিষ্ঠ ও কল্যাণময় জীবন বিধান পৃথিবীতে

কায়েম করতে চাচ্ছিলেন তার পথ রোধ করার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ জন্য যারা এ বিধানকে সত্য জেনে এর অনুসারী হয়েছিল দুনিয়ার বুকে তাদের জীবন যাপনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল।

১৪. এখানে আবার একথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, নামায পড়া ও যাকাত দেয়া ছাড়া নিছক তাওবা করে নিলেই তারা তোমাদের দীনী ভাই হয়ে যাবে না। আর এগুলো আদায় করলে তারা তোমাদের দীনী ভাই হবে, একথা বলার মানে হচ্ছে এই যে, এ শর্তগুলো পূরণ করার ফল কেবল এতটুকুই হবে না যে, তোমাদের জন্য তাদের ওপর হাত ওঠানো এবং তাদের ধন-প্রাণ নষ্ট করা হারাম হয়ে যাবে বরং এ সংগে আরো একটি সুবিধা লাভ করা যাবে। অর্থাৎ এর ফলে ইসলামী সমাজে তারা সমান অধিকার লাভ করবে। সামাজিক, তামাদ্দুনিক ও আইনগত দিক দিয়ে তারা অন্যান্য সকল মুসলমানের মতোই হবে। কোন পার্থক্য ও বিশেষ গুণাবলী তাদের উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না।

১৫. পূর্বাপর আলোচনা থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা বুঝা যাচ্ছে যে, কসম, অঙ্গীকার ও শপথ বলতে কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অংগীকারের কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে। কারণ এদের সাথে এখন আর কোন চুক্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। আগের সমস্ত চুক্তিই তারা ভংগ করেছে। তাদের অংগীকার ভংগের কারণেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিষ্কার ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে, এ ধরনের লোকদের সাথে কেমন করে চুক্তি করা যেতে পারে? এ সাথে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছিল যে, এখন তারা কুফরী ও শিরক ত্যাগ করে নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে, একমাত্র এ নিশ্চয়তা বিধান করলেই তাদের ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এ কারণে এ আয়াতটি মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একেবারেই দ্ব্যর্থহীন আদেশ স্বরূপ। আসলে দেড় বছর পরে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফত আমলে ইসলাম বর্জনের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল এখানে সেদিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। অতিরিক্ত ও বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আমার বই "ইসলামী আইনে মুরতাদের শাস্তি।"

১৬. এখান থেকে ভাষণটি মুসলমানদের দিকে মোড় নিচ্ছে। তাদেরকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং দীনের ব্যাপারে কোন প্রকার সম্পর্ক, নিকট আত্মীয়তা ও বৈষয়িক সুবিধার কথা একটুও বিবেচনায় না আনার কঠোর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ভাষণের এ অংশটির সমগ্র প্রাণসত্তা ও মর্ম অনুধাবন করার জন্য সে সময় যে অবস্থা ও পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তা আর একবার ভেবে দেখা দরকার। সন্দেহ নেই, ইসলাম এ সময় দেশের একটি বড় অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরবে এমন কোন বড় শক্তি তখন ছিল না, যে তাকে শক্তি পরীক্ষার আহবান জানাতে পারতো। তবুও এ সময় যে সিদ্ধান্তকর ও চরম বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল স্থূল দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা তাতে অনেক বিপদের ঝুঁকি দেখতে পাচ্ছিল।

এক ঃ সমস্ত মুশরিক গোত্রগুলোকে একই সংগে সকল চুক্তি বাতিল করার চ্যালেঞ্জ দিয়ে দেয়া, মুশরিকদের হজ্জ বন্ধ করে দেয়া, কাবার অভিভাবকের পরিবর্তন এবং

জাহেলী রসম রেওয়াজের একেবারেই মূলোৎপাটন—এসবের অর্থ ছিল, একই সংগে সারাদেশে আগুন জ্বলে উঠবে এবং মুশরিক ও মুনাফিকরা নিজেদের স্বার্থ ও গোত্রীয় বৈশিষ্টের হেফাজতের জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত প্রবাহিত করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

দুই ঃ হজ্জকে শুধুমাত্র তাওহীদবাদীদের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং মুশরিকদের জন্য কাবাঘরের পথ রুদ্ধ করে দেয়ার অর্থ ছিল, দেশের জনসংখ্যার যে একটি বিরাট অংশ তখনো মুশরিক ছিল, ধর্মীয় কাজ কর্মের জন্য তাদের কাবাঘরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু এ নয়, সমকালীন আরবের অর্থনৈতিক জীবনে কাবার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং কাবার ওপর আরবদের অর্থনৈতিক জীবন বিপুলভাবে নির্ভরশীল ছিল। কাজেই এভাবে কাবার দরজা বন্ধ করার কারণে তারা কাবাঘর থেকে কোন প্রকার অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভ করতে পারবে না।

তিন ঃ যারা হোদাইবিয়ার চুক্তি ও মক্কা বিজয়ের পর ঈমান এনেছিলেন তাদের জন্য এটি ছিল কঠিন পরীক্ষার বিষয়। কারণ তাদের অনেক জ্ঞাতি–ভাই, আত্মীয়–স্বজন তখনো মুশরিক ছিল। তাদের মধ্যে এমন অনেক লোকও ছিল পুরাতন জাহেলী ব্যবস্থার বিভিন্ন পদমর্যাদার সাথে যাদের স্বার্থ বিজড়িত ছিল। এখন বাহ্যত আরবের মুশরিকদের গোটা সমাজ ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন করে দেবার যে আয়োজন চলছিল তার মানে ছিল, মুসলমানরা নিজেদের হাতেই নিজেদের বংশ, পরিবার ও কলিজার টুকরাদেরকে ধূলায় মিশিয়ে দেবে এবং তাদের মান, মর্যাদা ও শত শত বছরের প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্টসমূহ চিরতরে খতম করে দেবে।

যদিও বাস্তবে এর মধ্য থেকে কোন একটা বিপদও কার্যত সংঘটিত হয়নি। দায়মুক্তির ঘোষণার পর সারা দেশে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠার পরিবর্তে বরং দেশের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুশরিক গোত্র এতদিন নির্লিপ্ত ছিল তাদের এবং বিভিন্ন আমীর, রইস ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি দল মদীনায় আসতে শুরু করলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ইসলাম গ্রহণ করে আনুগত্যের শপথ নিতে লাগলো। ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রত্যেককে নিজের পদমর্যাদায় বহাল রাখলেন। কিন্তু এ নতুন নীতি ঘোষণা করার সময় তার এ ফলাফলকে কেউ আগাম অনুমান করতে পারেনি। তাছাড়া এ ঘোষণার সাথে সাথেই যদি মুসলমানরা শক্তি প্রয়োগ করে তা বাস্তবায়িত করার জন্য পুরোপুরি তৈরী না হয়ে যেতো, তাহলে সম্ভবত এ ধরনের ফলাফল দেখাই যেতো না। কাজেই এ সময় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দীপনা ও আবেগ সৃষ্টি করা এবং এ নীতি কার্যকর করতে গিয়ে তাদের মনে যেসব আশংকা দেখা দিয়েছিল সেগুলো দূর করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এ সংগে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তাদের কোন জিনিসের পরোয়া না করা উচিত। এ বক্তব্যই আলোচ্য ভাষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৭. এখানে একটি সম্ভাবনার দিকে হালকা ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে পরবর্তীতে এটি বাস্তব ঘটনার রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানরা মনে করছিল, এ ঘোষণার সাথে সাথেই দেশে রক্তের নদী বয়ে যাবে। এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য ইশারা–ইঙ্গিতে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ কঠোর নীতি অবলম্বন করার কারণে যেখানে একদিকে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে লোকদের তাওবার সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনাও

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

৩ রুকূ'

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ দিচ্ছে তখন আল্লাহর মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও খাদেম হওয়া তাদের কাজ নয়।[১৯] *তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে*[২০] *এবং তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তারাই হতে পারে আল্লাহর মসজিদ আবাদকারী (রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক) যারা আল্লাহ ও পরকালকে মানে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। তাদেরই ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে, তারা সঠিক সোজা পথে চলবে। তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণা–বেক্ষণ করাকে এমন ব্যক্তিদের কাজের সমান মনে করে নিয়েছ যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং সংগ্রাম–সাধনা করেছে আল্লাহর পথে?*[২১] *এ উভয় দল আল্লাহর কাছে সমান নয়। আল্লাহ জালেমদের পথ দেখান না।*

রয়েছে। কিন্তু এ ইঙ্গিতকে খুব বেশী শানিত ও স্পষ্ট করা হয়নি। কারণ এর ফলে একদিকে মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি স্তিমিত হয়ে পড়তো এবং অন্যদিকে যে হুমকিটি মুশরিকদেরকে তাদের অবস্থানের নাজুকতার কথা ভাবার এবং পরিশেষে তাদের ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে বিলীন হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা হালকা ও নিষ্প্রভ হয়ে যেতো।

১৮. স্বল্পকাল আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, যতক্ষণ তোমরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একথা প্রমাণ করে

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾

আল্লাহর কাছে তো তারাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর পথে ঘর–বাড়ি ছেড়েছে ও ধন–প্রাণ সমর্পণ করে জিহাদ করেছে। তারাই সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত, সন্তোষ ও এমন জান্নাতের সুখবর দেন, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অবশ্যি আল্লাহর কাছে কাজের প্রতিদান দেবার জন্য অনেক কিছুই রয়েছে।

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের বাপ ও ভাইয়েরা যদি ঈমানের ওপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয় তাহলে তাদেরকেও নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই জালেম।

না দেবে যে, যথার্থই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনকে নিজেদের ধন–প্রাণ ও ভাই–বন্ধুদের তুলনায় বেশী ভালবাসো, ততক্ষণ তোমাদের সাচ্চা মুমিন বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

এ পর্যন্ত বাহ্যত তোমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যেহেতু সাচ্চা মুমিন ও প্রথম যুগের দৃঢ়চিত্ত মুসলিমদের প্রাণপন প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলাম বিজয় লাভ করেছে এবং সারাদেশে ছেয়ে গেছে তাই তোমরাও মুসলমান হয়ে গেছো।

১৯. অর্থাৎ এক আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য যেসব মসজিদ তৈরী করা হয়েছে সেগুলোর মুতাওয়াল্লী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক কখনো এমন ধরনের লোক হতে পারে না যারা আল্লাহর গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে অন্যদের শরীক করে। তারপর তারা নিজেরাই যখন তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ
مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

হে নবী! বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়–স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর—এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর[২২] আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না।

এবং পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আমরা নিজেদের ইবাদাত বন্দেগী এক আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করতে রাযী নই, তখন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য যে ইবাদাত গৃহ তৈরী করা হয়েছে তার মুতাওয়াল্লী হবার অধিকার তারা কোথা থেকে পায়?

এখানে যদিও কথাটা সাধারণভাবেই বলা হয়েছে এবং তাৎপর্যের দিক দিয়েও এটি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবুও বিশেষভাবে এখানে এর উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাবাঘর ও মসজিদে হারামের ওপর থেকে মুশরিকদের মুতাওয়াল্লীগিরির পাট একেবারে চুকিয়ে দিয়ে সেখানে চিরকালের জন্য তাওহীদবাদীদের অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

২০. অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে বায়তুল্লাহর যে সামান্য কিছু সেবা তারা করেছিল তাও বরবাদ হয়ে গেছে। কারণ এ সেবা কাজের সাথে তারা শিরক ও জাহেলী পদ্ধতি মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছিলো। তাদের সেই সামান্য পরিমাণ ভাল কাজকে নস্যাত করে দিয়েছে, তাদের অনেক বড় আকারের অসৎকাজ।

২১. অর্থাৎ কোন তীর্থ কেন্দ্রে পূর্ব-পুরুষদের গদিনশীন হওয়া, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এমন কিছু লোক দেখানো ধর্মীয় কাজ করা যার ওপর লোকেরা বৈষয়িক পর্যায়ে সাধারণত মর্যাদা ও পবিত্রতার ভিত্ গড়ে তোলে আল্লাহর কাছে এগুলোর কোন মূল্য ও মার্যাদা নেই। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর পথে কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করাই যথার্থ মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব গুণের অধিকারী হয়, সে কোন উচ্চ বংশ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে সম্পর্কিত না হলেও এবং তার কপালে কোন বিশেষ গুণের "তকমা" আঁটা না থাকলেও সে–ই যথার্থ মর্যাদাবান ব্যক্তি। কিন্তু যারা এসব গুণের

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

৪ রুকূ'

এর আগে আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এই তো সেদিন, হুনায়েন যুদ্ধের দিন (তাঁর সাহায্যের অভাবনীয় রূপ তোমরা দেখেছো),[২৩] সেদিন তোমাদের মনে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের অহমিকা ছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। আর এত বড় বিশাল পৃথিবীও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তোমরা পেছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন তাঁর রসূলের ওপর ও মুমিনদের ওপর এবং এমন সেনাদল নামান যাদেরকে তোমরা চোখে দেখতে পাচ্ছিলে না এবং সত্য অস্বীকারকারীদের শাস্তি দেন। কারণ, যারা সত্য অস্বীকার করে এটাই তাদের প্রতিফল। তারপর (তোমরা এও দেখেছো), এভাবে শাস্তি দেবার পর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাওবার তাওফীকও দান করেন।[২৪] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

অধিকারী নয়, তারা নিছক বিরাট সম্মানিত ও বুজর্গ ব্যক্তির সন্তান, দীর্ঘকাল থেকে তাদের পরিবারে গদিনশীনী প্রথা চলে আসছে এবং বিশেষ সময়ে তারা বেশ ধুমধাম সহকারে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে বলেই কোন প্রকার মর্যাদার অধিকারী হবে না। উপরন্তু এ ধরনের মেকী "মৌরুসী" অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে পবিত্র স্থানসমূহ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ অযোগ্য ও অপাংক্তেয় লোকদের হাতে রেখে দেয়াও কোনক্রমে বৈধ হতে পারে না।

২২. অর্থাৎ তোমাদের হটিয়ে দিয়ে সেখানে আল্লাহ অন্য কোন দলকে দীনের নিয়ামত দান করবেন। তাদেরকে দীনের ধারক ও বাহক হবার মর্যাদায় উন্নীত করবেন। এ সংগে মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করার নেতৃত্বও তাদের হাতে সোপর্দ করবেন।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

হে ঈমানদারগণ। মুশরিকরা তো অপবিত্র, কাজেই এ বছরের পর তারা যেন আর মসজিদে হারামের কাছে না আসে।[২৫] আর যদি তোমাদের দারিদ্রের ভয় থাকে, তাহলে আল্লাহ চাইলে তাঁর নিজ অনুগ্রহে শীঘ্রই তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন ও তিনি প্রজ্ঞাময়।

আহ্‌লি কিতাবদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনে না,[২৬] যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম গণ্য করেছেন তাকে হারাম করে না[২৭] এবং সত্য দীনকে নিজেদের দীনে পরিণত করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না তারা নিজের হাতে জিযিয়া দেয় ও পদানত হয়ে থাকে।[২৮]

২৩. দায়িত্ব মুক্তি ও সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা সম্বলিত ভয়ংকর নীতি কার্যকর করার ফলে সারা আরবে সর্বত্র যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে এবং তার মোকাবিলা করা অসম্ভব হবে বলে যারা আশংকা করছিল তাদেরকে বলা হচ্ছে, এসব অমূলক ভয়ে ভীত হচ্ছো কেন? এর চাইতেও বেশী কঠিন বিপদের সময় যে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন তিনি এখনো তোমাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছেন। এ কাজ যদি তোমাদের শক্তির ওপর নির্ভর করতো, তাহলে এর আর মক্কার সীমানা পার হতে হতো না। আর না হোক, বদরের ময়দানে তো খতমই হয়ে যেতো। কিন্তু এর পেছনে তো রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর শক্তি। আর অতীতের অভিজ্ঞতাসমূহ তোমার কাছে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এখনো পর্যন্ত আল্লাহর শক্তিই এর উন্নতি ও বিকাশ সাধন করে এসেছে। কাজেই নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো, আজো তিনিই একে উন্নতি ও অগ্রগতি দান করবেন।

এখানে হুনায়েন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এ যুদ্ধটি ৮ হিজরীর শওয়াল মাসে এ আয়াতগুলো নাযিলের মাত্র বার তের মাস আগে মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে হুনায়েন উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ছিল ১২ হাজার সৈন্য। এর

আগে কোন যুদ্ধে মুসলমানদের এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য জমায়েত হয়নি। অন্যদিকে কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু এ সত্ত্বেও হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাজরা যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিল। মুসলিম সেনাদলে মারাত্মক বিশৃংখলা দেখা দিল। তারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটতে লাগলো। এ সময় শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুষ্টিমেয় কতিপয় মরণপণ সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ ছিলেন। তাদের অবিচলতার ফলেই সেনাবাহিনী পুনর্বার সংগঠিত হলো এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করলো। অন্যথায় মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানরা যে পরিমাণ লাভবান হয়েছিল হুনায়েনে তাদেরকে তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতো।

২৪. হুনায়েন যুদ্ধে জয়লাভ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজিত শত্রুদের সাথে যে সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেন তার ফলে তাদের বেশীরভাগ লোক মুসলমান হয়ে যায়। এখানে মুসলমানদেরকে যে কথা বলার উদ্দেশ্যে এ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে তা এই যে, এখন সারা আরবের সমস্ত মুশরিককে ধ্বংস করা হবে, এ কথা তোমরা ভাবলে কেন? না, তা নয় বরং আগের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের আশা করা উচিত যে, যখন এ লোকদের মনে জাহেলী ব্যবস্থার বিকাশ ও স্থায়িত্বের আর কোন আশা থাকবে না এবং যেসব সহায়তা ও আনুকূল্যের কারণে এতদিন তারা জাহেলিয়াতকে বুকের সাথে জড়িয়ে রেখেছে তা সব খতম হয়ে যাবে, তখন তারা নিজেরাই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেবার জন্য এগিয়ে আসবে।

২৫. অর্থাৎ আগামীতে শুধু তাদের হজ্জ ও যিয়ারতই বন্ধ নয় বরং মসজিদে হারামের সীমানায় তাদের প্রবেশই নিষিদ্ধ। এভাবে শিরক ও জাহেলিয়াতের পুনরাবর্তনের কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

"অপবিত্র" কথাটির মানে এই নয় যে, তারা নিজেরাই অপবিত্র বা নাপাক। বরং এর মানে হচ্ছে, তাদের আকীদা–বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র, কাজকর্ম এবং তাদের জাহেলী চালচলন ও সমাজ ব্যবস্থা অপবিত্র। আর এ অপবিত্রতার কারণে হারাম শরীফের চতুসীমায় তাদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে এর অর্থ শুধু এতটুকুই যে, হজ্জ ও উমরাহ এবং জাহেলী অনুষ্ঠানাদি পালন করার জন্য তারা হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে এ হুকুমের অর্থ হচ্ছে, তারা (যে কোন অবস্থায়ই) মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম মালেক বলেন, শুধু মসজিদে হারামেই নয়, দুনিয়ার অন্য কোন মসজিদেও তাদের প্রবেশ জায়েয নয়। তবে এ শেষোক্ত মতটি সঠিক নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাদের মসজিদে নববীতে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৬. যদিও আহলি কিতাবরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখার দাবীদার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, না আখেরাতের প্রতি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ আছে একথা মেনে নেয়া নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও একমাত্র রব বলে মেনে নেবে এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতায় নিজেকে বা অন্য কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু খৃষ্টান ও ইহুদীরা এ অপরাধে লিপ্ত। পরবর্তী পর্যায়ের আয়াতগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই তাদের আল্লাহকে মেনে নেয়ার কথাটা অর্থহীন। একে কোনক্রমেই ঈমান

বিল্লাহ বলা যেতে পারে না। অনুরূপভাবে আখেরাতকে মানার অর্থ মরে যাওয়ার পর আমাদের আবার উঠানো হবে, শুধু এতটুকু কথার স্বীকৃতি দেয়া নয় বরং এ সংগে এ কথা মেনে নেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, সেখানে কোন চেষ্টা তদবীর ও সুপারিশ করা, জরিমানা দেয়া এবং কোন বুজর্গ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ও বন্ধন কোন কাজে লাগবে না। কেউ কারোর পাপের কাফ্ফারা হবে না। আল্লাহর আদালতে ইনসাফ হবে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন এবং মানুষের ঈমান ও আমল ছাড়া আর কোন জিনিসকে মোটেই মূল্য দেয়া হবে না। এরূপ বিশ্বাস ছাড়া আখেরাতকে মেনে নেয়া অর্থহীন। কিন্তু ইহুদী ও খৃস্টানরা ঐ দিক দিয়েই নিজেদের ঈমান আকীদা নষ্ট করে ফেলেছে। কাজেই তাদের আখেরাতের প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

২৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে যে শরীয়াত নাযিল করেছেন তাকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না।

২৮. অর্থাৎ তারা ঈমান আনবে ও আল্লাহর সত্য দীনের অনুসারী হয়ে যাবে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা নয়। বরং যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ হচ্ছে ঃ তাদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য খতম হয়ে যাবে। তারা পৃথিবীতে শাসন ও কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। বরং পৃথিবীতে মানুষের জীবন ব্যবস্থার লাগাম এবং মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করা ও তাদের নেতৃত্ব দান করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সত্যের অনুসারীদের হাতে থাকবে এবং তারা এ সত্যের অনুসারীদের অধীনে অনুগত জীবন যাপন করবে।

যিম্মীদেরকে ইসলামী শাসনের আওতায় যে নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ দান করা হবে তার বিনিময়কে জিযিয়া বলা হয়। তাছাড়া তারা যে হুকুম মেনে চলতে এবং ইসলামী শাসনের আওতাধীনে বসবাস করতে রাযী হয়েছে, এটা তার একটা আলামত হিসেবেও চিহ্নিত হবে। "নিজের হাতে জিযিয়া দেয়"–এর অর্থ হচ্ছে, সহজ সরল আনুগত্যের ভঙ্গীতে জিযিয়া আদায় করা। আর "পদানত হয়ে থাকে"–এর অর্থ, পৃথিবীতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের নয় বরং যে মুমিন ও মুসলিমরা আল্লাহর খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করছে তাদের হাতে থাকবে।

প্রথম দিকে ইহুদী ও খৃস্টানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে মাজুসীদের (অগ্নিউপাসক) থেকে জিযিয়া আদায় করে তাদেরকে যিম্মী করেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে আরবের বাইরের সব জাতির ওপর সাধারণভাবে এ আদেশ প্রয়োগ করেন।

উনিশ শতকে মুসলিম মিল্লাতের পতন ও অবনতির যুগে এ 'জিযিয়া' সম্পর্কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বড় বড় সাফাই পেশ করা হতো। সেই পদাংক অনুসারী কিছু লোক এখনো রয়েছে এবং তারা এখনো এ ব্যাপারে সাফাই গেয়ে চলেছে। কিন্তু আল্লাহর দীন এসবের অনেক উর্ধে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহের ভূমিকায় অবতীর্ণ, তাদের কাছে কৈফিয়ত দান ও ওযর পেশ করার তার কোন প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার ও সোজা কথায়, যারা আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করে না এবং নিজেদের বা অন্যের উদ্ভাবিত ভুল পথে চলে, তারা বড় জোর এতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার রাখে যে, নিজেরা

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ
ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا
مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا
وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

৫ রুকূ'

ইহুদীরা বলে, 'উযাইর আল্লাহর পুত্র[২৯] এবং খৃষ্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এগুলো একেবারেই আজগুবী ও উদ্ভট কথাবার্তা। তাদের পূর্বে যারা কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল তাদের দেখাদেখি তারা এগুলো নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে থাকে।[৩০] আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক তাদের ওপর, তারা কোথা থেকে ধোঁকা খাচ্ছে! তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের উলামা ও দরবেশদেরকে নিজেদের খোদায় পরিণত করেছে।[৩১] এবং এভাবে মার্‌য়াম পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদের এক মা'বুদ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করার হুকুম দেয়া হয়নি, এমন এক মা'বুদ যিনি ছাড়া ইবাদাত লাভের যোগ্যতা সম্পন্ন আর কেউ নেই। তারা যেসব মুশরিকী কথা বলে তা থেকে তিনি পাক পবিত্র।

ভুল পথে চলতে চাইলে চলতে পারে, কিন্তু আল্লাহর যমীনে কোন একটি জায়গায়ও মানুষের ওপর শাসন চালাবার এবং নিজেদের ভ্রান্ত নীতি অনুযায়ী মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত করার আদৌ কোন অধিকার তাদের নেই। দুনিয়ার যেখানেই তারা এ জিনিসটি লাভ করবে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তাদেরকে এ অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ জীবন বিধানের অনুগত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোই হবে মুমিনদের কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এ জিযিয়া কিসের বিনিময়ে দেয়? এর জবাব হচ্ছে, ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের আওতাধীনে নিজেদের গোমরাহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য অমুসলিমদের যে স্বাধীনতা দান করা হয় এটা তারই মূল্য। আর যে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তাদের এ স্বাধীনতাকে কাজে লাগাবার অনুমতি দেয় এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে তার শাসন ও আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনায় এ অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত। এর সবচেয়ে বড় ফায়দা হচ্ছে এই যে, জিযিয়া আদায় করার সময় প্রতি বছর যিম্মীদের মধ্যে একটি অনুভূতি জাগতে থাকবে। প্রতি বছর তারা মনে করতে থাকবে,

তারা আল্লাহর পথে যাকাত দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত আর এর পরিবর্তে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। এটা তাদের কত বড় দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্যের কারাগারে তারা বন্দী।

২৯. উযাইর বলা হয়েছে "আযূরা"কে (EZRA)। ইহুদীরা তাঁকে নিজেদের ধর্মের মুজাদ্দিদ বা পুনরুজ্জীবনকারী বলে মানে। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের লোক ছিলেন বলে মনে করা হয়। ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের পরে বনী ইসরাঈলের ওপর যে কঠিন দুর্যোগ নেমে আসে তার ফলে শুধু যে তাওরাত দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তা নয়, বরং বেবিলনের বন্দী জীবন যাপন ইসরাঈলী জনগণকে তাদের শরীয়াত, ঐতিহ্য এবং জাতীয় ভাষা ইবরানীর সাথে পর্যন্ত অপরিচিত করে দিয়েছিল। অবশেষে এ উযাই'র বা আযরা বাইবেলের আদি পুস্তক সংকলন করেন। তিনি শরীয়াতকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এ কারণেই বনী ইসরাঈল তাকে অত্যাধিক ভক্তি করে। এ ভক্তি এতদূর বেড়ে যায় যে, কোন কোন দল তাঁকে আল্লাহর পুত্র পর্যন্ত বানিয়ে দেয়। এখানে কুরআন মজীদের বক্তব্য এ নয় যে, সমস্ত ইহুদী জাতি একজোট হয়ে আযূরাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে। বরং কুরআন বলতে চায়, ইহুদীদের আল্লাহ সম্পর্কিত বিশ্বাসে এত বেশী গলদ দেখা দেয় যে, আযূরাকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করার মতো লোকও তাদের সমাজে পয়দা হয়ে যায়।

৩০. অর্থাৎ মিসর, গ্রীস, রোম, ইরান এবং অন্যান্য দেশে যেসব জাতি আগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের পৌরানিক ধ্যান-ধারণা ও অলীক চিন্তা-ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে তারাও তেমনি ধরনের ভ্রষ্ট আকীদা-বিশ্বাস তৈরী করে নিতো। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আল মায়েদাহ ১০১ টীকা)।

৩১. হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আদী ইবনে হাতেম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খৃষ্টান। ইসলাম গ্রহণ করার সময় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআনের এ আয়াতটিতে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের উলামা ও দরবেশদেরকে খোদা বানিয়ে নেবার যে দোষারোপ করা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য কি? জবাবে তিনি বলেন, তারা যেগুলোকে হারাম বলতো তোমরা সেগুলোকে হারাম বলে মেনে নিতে এবং তারা যেগুলোকে হালাল বলতো তোমরা সেগুলোকে হালাল বলে মেনে নিতে, একথা কি সত্য নয়? জবাবে হযরত আদী বলেন, হাঁ, একথা তো ঠিক, আমরা অবশ্যি এমনটি করতাম। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, বস্, এটিই তো হচ্ছে তাদেরকে প্রভু বানিয়ে নেয়া। এ থেকে জানা যায়, আল্লাহর কিতাবের সনদ ছাড়াই যারা মানব জীবনের জন্য জায়েয ও নাজায়েযের সীমানা নির্ধারণ করে তারা আসলে নিজেদের ধারণা মতে নিজেরাই আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদায় সমাসীন হয়। আর যারা শরীয়াতের বিধি রচনার এ অধিকার তাদের জন্য স্বীকার করে নেয় তারা তাদেরকে কার্যত প্রভুতে পরিণত করে।

কাউকে আল্লাহর পুত্রে পরিণত করা এবং কাউকে শরীয়াত রচনার অধিকার দেয়া সংক্রান্ত অভিযোগ দু'টি পেশ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী মিথ্যা। তারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাদের আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা এতই ভ্রান্ত যে, তার কারণে তাদের আল্লাহকে মানা, না মানা সমান হয়ে গেছে।

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ
وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ
ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ
بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ
وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ
يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ
هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

তারা চায় তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান না করে ক্ষান্ত হবেন না, তা কাফেরদের কাছে যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। আল্লাহই তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি একে সকল প্রকার দীনের ওপর বিজয়ী করেন,[৩২] মুশরিকরা একে যতই অপছন্দ করুক না কেন।

হে ঈমানদারগণ। এ আহলে কিতাবদের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা মানুষের ধন–সম্পদ অন্যায় পদ্ধতিতে খায় এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে।[৩৩] যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় আযাবের সুখবর দাও। একদিন আসবে যখন এ সোনা ও রূপাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতপর তারই সাহায্যে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে-এ সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। নাও, এখন তোমাদের জমা করা সম্পদের স্বাদগ্রহণ কর।

৩২. কুরআনের মূল আয়াতে "আদ্‌দীন" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমি এর অনুবাদে বলেছি, "সকল প্রকার দীন" ইতিপূর্বে যেমন বলে এসেছি, এ দীন শব্দটি আরবী ভাষায় এমন একটি জীবন ব্যবস্থা বা জীবন পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয় যার প্রতিষ্ঠাতাকে সনদ ও

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

আসলে যখন আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই আল্লাহর লিখন ও গণনায় মাসের সংখ্যা বারো চলে আসছে।[৩৪] এর মধ্যে চারটি হারাম মাস। এটিই সঠিক বিধান। কাজেই এ চার মাসে নিজেদের ওপর জুলুম করো না।[৩৫] আর মুশরিকদের সাথে সবাই মিলে লড়াই করো যেমন তারা সবাই মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করে।[৩৬] এবং জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথেই আছেন।

অনুসরণযোগ্য বলে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করতে হয়। কাজেই এ আয়াতে রসূল পাঠাবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও সত্য দীন এনেছেন তাকে দীন জাতীয় বা দীনের শ্রেণীভুক্ত অন্য কথায় জীবন বিধান পদবাচ্য সমস্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থার ওপর জয়ী করবেন। অন্য কথায় রসূলকে কখনো এ উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়নি যে, তিনি যে জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তা অন্যান্য জীবন ব্যবস্থার কাছে পরাজিত হয়ে ও সেগুলোর পদানত থেকে তাদের দেয়া সুযোগ সুবিধা ভোগ করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করে রাখবে। বরং তিনি আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতির প্রতিনিধি হয়ে আসেন এবং নিজের মনিবের সত্য ও ন্যায়ের ব্যবস্থাকে বিজয়ী দেখতে চান। দুনিয়ায় যদি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর ব্যবস্থার আওতাধীনেই তার দেয়া সুযোগ–সুবিধা হাত পেতে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন জিযিয়া আদায় করার মাধ্যমে যিম্মীরা নিজেদের অধীনতার জীবন মেনে নেয়। (দেখুন, আয্ যুমার ৩ টীকা, আল মুমিন ৪৩ টীকা, আশ শূরা ২০ টীকা)

৩৩. অর্থাৎ এ জালেমরা শুধু ফতোয়া বিক্রি করে, ঘুষ খেয়ে এবং নজরানা লুটে নিয়েই ক্ষান্ত হয় না। এ সংগে তারা এমন সব ধর্মীয় নিয়ম–কানুন ও রসম–রেওয়াজ উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করে যেগুলোর সাহায্যে লোকেরা তাদের কাছ থেকে নিজেদের পরকালীন মুক্তি কিনে নেয়। তাদের উদর পূর্তি না করলে লোকদের জীবন–মরণ, বিয়ে–শাদী এবং আনন্দ ও বিষাদ কোন অবস্থাই অতিবাহিত হতে পারে না। তারা এদেরকে নিজেদের ভাগ্য ভাংগা–গড়ার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। উপরন্তু নিজেদের এসব স্বার্থ উদ্ধারের মতলবে তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে গোমরাহীতে লিপ্ত করে রাখে। যখনই কোন সত্যের দাওয়াত সমাজের সংশোধনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে তখনই সবার আগে এরাই নিজেদের জ্ঞানীসুলভ প্রতারণা ও ধান্দাবাজীর অস্ত্র ব্যবহার করে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

"নাসী" (মাসকে পিছিয়ে দেয়া) তো কুফরীর মধ্যে আরো একটি কুফরী কর্ম, যার সাহায্যে এ কাফেরদেরকে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত করা হয়ে থাকে। কোন বছর একটি মাসকে হালাল করে নেয় এবং কোন বছর তাকে আবার হারাম করে নেয়, যাতে আল্লাহর হারাম করা মাসের সংখ্যাও পুরা করতে পারে এবং আল্লাহর হারাম করাকে হালালও করতে পারে।[৩৭] তাদের খারাপ কাজগুলোকে তাদের জন্য শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সত্য–অস্বীকারকারীদেরকে হেদায়াত দান করেন না।

৩৪. অর্থাৎ যখন আল্লাহ চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই এ হিসাবও চলে আসছে যে, প্রতি মাসে প্রথমার চাঁদ একবারই ওঠে। এ হিসাবে এক বছরে ১২ মাস হয়। একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের লোকেরা 'নাসী'র কারণে ১৩ বা ১৪ মাসে বছর বানিয়ে ফেলতো। যে হারাম মাসকে তারা হালাল করে নিয়েছে তাকে এভাবে বছরের পঞ্জিকায় জায়গা দেবার ব্যবস্থা করতো। সামনের দিকে এ বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা করা হবে।

৩৫. অর্থাৎ যেসব উপযোগিতা ও কল্যাণ কারিতার ভিত্তিতে এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা হারাম করা হয়েছে সেগুলোকে নষ্ট করো না এবং এ দিনগুলোতে শান্তি ভংগ করে বিশৃংখলা ছড়িয়ে নিজেদের ওপর জুলুম করো না। চারটি হারাম মাস বলতে যিলকদ্দ, যিল হজ্জ ও মহররম মাস হজ্জের জন্য এবং উমরাহের জন্য রজব মাস।

৩৬. অর্থাৎ মুশরিকরা যদি উল্লেখিত মাসগুলোতে লড়াই করা থেকে বিরত না হয় তাহলে তারা যেমন একমত ও একজোট হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, তোমরাও তেমনি একমত ও একজোট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়ো। সূরা আল বাকারার ১৯৪ আয়াতটি এর ব্যাখ্যা পেশ করছে।

৩৭. আরবে 'নাসী' ছিল দু' ধরনের। এক ধরনের 'নাসী'র প্রেক্ষিতে আরববাসীরা যুদ্ধ–বিগ্রহ, লুট–তরাজ ও হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য কোন হারাম মাসকে হালাল গণ্য করতো এবং তার বদলে কোন হালাল মাসকে হারাম গণ্য করে হারাম মাসগুলোর সংখ্যা পূর্ণ করতো। আর দ্বিতীয় ধরনের 'নাসী'র প্রেক্ষিতে তারা চান্দ্রবর্ষকে সৌরবর্ষ সদৃশ করার জন্য তাতে 'কাবীসা' নামে একটা মাস বাড়িয়ে দিতো। তাদের উদ্দেশ্য হতো, এভাবে হজ্জ সবসময় একই মওসুমে অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। ফলে চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী বিভিন্ন মওসুমে হজ্জ অনুষ্ঠিত হবার ফলে তাদের যে কষ্ট করতে হতো তা থেকে তারা

রেহাই পাবে। এভাবে ৩৩ বছর ধরে হজ্জ তার আসল সময়ে অনুষ্ঠিত না হয়ে অন্য তারিখে অনুষ্ঠিত হতো এবং শুধুমাত্র ৩৪ বছরের মাথায় একবার যিল হজ্জ মাসের ৯-১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় তাঁর প্রদত্ত খুতবায় একথাটিই বলেছিলেন :

ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض

"এ বছর হজ্জের সময় ঘুরতে ঘুরতে ঠিক তার প্রাকৃতিক হিসেব অনুযায়ী আসল তারিখে এসে গেছে।"

এ আয়াতে 'নাসী'কে নিষিদ্ধ ও হারাম গণ্য করে আরবের মূর্খ লোকদের উল্লেখিত দু'টি উদ্দেশ্য ও স্বার্থান্বেষণকেই বাতিল করে দেয়া হয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্যটি তো একটি সুস্পষ্ট গুনাহ ছিল। এ ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই। এর অর্থ তো এটাই ছিল, আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালালও করে নেয়া হবে আবার কৌশল করে আইন মেনে চলার একটা বহিকাঠামোও তৈরী করে রেখে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি আপাত দৃষ্টিতে নির্দোষ ও কল্যাণ ভিত্তিক মনে হলেও আসলে এটাও ছিল আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম বিদ্রোহ। মহান আল্লাহ তাঁর আরোপিত ফরযগুলোর জন্য সৌরবর্ষের হিসেবের পরিবর্তে চান্দ্রবর্ষের হিসেব অবলম্বন করেছেন যেসব গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকারিতার ভিত্তিতে তিনি এসব করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে, তাঁর বান্দা কালের সকল প্রকার আবর্তনের মধ্যে সব রকমের অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে তাঁর হুকুম আহকাম মেনে চলতে অভ্যস্ত হবে। যেমন রমযান, কখনো আসে গরমকালে, কখনো বর্ষাকালে আবার কখনো শীতকালে। ঈমানদাররা এসব পরিবর্তিত অবস্থায় রোযা রেখে অনুগত থাকার প্রমাণও পেশ করে এবং এ সংগে সর্বোত্তম নৈতিক প্রশিক্ষণও লাভ করে। অনুরূপভাবে হজ্জও চান্দ্রমাসের হিসেব অনুযায়ী বিভিন্ন মওসুমে আসে। এসব মওসুমের ভালো-মন্দ সব ধরনের অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করে বান্দা আল্লাহর পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্রে যায় এবং বন্দেগীর ক্ষেত্রে পরিপক্কতা অর্জন করে। এখন যদি এক দল লোক নিজেদের সফর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও মেলা-পার্বনের সুবিধার্থে চিরদিনের জন্য অনুকূল মওসুমে হজ্জের প্রচলন করে, তাহলে সেটা হবে এরূপ যেন মুসলমানরা কোন সম্মেলন করে সিদ্ধান্ত নিল যে, আগামী থেকে রমযান মাসকে ডিসেম্বর বা জানুয়ারীর সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে। এর পরিষ্কার মানে দাঁড়ায়, বান্দারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেরাই স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেছে। এ জিনিসটিরই নাম কুফরী। এ ছাড়াও একটি বিশ্বজনীন দীন ও জীবন ব্যবস্থা, যা সমগ্র মানব জাতির জন্য এসেছে তা কোন্ সৌরমাসকে রোযা ও হজ্জের জন্য নির্ধারিত করবে? যে মাসটিই নির্ধারিত হবে সেটিই পৃথিবীর সব এলাকার বাসিন্দাদের জন্য সমান সুবিধাজনক মওসুম হবে না। কোথাও তা পড়বে গরম কালে, কোথাও পড়বে শীতকালে, কোথাও তখন হবে বর্ষাকাল, কোথাও হবে খরার মওসুম, কোথাও তখন ফসল কাটার কাজ চলবে আবার কোথাও চলবে বীজ বপন করার কাজ।

এ সংগে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ৯ হিজরীর হজ্জের সময় 'নাসী' বাতিল করার এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। পরের বছর ১০ হিজরীতে চান্দ্র মাসের হিসেব অনুযায়ী ঠিক নির্ধারিত তারিখেই হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত সঠিক তারিখেই হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৬ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ![৩৮] তোমাদের কী হলো, যখনই তোমাদের আল্লাহর পথে বের হতে বলা হলো, অমনি তোমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে? তোমরা কি আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছো? যদি তাই হয়, তাহলে তোমরা মনে রেখো, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ সরঞ্জাম আখেরাতে খুব সামান্য বলে প্রমাণিত হবে।[৩৯] তোমরা যদি না বের হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন[৪০] এবং তোমাদের জায়গায় আর একটি দলকে ওঠাবেন,[৪১] আর তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

৩৮. তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলাকালে যে ভাষণটি নাযিল হয়েছিল এখান থেকে সেটিই শুরু হচ্ছে।

৩৯. এর দু'টো অর্থ হতে পারে। এক, আখেরাতের অনন্ত জীবন ও সেখানকার সীমা–সংখ্যাহীন সাজ সরঞ্জাম দেখার পর তোমরা জানতে পারবে, দুনিয়ার সামান্য জীবনকালে সুখৈশ্বর্য ভোগের যে বড় বড় সম্ভাবনা তোমাদের করায়ত্ব ছিল এবং যে সর্বাধিক পরিমাণ বিলাস সামগ্রী তোমরা লাভ করতে পেরেছিলে তা আখেরাতের সেই সীমাহীন সম্ভাবনা এবং সেই অন্তহীন নিয়ামতে পরিপূর্ণ সুবিশাল রাজ্যের তুলনায় কিছুই নয়। তখন তোমরা নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অদূরদর্শিতার জন্য এ মর্মে আফসোস করতে থাকবে যে, আমার হাজার বুঝানো সত্ত্বেও দুনিয়ার তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী লাভের মোহে তোমরা কেন নিজেদেরকে এ চিরন্তন ও বিপুল পরিমাণ লাভ থেকে বঞ্চিত রাখলে। দুই, দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী আখেরাতে কোন কাজে লাগবে না। এখানে যতই ঐশ্বর্য সম্পদ ও সাজ–সরঞ্জাম তোমরা সংগ্রহ করো না কেন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথেই সব কিছু থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে। মৃত্যুর পরপারে যে জগত রয়েছে এখানকার কোন জিনিসই সেখানে তোমাদের সাথে স্থানান্তরিত হবে না। এখানকার জিনিসের যে অংশটুকু তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুরবানী করেছো এবং যে জিনিসকে ভালবাসার ওপর

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ۗ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٠﴾ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

তোমরা যদি নবীকে সাহায্য না কর, তাহলে কোন পরোয়া নেই। আল্লাহ তাকে এমন সময় সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বের করে দিয়েছিল, যখন সে ছিল মাত্র দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা দু'জন গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সাথীকে বলছিল, "চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"[৪২] সে সময় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তার ওপর মানসিক প্রশান্তি নাযিল করেন এবং এমন সেনাদল পাঠিয়ে তাকে সাহায্য করেন, যা তোমরা দেখোনি এবং তিনি কাফেরদের বক্তব্যকে নীচু করে দেন। আর আল্লাহর কথা তো সমুন্নত আছেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।—বের হও, হালকা কিংবা ভারী যাই হওনা কেন, এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজের ধন-প্রাণ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।[৪৩]

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছো একমাত্র সেই অংশই তোমরা সেখানে পেতে পারো।

৪০. এ থেকেই শরীয়াতের এ বিধি জানা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সাধারণ ঘোষণা (যুদ্ধ করার জন্য সর্বসাধারণ মুসলমানদেরকে আহবান জানানো) না দেয়া হবে কিংবা কোন এলাকার সকল মুসলিম অধিবাসীকে বা মুসলমানদের কোন দলকে জিহাদের জন্য বের হবার হুকুম দেয়া না হবে ততক্ষণ তো জিহাদ ফরযে কিফায়াই থাকে। অর্থাৎ যদি কিছু লোক জিহাদ করতে থাকে তাহলে বাদবাকি লোকদের ওপর থেকে ঐ ফরয রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যখন মুসলমানদের শাসকের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে সর্বাত্মক জিহাদের জন্য আহবান জানানো হবে অথবা কোন বিশেষ দলকে বা বিশেষ এলাকার অধিবাসীদেরকে ডাকা হবে তখন যাদেরকে ডাকা হয়েছে

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

হে নবী! যদি সহজ লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং সফর হাল্‌কা হতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই তোমার পেছনে চলতে উদ্যত হতো। কিন্তু তাদের জন্য তো এ পথ বড়ই কঠিন হয়ে গেছে।[৪৪] এখন তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, "যদি আমরা চলতে পারতাম তাহলে অবশ্যি তোমাদের সাথে চলতাম।" তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ ভালো করেই জানেন তারা মিথ্যাবাদী।

তাদের ওপর জিহাদ "ফরযে আইন" হয়ে যাবে। এমনকি যে ব্যক্তি কোন যথার্থ অসুবিধা বা ওযর ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না তার ঈমানই গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪১. অর্থাৎ আল্লাহর কাজ তোমাদের ওপর নির্ভরশীল নয়। তোমরা করলে তা হবে এবং তোমরা না করলে হবে না, এমন নয়। আসলে আল্লাহ যে তোমাদের তাঁর দীনের খেদমতের সুযোগ দিচ্ছেন, এটা তাঁর মেহেরবানী ও অনুগ্রহ। যদি তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এ সুযোগ হারাও, তাহলে তিনি অন্য কোন জাতিকে এ সুযোগ দেবেন এবং তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

৪২. মক্কার কাফেররা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল, এটা সে সময়ের কথা। যে রাতে তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সে রাতেই তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেছিলেন। ইতিপূর্বে দু'জন চারজন করে যেতে যেতে মুসলমানদের বেশীর ভাগ মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিল। মক্কায় কেবলমাত্র তারাই থেকে গিয়েছিল যারা ছিল একেবারেই অসহায় অথবা যাদের ঈমানের মধ্যে মোনাফেকীর মিশ্রণ ছিল এবং তাদের ওপর কোন প্রকারে ভরসা করা যেতে পারতো না। এ অবস্থায় যখন তিনি জানতে পারলেন, তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তখন তিনি শুধুমাত্র একজন সাথী হযরত আবু বকরকে (রা) সংগে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়লেন। নিশ্চয়ই তাঁর পেছনে ধাওয়া করা হবে, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি মদীনার পথ ছেড়ে (যা ছিল উত্তরের দিকে) দক্ষিণের পথ অবলম্বন করলেন। এখানে তিন দিন পর্যন্ত তিনি 'সাওর' নামক পর্বত গুহায় আত্মগোপন করে থাকলেন। তাঁর রক্ত পিপাসু দুশমনেরা তাঁকে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মক্কার আশপাশের উপত্যকাগুলোর কোন জায়গা খুঁজতে তারা বাকি রাখেনি। এভাবে তাদের কয়েকজন খুঁজতে খুঁজতে যে গিরি গুহায় তিনি লুকিয়েছিলেন তার মুখে পৌঁছে গেলো। হযরত আবু বকর (রা) ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, দুশমনদের একজন যদি একটু ভিতরে ঢুকে উঁকি দেয়, তাহলে তাদের দেখে ফেলবে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৭ রুকূ'

হে নবী! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন, তুমি তাদের অব্যাহতি দিলে কেন? (তোমার নিজের তাদের অব্যাহতি না দেয়া উচিত ছিল) এভাবে তুমি জানতে পারতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যুক।[৪৫] *যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা কখনো তোমার কাছে তাদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আবেদন জানাবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের খুব ভাল করেই জানেন। এমন আবেদন তো একমাত্র তারাই করে; যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না, যাদের মনে রয়েছে সন্দেহ এবং এ সন্দেহের দোলায় তারা দোদুল্যমান।*[৪৬]

সাল্লাম একটুও বিচলিত না হয়ে হযরত আবু বকরকে এ বলে সান্ত্বনা দিলেন, "চিন্তিত হয়ো না, মন খারাপ করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

৪৩. এখানে হাল্‌কা ও ভারী শব্দ দু'টি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ হচ্ছে, বের হবার হুকুম যখন হয়ে গেছে তখন তোমাদের বের হয়ে পড়তে হবে। স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে হোক বা অনিচ্ছায়–অনাগ্রহে, সচ্ছলতায় ও সমৃদ্ধির মধ্যে হোক বা দারিদ্রের মধ্যে, বিপুল পরিমাণ সাজসরঞ্জাম থাক বা একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় হোক, অনুকূল অবস্থা হোক বা প্রতিকূল অবস্থা, যৌবন ও সুস্বাস্থের অধিকারী হও বা বৃদ্ধ ও দুর্বল হও, সর্বাবস্থায় বের হতে হবে।

৪৪. অর্থাৎ মোকাবিলা রোমের মতো বড় শক্তির সাথে। একদিকে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মওসুম এসে গেছে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। তার ওপর নতুন বছরের বহু প্রত্যাশিত ফসল কাটার সময় এসে গেছে। এসব কারণে তাবুকের সফর তাদের কাছে বড়ই কঠিন ও চড়ামূল্যের বলে মনে হচ্ছিল।

৪৫. কোন কোন মুনাফিক বানোয়াট ওযর পেশ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি চেয়েছিল। তিনিও নিজের স্বভাবগত কোমলতা

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

যদি সত্যিসত্যিই তাদের বের হবার ইচ্ছা থাকতো তাহলে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। কিন্তু তাদের অংশগ্রহণ আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়ই ছিল না।[৪৭] *তাই তিনি তাদের শিথিল করে দিলেন এবং বলে দেয়া হলো ঃ "বসে থাকো, যারা বসে আছে তাদের সাথে।" যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তাহলে তোমাদের মধ্যে অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বাড়াতো না। তারা ফিত্‌না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে প্রচেষ্টা চালাতো। আর তোমাদের লোকদের অবস্থা হচ্ছে, তাদের মধ্যে এখনো এমন লোক আছে যারা তাদের কথা আড়ি পেতে শোনে। আল্লাহ এ জালেমদের খুব ভাল করেই চেনেন।*

ও উদারতার ভিত্তিতে তারা যে নিছক ভাওতাবাজী করছে, তা জানা সত্ত্বেও তাদের অব্যাহতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ এটা পছন্দ করেননি। এ ধরনের উদার নীতি সংগত নয় বলে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। অব্যাহতি দেবার কারণে এ মুনাফিকরা নিজেদের মুনাফিকী ও প্রতারণামূলক কার্যকলাপ গোপন করার সুযোগ পেয়ে গেলো। যদি তাদের অব্যাহতি না দেয়া হতো এবং তারপর তারা ঘরে বসে থাকতো তাহলে তখন তাদের মিথ্যা ঈমানের দাবী সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়তো।

৪৬. এ থেকে জানা যায়, ইসলাম ও কুফরীর দ্বন্দ্ব একটি মাপকাঠি স্বরূপ। এর মাধ্যমে খাঁটি মুমিন ও নকল ঈমানের দাবীদারের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে যে ব্যক্তি মনপ্রাণ দিয়ে ইসলামকে সমর্থন করে এবং নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ ও উপায় উপকরণ তাকে বিজয়ী করার সংগ্রামে নিয়োজিত করে এবং এ পথে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে কুন্ঠিত হয় না, সে-ই সাচ্চা মুমিন। পক্ষান্তরে এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে সহযোগিতা করতে ইতস্তত করে এবং কুফরের শির উঁচু হবার বিপদ সামনে দেখেও ইসলামের বিজয়ের জন্য জান-মালের কুরবানী করতে কুন্ঠিত হয়, তার এ মনোভাব ও কার্যকলাপ এ সত্যটিকে সুস্পষ্ট করে দেয় যে, তার অন্তরে ঈমান নেই।

৪৭. অর্থাৎ মনের তাগিদ ছাড়া অনিচ্ছায় যুদ্ধযাত্রা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ছিল না। কারণ তাদের মধ্যে যখন জিহাদে অংশগ্রহণ করার প্রেরণা ও সংকল্প অনুপস্থিত ছিল এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য প্রাণপাত করার কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল না তখন শুধুমাত্র

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ
وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا
تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾

এর আগেও এরা ফিত্‌না সৃষ্টির চেষ্টা করেছে এবং তোমাদের ব্যর্থ করার জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ধরনের কৌশল খাটিয়েছে। এ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য এসে গেছে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে বলে, "আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে পাপের ঝুঁকির মধ্যে ফেলবেন না।"[৪৮] শুনে রাখো, এরা তো ঝুঁকির মধ্যেই পড়ে আছে[৪৯] এবং জাহান্নাম এ কাফেরদের ঘিরে রেখেছে।[৫০]

মুসলমানদের সামনে লজ্জিত হবার ভয়ে অসন্তুষ্ট মনে অথবা কোন অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা জোরেশোরে এগিয়ে আসতো এবং এটা সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো। পরবর্তী আয়াতে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

৪৮. যেসব মুনাফিক মিথ্যা বাহানা বানিয়ে পিছনে থেকে যাবার অনুমতি চাচ্ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতই বেপরোয়া ছিল যে, আল্লাহর পথ থেকে পেছনে সরে যাবার জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক ধরনের বাহানাবাজীর আশ্রয় নিতো। জাদ্দ ইবনে কায়েস নামক তাদের একজনের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলো, আমি একজন সৌন্দর্য পিপাসু লোক আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার এ দুর্বলতা জানে যে, মেয়েদের ব্যাপারে আমি সবর করতে পারি না। আমার ভয় হয়, রোমান মেয়েদের দেখে আমার পদস্খলন না হয়ে যায়। কাজেই আপনি আমাকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেবেন না এবং এ অক্ষমতার কারণে আমাকে এ জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে রেহাই দিন.

৪৯. অর্থাৎ তারা তো ফিতনা বা পাপের ঝুঁকি থেকে রেহাই পাওয়ার দোহাই দিচ্ছে কিন্তু আসলে তারা আকণ্ঠ ডুবে আছে মুনাফিকী, মিথ্যাচার ও রিয়াকারীর মত জঘন্য পাপের মধ্যে। নিজেদের ধারণা মতে তারা মনে করছে, ছোট ছোট ফিতনার সম্ভাবনার ব্যাপারে ভয় ও পেরেশানি প্রকাশ করে তারা নিজেদের বড় ধরনের মুত্তাকী হবার প্রমাণ পেশ করে যাচ্ছে। অথচ কুফর ও ইসলামের চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকর সংঘর্ষকালে ইসলামের পক্ষ সমর্থনে ইতস্তত করে তারা আরো বড় পাপ এবং আরো বড় ফিত্‌নার মধ্যে নিজেদের ফেলে দিচ্ছে যার চাইতে বড় কোন ফিতনার কথা কল্পনাই করা যায় না।

৫০. অর্থাৎ তাকওয়ার এ প্রদর্শনী তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি। বরং মুনাফিকীর লানতই তাদেরকে জাহান্নামের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করেছে.

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾

তোমার ভাল কিছু হলে তা তাদের কষ্ট দেয় এবং তোমার ওপর কোন বিপদ এলে তারা খুশী মনে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে, "ভালই হয়েছে, আমরা আগেভাগেই আমাদের ব্যাপার সেরে নিয়েছি।" তাদের বলে দাও, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোন (ভাল বা মন্দ) কিছুই আমাদের হয় না। আল্লাহই আমাদের অভিভাবক ও কার্যনির্বাহক এবং ঈমানদারদের তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।"[৫১]

তাদের বলে দাও, "তোমরা আমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছো তা দু'টি ভালর একটি ছাড়া আর কি?[৫২] অন্যদিকে আমরা তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছি তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ হয় নিজেই তোমাদের শাস্তি দেবেন, না হয় আমাদের হাত দিয়ে দেয়াবেন? তাহলে এখন তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকছি।"

৫১. এখানে দুনিয়াপূজারী ও আল্লাহে বিশ্বাসী মানসিকতার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়া পূজারী নিজের প্রবৃত্তির আকাংখা পূর্ণ করার জন্য সবকিছু করে। কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ওপরই তার প্রবৃত্তির সুখ ও আনন্দ নির্ভর করে। এ উদ্দেশ্য লাভে সক্ষম হলেই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আর উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হলে সে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। তারপর বস্তুগত কার্যকারণই প্রায় তার সমস্ত সহায় অবলম্বনের কাজ করে। সেগুলো অনুকূল হলে তার মনোবল বেড়ে যেতে থাকে। আর প্রতিকূল হলে সে হিম্মত হারাতে থাকে। অন্যদিকে আল্লাহে বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সবকিছু করে। এ কাজে সে নিজের শক্তি বা বস্তুগত উপায় উপকরণের ওপর ভরসা করে না বরং সে পুরোপুরি নির্ভর করে আল্লাহর সত্তার ওপর। সত্যের পথে কাজ করতে গিয়ে

সে বিপদ–আপদের সম্মুখীন হলে অথবা সাফল্যের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করলে, উভয় অবস্থায় সে মনে করে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে। বিপদ আপদ তার মনোবল ভাংতে পারে না। আবার সাফল্যও তাকে অহংকারে লিপ্ত করতে পারে না। কারণ, প্রথমত সে উভয়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বলে মনে করে। সব অবস্থায় সে আল্লাহর সৃষ্ট এ পরীক্ষায় নিরাপদে উত্তীর্ণ হতে চায়। দ্বিতীয়ত তার সামনে কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য থাকে না এবং তার মাধ্যমে সে নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার করে না। তার সামনে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি মাত্র উদ্দেশ্য। বৈষয়িক সাফল্য লাভ করা বা না করার মাধ্যমে তার এ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হওয়া বা দূরে অবস্থান করার ব্যাপারটি পরিমাপ করা যায় না। বরং আল্লাহর পথে জান ও মাল উৎসর্গ করার যে দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছিল তা সে কতদূর পালন করেছে। তার ভিত্তিতেই তার পরিমাপ করা যায়। যদি এ দায়িত্ব সে পালন করে থাকে তাহলে দুনিয়ায় সে সম্পূর্ণরূপে হেরে গেলেও তার পূর্ণ আস্থা থাকে যে, সে যে আল্লাহর জন্য ধন–প্রাণ উৎসর্গ করেছে তিনি তার প্রতিদান নষ্ট করে দেবেন না। তারপর বৈষয়িক কার্যকারণ ও উপায় উপকরণের আশায় সে বসে থাকে না। সেগুলোর অনুকূল ও প্রতিকূল হওয়া তাকে আনন্দিত ও নিরানন্দ করে না। সে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে। তিনিই কার্যকারণ ও উপায়–উপকরণ রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক। কাজেই তাঁর ওপর ভরসা করে সে প্রতিকূল অবস্থায়ও এমন হিম্মত ও দৃঢ় সংকল্প সহকারে কাজ করে যায় যে, দুনিয়া পূজারীরা একমাত্র অনুকূল অবস্থায়ই সেভাবে কাজ করতে পারে। তাই মহান আল্লাহ বলেন, ঐ সব দুনিয়া পূজারী মুনাফিকদের বলে দাও, আমাদের ব্যাপারটা তোমাদের থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন। তোমাদের আনন্দ ও নিরানন্দের রীতি–পদ্ধতি আমাদের থেকে আলাদা। তোমাদের নিশ্চিন্ততা ও অস্থিরতার উৎস এক, আমাদের অন্য।

৫২. মুনাফিকরা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী এ সময়ও কুফর ও ইসলামের সংঘাতে অংশ না নিয়ে নিজেরা চরম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে বলে মনে করছিল। এ সংঘাতের পরিণামে রসূল ও তাঁর সাহাবীরা বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন, না রোমীয়দের সামরিক শক্তির সাথে সংঘর্ষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যান, দূরে বসে তারা তা দেখতে চাচ্ছিল। এখানে তাদের প্রত্যাশার জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, দু'টি ফলাফলের মধ্যে তোমরা একটির প্রকাশের অপেক্ষা করছো। অথচ ঈমানদারদের জন্য উভয় ফলাফলই যথার্থ ভাল ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বিজয়ী হলে, এটা যে তাদের জন্যে ভাল একথা সবার জানা। কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের পথে প্রাণ দান করে যদি তারা মাটিতে বিলীন হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়াবাসীরা তাদের চরম ব্যর্থ বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে এটিও আর এক রকমের সাফল্য। কারণ মুমিন একটি দেশ জয় করলো কি করলো না অথবা কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত করলো কি করলো না, এটা তার সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি নয়। বরং মুমিন তার আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য নিজের মন, মস্তিষ্ক, দেহ ও প্রাণের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করেছে কিনা, এটাই তার মাপকাঠি। এ কাজ যদি সে করে থাকে তাহলে দুনিয়ার বিচারে তার ফলাফল শূন্য হলেও আসলে সে সফলকাম।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۚ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝٥٣ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝٥٤ فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ۚ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝٥٥

তাদের বলে দাও, "তোমরা নিজেদের ধন–সম্পদ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ব্যয় কর অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যয় কর[৫৩] তা গৃহীত হবে না। কারণ তোমরা ফাসেক গোষ্ঠী।" তাদের দেয়া সম্পদ গৃহীত না হবার এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, নামাযের জন্য যখন আসে আড়মোড়া ভাংতে ভাংতে আসে এবং আল্লাহর পথে খরচ করলে তা করে অনিচ্ছাকৃতভাবে। তাদের ধন–দৌলত ও সন্তানের আধিক্য দেখে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। আল্লাহ চান, এ জিনিসগুলোর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে তাদের শাস্তি দিতে।[৫৪] আর তারা যদি প্রাণও দিয়ে দেয়, তাহলে তখন তারা থাকবে সত্য অস্বীকার করার অবস্থায়।[৫৫]

৫৩. কোন কোন মুনাফিক এমনও ছিল, যারা নিজেদেরকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে যদিও প্রস্তুত ছিল না, তবে তারা এ জিহাদ ও এ চেষ্টা–সাধনা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন থেকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে নিজেদের সমস্ত মর্যাদা খুইয়ে ফেলতে এবং নিজেদের মুনাফিকীকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিতেও চাচ্ছিল না। তাই তারা বলছিল, বর্তমানে আমরা যদিও অক্ষমতার কারণে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি চাচ্ছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্য অর্থ সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত।

৫৪. অর্থাৎ এ ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্তুতির মায়ার ডোরে আবদ্ধ হয়ে তারা যে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করেছে, সে জন্য মুসলিম সমাজে তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। এতদিনকার আরবীয় সমাজে তাদের যে প্রভাব–প্রতিপত্তি, মান–মর্যাদা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল নব্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণ মাটিতে মিশে যাবে। যেসব নগণ্য দাস ও দাস পুত্ররা এবং মামুলী ধরনের কৃষক ও রাখালরা ঈমানী নিষ্ঠা ও আন্তরিকাতার প্রমাণ পেশ করেছে, এ নতুন সমাজে তারা হবে মর্যাদাশালী। অন্যদিকে

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ
يَفْرَقُونَ ۝٥٦ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ
وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۝٥٧ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا
مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۝٥٨ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا
مَا آتَىٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ
وَرَسُولُهُۥ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَٰغِبُونَ ۝٥٩

তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলে, আমরা তোমাদেরই লোক। অথচ তারা মোটেই তোমাদের অন্তরভুক্ত নয়। আসলে তারা এমন একদল লোক যারা তোমাদের ভয় করে। যদি তারা কোন আশ্রয় পেয়ে যায় অথবা কোন গিরি–গুহা কিংবা ভিতরে প্রবেশ করার মত কোন জায়গা, তাহলে দৌড়ে গিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকবে।[৫৬]

হে নবী! তাদের কেউ কেউ সাদকাহ বন্টনের ব্যাপারে তোমার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাচ্ছে। এ সম্পদ থেকে যদি তাদের কিছু দেয়া হয় তাহলে তারা খুশী হয়ে যায়, আর না দেয়া হলে বিগড়ে যেতে থাকে।[৫৭] *কতই না ভাল হতো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা কিছুই তাদের দিয়েছিলেন তাতে যদি তারা সন্তুষ্ট থাকতো*[৫৮] *এবং বলতো, "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদের আরো অনেক কিছু দেবেন এবং তাঁর রসূলও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।*[৫৯] *আমরা আল্লাহরই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছি।*[৬০]

বংশানুক্রমিক সমাজনেতা ও সমাজপতিরা নিজেদের দুনিয়া প্রীতির কারণে মর্যাদাহীন হয়ে পড়বে।

হযরত উমরের (রা) মজলিসে একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেটি ছিল এ অবস্থার একটি চমকপ্রদ চিত্র। সুহাইল ইবনে আমর ও হারেস ইবনে হিশামের মতো বড় বড় কুরাইশী সরদাররা হযরত উমরের (রা) সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। সেখানে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে মামুলী পর্যায়ের কোন লোক হলেও হযরত উমর (রা) তাকে ডেকে নিজের কাছে বসাচ্ছিলেন এবং এ সমাজপতিদের সরে তার জন্য জায়গা করে দিতে বলছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সমাজপতিরা সরতে সরতে একেবারে মজলিসের

কিনারে গিয়ে পৌছলেন। বাইরে বের হয়ে এসে হারেস ইবনে হিশাম নিজের সাথীদের বললেন, তোমরা দেখলে তো আজ আমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হলো? সুহাইল ইবনে আমর বললেন, এতে উমরের কোন দোষ নেই। দোষ আমাদের। কারণ আমাদের যখন এ দীনের দিকে ডাকা হয়েছিল তখন আমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম এবং এ লোকেরা দৌড়ে এসেছিল। তারপর এ দু' সমাজপতি দ্বিতীয়বার হযরত উমরের কাছে হাযির হলেন। এবার তারা বললেন, আজ আমরা আপনার আচরণ দেখলাম। আমরা জানি, আমাদের ক্রটির কারণেই এ অবস্থা হয়েছে। কিন্তু এখন এর প্রতিবিধানের কোন উপায় আছে কি? হযরত উমর (রা) মুখে কোন জবাব দিলেন না। তিনি শুধু রোম সীমান্তের দিকে ইশারা করলেন। মানে, তিনি বলতে চাচ্ছিলেন, এখন জিহাদের ময়দানে জান-মাল উৎসর্গ করো, তাহলে হয়তো তোমরা নিজেদের হারানো মর্যাদা আবার ফিরে পাবে।

৫৫. অর্থাৎ এতসব লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যেও তাদের জন্য আরো বড় বিপদ হবে এই যে, তারা নিজেদের মধ্যে যে মুনাফিকী চরিত্র বৈশিষ্ট লালন করছে তার বদৌলতে মরার আগ পর্যন্ত তারা সত্যিকার ঈমানলাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং নিজেদের পার্থিব সুখ-সুবিধা ধ্বংস করার পর দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নেবে যে, তাদের আখেরাত হবে এর চাইতেও অনেক বেশী খারাপ।

৫৬. মদীনার এ মুনাফিকদের বেশীরভাগই ছিল ধনী ও বয়স্ক। ইবনে কাসীর তাঁর আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থে তাদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে শুধুমাত্র একজন যুবকের নাম পাওয়া যায়। তাদের একজনও গরীব নয়। এরা মদীনায় বিপুল ভূ-সম্পত্তি ও চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বিরাট কারবারের মালিক ছিল। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা এদের সুযোগ-সন্ধানী ও সুবিধাবাদী বানিয়ে দিয়েছিল। ইসলাম যখন মদীনায় পৌছলো এবং জনবসতির একটি বড় অংশ পূর্ণ আন্তরিকতা ও ঈমানী জোশের সাথে ইসলাম গ্রহণ করলো তখন এ শ্রেণীটি পড়লো উভয় সংকটে। তারা দেখলো এ নতুন দীন একদিকে তাদের নিজেদের গোত্রের অধিকাংশ বরং তাদের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত ঈমানের নেশায় মাতিয়ে তুলেছে। তাদের বিপরীত সারিতে দাঁড়িয়ে তারা যদি এখন কুফরী ও অস্বীকারের ঝাণ্ডা উত্তোলিত করে রাখে, তাহলে তাদের নেতৃত্ব-সরদারী, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান, সুনাম-সুখ্যাতি সবকিছুই হারিয়ে যাবে। এমনকি তাদের নিজেদের পারিবারিক পরিমণ্ডলেই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার আশংকা দেখা দেবে। অন্যদিকে এ দীনের সাথে সহযোগিতা করার অর্থ হবে, তাদেরকে সমগ্র আরবের এমনকি চারপাশের সমস্ত জাতি-গোত্র ও রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকা। সত্য ও ন্যায় যে আসলেই একটি মূল্যবান জিনিস তার প্রেমসুধা পান করে যে মানুষ সব রকমের বিপদ আপদ মাথা পেতে নিতে পারে, এমনকি প্রয়োজনে নিজের জান-মালও পর্যন্ত কুরবানী করতে পারে। পার্থিব স্বার্থে মোহ ও প্রবৃত্তির গোলামীতে আকন্ঠ ডুবে থাকার কারণে সে কথা উপলব্ধি করার যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়কে শুধুমাত্র স্বার্থ ও সুবিধাবাদের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ঈমানের দাবী করার মধ্যেই তারা নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণের সবচেয়ে অনুকূল ও উপযোগী পথ খুঁজে পেয়েছিল। কারণ, তারা এভাবে একদিকে নিজেদের জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের বাহ্যিক মান-সম্ভ্রম, সহায়-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য

যথাযথভাবে টিকিয়ে রাখতে পারবে। অন্যদিকে একনিষ্ঠ মুমিন হওয়াটাও তাদের এড়িয়ে যাওয়া দরকার, যাতে আন্তরিকতার পথ অবলম্বন করার ফলে অনিবার্যভাবে যেসব বিপদ–আপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। তাদের এ মানসিক অবস্থাকে এখানে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আসলে তারা তোমাদের সাথে নেই। বরং ক্ষতির ভয় তাদেরকে জবরদস্তি তোমাদের সাথে বেঁধে দিয়েছে। যে জিনিসটি তাদের নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করাতে বাধ্য করেছে তা হচ্ছে এই ভীতি যে, মদীনায় থাকা অবস্থায় যদি তারা প্রকাশ্যে অমুসলিম হয়ে বাস করতে থাকে তাহলে তাদের সমস্ত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে এমনকি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সাথেও তাদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটবে। আর যদি তারা মদীনা ত্যাগ করে তাহলে নিজেদের সম্পদ–সম্পত্তি ও ব্যবসা–বাণিজ্য ত্যাগ করতে হবে। আবার কুফরীর প্রতিও তাদের এতটা আন্তরিকতা ছিল না যে, তার জন্য তারা এসব ক্ষতি বরদাশত করতে পারতো। এ উভয় সংকটে পড়ে তারা বাধ্য হয়ে মদীনায় থেকে গিয়েছে। মন না চাইলেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামায পড়তো। এবং যাকাতকে "জরিমানা" ভেবে হলেও অগত্যা আদায় করতো। নয়তো প্রতিদিন জিহাদ, প্রতিদিন কোন না কোন ভয়াবহ দুশমনের সাথে পাঞ্জা কষাকষি এবং প্রতিদিন জান ও মাল কুরবানীর যে বিপদ ঘাড়ে চেপে আছে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা এত বেশী অস্থির যে, যদি তারা সাধারণ কোন সুড়ংগ তথা কোন গর্তও দেখতে পেতো এবং সেখানে গেলে নিরাপদ আশ্রয় লাভের সম্ভাবনা থাকতো তাহলে দৌড়ে গিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়তো।

৫৭. এ প্রথমবার আরবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী ধন–সম্পদের অধিকারী লোকদের ওপর যথারীতি যাকাত ধার্য করা হয়েছিল। তাদের কৃষি উৎপাদন, গবাদি পশু ও ব্যবসায় পণ্য এবং খনিজ দ্রব্য ও সোনা রূপার সঞ্চয় থেকে শতকরা আড়াই ভাগ, ৫ ভাগ, ১০ ভাগ ও ২০ ভাগ আদায় করা হতো। একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে এসব যাকাতের সম্পদ সংগ্রহ করা হতো এবং একটি কেন্দ্রে জমা করে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে খরচ করা হতো। এভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ–সম্পদ সংগৃহীত হয়ে আসতো এবং তার হাত দিয়ে তা লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, যা ইতিপূর্বে আরবের লোকেরা কখনো এক জন লোকের হাতে একই সংগে সংগৃহীত হতে এবং তাঁর হাত দিয়ে খরচ হতে দেখেনি। এ সম্পদ দেখে দুনিয়া পূজারী মুনাফিকদের জিভ দিয়ে লালা ঝরতো। তারা চাইতো, এ প্রবহমান নদী থেকে তারা যেন আশ মিটিয়ে পানি পান করতে পারে। কিন্তু এখানে তো ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। এখানে যিনি পানি পান করাচ্ছিলেন তিনি নিজের জন্য এবং নিজের সংশ্লিষ্টদের জন্য এ নদীর প্রতি বিন্দু পানি হারাম করে দিয়েছিলেন। কেউ আশা করতে পারতো না, তার হাতের পানির পেয়ালা হকদার ছাড়া আর কারোর ঠোঁট স্পর্শ করতে পারে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদকা বিতরণের অবস্থা দেখে মুনাফিকরা চাপা আক্রোশে গুমরে মরছিল। বন্টনের সময় তারা নানা অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করতো। তাদের আসল অভিযোগ ছিল, এ সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ আমাদের দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু এ আসল অভিযোগ গোপন করে তারা এ মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করতো যে, ইনসাফের সাথে সম্পদ বন্টন করা হচ্ছে না এবং এ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে।

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِىَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

৮ রুকূ'

এ সাদ্‌কাগুলো তো আসলে ফকীর[৬১] মিসকিনদের[৬২] জন্য। আর যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত[৬৩] এবং যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য।[৬৪] তাছাড়া দাস মুক্ত করার,[৬৫] ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করার,[৬৬] আল্লাহর পথে[৬৭] এবং মুসাফিরদের উপকারে[৬৮] ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিধান এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ।

তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা নিজেদের কথা দ্বারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, এ ব্যক্তি অতিশয় কর্ণপাতকারী।[৬৯] বলে দাও, "সে এরূপ করে কেবল তোমাদের ভালোর জন্যই।[৭০] সে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদেরকে বিশ্বাস করে।[৭১] তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমানদার তাদের জন্য সে পরিপূর্ণ রহমত। আর যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

৫৮. অর্থাৎ গনীমতের মাল থেকে যা কিছু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেন, তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকতো। অন্যদিকে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা যা কিছু উপার্জন করে এবং অর্থ উপার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উপকরণের মাধ্যমে যে ধরনের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি তারা লাভ করেছে তাকেই নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করতো।

৫৯. অর্থাৎ যাকাত ছাড়াও অন্য যে সমস্ত ধন-সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আসবে তা থেকে নিজ নিজ প্রাপ্য অনুযায়ী আমরা অংশ লাভ করতে থাকবো, যেমন ইতিপূর্বে করে এসেছি।

৬০. অর্থাৎ দুনিয়া ও তার তুচ্ছ সম্পদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নেই। বরং আমাদের দৃষ্টি রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর অনুগ্রহের ওপর। তাঁরই সন্তুষ্টি আমরা চাই। আমাদের সমস্ত

আশা-আকাংখা তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। তিনি যা দেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট।

৬১. ফকীর এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের জীবিকার ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী। কোন শারীরিক ত্রুটি বা বার্ধক্যজনিত কারণে কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে অথবা কোন সাময়িক কারণে আপাতত কোন ব্যক্তি অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য-সহায়তা পেলে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এ পর্যায়ের সব ধরনের অভাবী লোকের জন্য সাধারণভাবে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন এতীম শিশু, বিধবা নারী, উপার্জনহীন বেকার এবং এমন সব লোক যারা সাময়িক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।

৬২. মিসকীন শব্দের মধ্যে দীনতা, দুর্ভাগ্য পীড়িত অভাব, অসহায়তা ও লাঞ্ছনার অর্থ নিহিত রয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে সাধারণ অভাবীদের চাইতে যাদের অবস্থা বেশী খারাপ তারাই মিসকীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শব্দটির ব্যাখ্যা করে বিশেষ করে এমন সব লোকদেরকে সাহায্যলাভের অধিকারী গণ্য করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপায়-উপকরণ লাভ করতে পারেনি, ফলে অত্যন্ত অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু তাদের আত্মমর্যাদা সচেতনতা কারোর সামনে তাদের হাত পাতার অনুমতি দেয় না। আবার তাদের বাহ্যিক অবস্থাও এমন নয় যে, কেউ তাদেরকে দেখে অভাবী মনে করবে এবং সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে। হাদীসে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسئال الناس -

"যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ পায় না, যাকে সাহায্য করার জন্য চিহ্নিত করা যায় না এবং যে নিজে দাঁড়িয়ে কারোর কাছে সাহায্যও চায় না, সে-ই মিসকীন।" অর্থাৎ সে একজন সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র গরীব মানুষ।

৬৩. অর্থাৎ যারা সাদকা আদায় করা, আদায় করা ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা, সে সবের হিসেব-নিকেশ করা, খাতাপত্রে লেখা এবং লোকদের মধ্যে বন্টন করার কাজে সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত থাকে। ফকীর বা মিসকীন না হলেও এসব লোকের বেতন সর্বাবস্থায় সাদকার খাত থেকে দেয়া হবে। এখানে উচ্চারিত এ শব্দগুলো এবং এ সূরার ১০৩ আয়াতের শব্দাবলী خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা উসূল করো) একথাই প্রমাণ করে যে, যাকাত আদায় ও বন্টন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদ নিজের ও নিজের বংশের (বনী হাশেম) ওপর যাকাতের মাল হারাম ঘোষণা করেছিলেন। কাজেই তিনি নিজে সবসময় বিনা পারিশ্রমিকে যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজ করেন। বনী হাশেমদের অন্য লোকদের জন্যও তিনি এ নীতি নির্ধারণ করে যান। তিনি বলে যান, তারা যদি বিনা

পারিশ্রমিকে এ কাজ করে তাহলে এটা তাদের জন্য বৈধ। আর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ বিভাগের কোন কাজ করলে তা তাদের জন্য বৈধ নয়। তার বংশের কোন লোক যদি সাহেবে নেসাব (অর্থাৎ কমপক্ষে যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দেয়া ফরয) হয়, তাহলে তার ওপর যাকাত দেয়া ফরয হবে। কিন্তু যদি সে গরীব, অভাবী, ঋণগ্রস্ত ও মুসাফির হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য যাকাত নেয়া হারাম হবে। তবে বনী হাশেমদের নিজেদের যাকাত বনী হাশেমরা নিতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, নিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ তাও না জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৬৪. মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার যে হুকুম এখানে দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা ইসলামের বিরোধিতায় ব্যাপকভাবে তৎপর এবং অর্থ দিয়ে যাদের শত্রুতার তীব্রতা ও উগ্রতা হ্রাস করা যেতে পারে অথবা যারা কাফেরদের শিবিরে অবস্থান করছে ঠিকই কিন্তু অর্থের সাহায্যে সেখান থেকে ভাগিয়ে এনে মুসলমানদের দলে ভিড়িয়ে দিলে তারা মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে কিংবা যারা সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং তাদের পূর্বেকার শত্রুতা বা দুর্বলতাগুলো দেখে আশংকা জাগে যে, অর্থ দিয়ে তাদের বশীভূত না করলে তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরে যাবে, এ ধরনের লোকদেরকে স্থায়ীভাবে বৃত্তি দিয়ে বা সাময়িকভাবে এককালীন দানের মাধ্যমে ইসলামের সমর্থক ও সাহায্যকারী অথবা বাধ্য ও অনুগত কিংবা কমপক্ষে এমন শত্রুতে পরিণত করা যায়, যারা কোন প্রকার ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। এ খাতে গনীমাতের মাল ও অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকেও ব্যয় করা যেতে পারে এবং প্রয়োজন হলে যাকাতের তহবিল থেকেও ব্যয় করা যায়। এ ধরনের লোকদের জন্য ফকীর, মিসকিন বা মুসাফির হবার শর্ত নেই। বরং ধনী ও বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের যাকাত দেয়া যেতে পারে।

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে "তালীফে কলব্" তথা মন জয় করার উদ্দেশ্যে বহু লোককে বৃত্তি দেয়া এবং এককালীন দান করা হতো। কিন্তু তাঁর পরেও এ খাতটি অপরিবর্তিত ও অব্যাহত রয়েছে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সহযোগীদের মতে, হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমরের (রা) আমল থেকে এ খাতটি রহিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন "তালীফে কলবের" জন্য কাউকে কিছু দেয়া জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে তালীফে কলবের উদ্দেশ্যে ফাসেক মুসলমানদেরকে যাকাত তহবিল থেকে দেয়া যেতে পারে কিন্তু কাফেরদের দেয়া যেতে পারে না। অন্যান্য কতিপয় ফকীহের মতে, "মুআল্লাফাতুল কুলূব" (যাদের মন জয় করা ইপ্সিত হয়) এর খাত আজো অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজন দেখা দিলে এ খাতে ব্যয় করা যেতে পারে।

হানাফীগণ এ প্রসঙ্গে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর উয়াইনা ইবনে হিস্ন ও আক্রা ইবনে হাবেস হযরত আবু বকরের (রা) কাছে আসে এবং তাঁর কাছে একটি জমি চায়। তিনি তাদেরকে জমিটির একটি দানপত্র লিখে দেন। তারা এ দানপত্রকে আরো পাকাপোক্ত করার জন্য অন্যান্য প্রধান সাহাবীগণের সাক্ষও এতে সন্নিবেশ করতে চায়। সে মতে অনেক সাক্ষ সংগৃহীত

হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন হযরত উমরের (রা) কাছে সাক্ষ নিতে যায় তখন তিনি দানপত্রটি পড়ে তাদের সামনেই সেটি ছিঁড়ে ফেলেন। তিনি তাদেরকে বলেন, অবশ্যি "তালীফে কলূব" করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের দান করতেন। কিন্তু তখন ছিল ইসলামের দুর্বলতার যুগ। আর এখন আল্লাহ ইসলামকে তোমাদের মতো লোকদের প্রতি নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এ ঘটনার পর তারা হযরত আবু বকরের (রা) কাছে এসে অভিযোগ করে এবং তাঁকে টিটকারী দিয়ে বলে ঃ খলীফা কি আপনি, না উমর? কিন্তু হযরত আবু বকর নিজেও এর কোন প্রতিবাদ করেননি। কিংবা অন্যান্য সাহাবীদের একজনও হযরত উমরের এ মতের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেননি। এ থেকে হানাফীগণ এ মর্মে প্রমাণ পেশ করেছেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি তারা অর্জন করেছে তখন যে কারণে প্রথম দিকে "মুআল্লাফাতুল কুলূবের" অংশ রাখা হয় তা আর বর্তমান রইলো না। এ কারণে সাহাবীগণের "ইজমা"র মাধ্যমে এ অংশটি চিরকালের জন্য বাতিল হয়ে গেছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এ প্রসঙ্গে প্রমাণ পেশ করে বলেন, "তালীফে কলূব"–এর জন্য যাকাতের মাল দেবার ব্যাপারটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মকাণ্ড থেকে প্রমাণিত নয়। হাদীসে আমরা যতগুলো ঘটনা পাই তা থেকে একথাই জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা) "তালীফে কলূবের" জন্য কাফেরদেরকে যা কিছু দেবার তা গনীমাতের মাল থেকেই দিয়েছেন, যাকাতের মাল থেকে দেননি।

আমাদের মতে প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মুআল্লাফাতুল কুলূবের অংশ কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল হবার কোন প্রমাণ নেই। হযরত উমর (রা) যা কিছু বলেছেন তা নিসন্দেহে পুরোপুরি সঠিক ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র যদি তালীফে কলূবের জন্য অর্থ–সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজন নেই বলে মনে করে, তাহলেও এ খাতে কিছু না কিছু ব্যয় করতেই হবে এমন কোন ফরয তার ওপর কেউ চাপিয়ে দেয়নি। কিন্তু কখনো প্রয়োজন দেখা দিলে যাতে ব্যয় করা যেতে পারে এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ যে অবকাশ রেখেছেন তা অবশ্যি অক্ষুণ্ন থাকা উচিত। হযরত উমর ও সাহাবায়ে কেরামের যে বিষয়ে মতৈক্য হয়েছিল তা ছিল মূলত এই যে, তাঁদের আমলে যে অবস্থা ছিল তাতে তালীফে কলূবের জন্য কাউকে কিছু দেবার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করতেন না। কাজেই কোন গুরুত্বপূর্ণ দীনী স্বার্থ তথা প্রয়োজন ও কল্যাণের খাতিরে কুরআনে যে খাতটি রাখা হয়েছিল, সাহাবীগণের মতৈক্য তাকে খতম করে দিয়েছে বলে সিদ্ধান্তে আসার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতটি অবশ্যি এতটুকু পর্যন্ত তো সঠিক মনে হয় যে, সরকারের কাছে যখন অন্যান্য খাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ–সম্পদ মওজুদ থাকে তখন তালীফে কলূবের খাতে তার যাকাতের অর্থ–সম্পদ ব্যয় না করা উচিত। কিন্তু যখন যাকাতের অর্থ–সম্পদ থেকে এ খাতে সাহায্য নেবার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন তা ফাসেকদের জন্য ব্যয় করা যাবে, কাফেরদের জন্য ব্যয় করা যাবে না, এ ধরনের পার্থক্য করার কোন কারণই সেখানে নেই। কারণ কুরআনে মুআল্লাফাতুল কুলূবের যে অংশ রাখা হয়েছে, তা তাদের ঈমানের দাবীর কারণে নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, ইসলাম নিজের প্রয়োজনে তাদের তালীফে কলূব তথা মন জয় করতে চায়। আর শুধুমাত্র অর্থের সাহায্যেই এ ধরনের লোকদের মন জয় করা যেতে পারে। এ প্রয়োজন ও এ গুণ–বৈশিষ্ট যেখানেই

পাওয়া যাবে সেখানেই মুসলমানদের সরকার কুরআনের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার অধিকার রাখে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খাত থেকে কাফেরদের কিছুই দেননি। এর কারণ তাঁর কাছে অন্য খাতে অর্থ ছিল। নয়তো এ খাত থেকে কাফেরদেরকে দেয়া যদি অবৈধ হতো তাহলে তিনি একথা সুস্পষ্ট করে বলে দিতেন।

৬৫. দাসদেরকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা দু'ভাবে হতে পারে। এক, যে দাস তার মালিকের সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছে যে, সে একটা বিশেষ পরিমাণ অর্থ আদায় করলে মালিক তাকে দাসত্ব মুক্ত করে দেবে। তাকে দাসত্ব মুক্তির এ মূল্য আদায় করতে যাকাত থেকে সাহায্য করা যায়। দুই, যাকাতের অর্থে দাস কিনে তাকে মুক্ত করে দেয়া। এর মধ্যে প্রথমটির ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটিকে হযরত আলী (রা), সাঈদ ইবনে জুবাইর, লাইস, সাওরী, ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, হানাফী ও শাফেয়ীগণ নাজায়েয গণ্য করেন। অন্যদিকে ইবনে আব্বাস (রা) হাসান বাসরী, মালেক, আহমদ ও আবু সাওর একে জায়েয মনে করেন।

৬৬. অর্থাৎ এমন ধরনের ঋণগ্রস্ত, যারা নিজেদের সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলে তাদের কাছে নেসাবের চাইতে কম পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে। তারা অর্থ উপার্জনকারী হোক বা বেকার, আবার সাধারণ্যে তাদের ফকীর মনে করা হোক বা ধনী। উভয় অবস্থায় যাকাতের খাত থেকে তাদেরকে সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহ এ মত পোষণ করেছেন যে, অসৎকাজে ও অমিতব্যয়িতা করে যারা নিজেদের টাকা পয়সা উড়িয়ে দিয়ে ঋণের ভারে ডুবে মরছে, তাওবা না করা পর্যন্ত তাদের সাহায্য করা যাবে না।

৬৭. "আল্লাহর পথে" শব্দ দু'টি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব সৎকাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এমন সমস্ত কাজই এর অন্তরভুক্ত। এ কারণে কেউ কেউ এমত পোষণ করেছেন যে, এ হুকুমের প্রেক্ষিতে যাকাতের অর্থ যে কোন সৎকাজে ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম যুগের ইমামগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে মত পোষণ করেছেন সেটিই যথার্থ সত্য। তাদের মতে এখানে আল্লাহর পথে বলতে আল্লাহর পথে জিহাদ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য কুফরী ব্যবস্থাকে উৎখাত করে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। যেসব লোক এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে রত থাকে, তারা নিজেরা সচ্ছল ও অবস্থাসম্পন্ন হলেও এবং নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন না থাকলেও তাদের সফর খরচ বাবদ এবং বাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। অনুরূপ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত সময় ও শ্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যও যাকাতের অর্থ এককালীন বা নিয়মিত ব্যয় করা যেতে পারে।

এখানে আর একটি কথা অনুধাবন করতে হবে। প্রথম যুগের ইমামগণের বক্তব্যে সাধারণত এ ক্ষেত্রে "গাযওয়া" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি যুদ্ধের সমার্থক। তাই লোকেরা মনে করে যাকাতের ব্যয় খাতে ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথের যে খাত রাখা

হয়েছে তা শুধু যুদ্ধ–বিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু আসলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ যুদ্ধ–বিগ্রহের চাইতে আরো ব্যাপকতর জিনিসের নাম। কুফরের বাণীকে অবদমিত এবং আল্লাহর বাণীকে শক্তিশালী ও বিজয়ী করা আর আল্লাহর দীনকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম করার জন্য দাওয়াত ও প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে অথবা যুদ্ধ–বিগ্রহের চরম পর্যায়ে যেসব প্রচেষ্টা ও কাজ করা হয়, তা সবই এ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর আওতাভুক্ত।

৬৮. মুসাফির তার নিজের গৃহে ধনী হলেও সফরের মধ্যে সে যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তাহলে যাকাতের খাত থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে। এখানে কোন কোন ফকীহ শর্ত আরোপ করেছেন, অসৎকাজ করা যার সফরের উদ্দেশ্য নয় কেবল মাত্র সেই ব্যক্তিই এ আয়াতের প্রেক্ষিতে সাহায্যলাভের অধিকারী হবে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ ধরনের কোন শর্ত নেই। অন্যদিকে দীনের মৌলিক শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি, যে ব্যক্তি অভাবী ও সাহায্য লাভের মুখাপেক্ষী তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে তার পাপাচার বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে গোনাহগার ও অসৎ চরিত্রের লোকদেরকে বিপদে সাহায্য করলে এবং ভাল ও উন্নত ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের চরিত্র সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালালে তা তাদের চরিত্র সংশোধনের সবচেয়ে বড় উপায় হতে পারে।

৬৯. মুনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব দোষারোপ করতো তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি সবার কথা শুনতেন এবং প্রত্যেককে তার নিজের কথা বলার সুযোগ দিতেন। তাদের দৃষ্টিতে এ গুণটি ছিল দোষ। তারা বলতো, তিনি কান পাতলা লোক। যার ইচ্ছা হয়, সে–ই তার কাছে পৌঁছে যায়, যেভাবে ইচ্ছা তাঁর কান ভরে দেয় এবং তিনি তার কথা মেনে নেন। এ ব্যাপারটির তারা খুব বেশী করে চর্চা করতো। এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এই যে, সাচ্চা ঈমানদাররা এসব মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র, এদের শয়তানী কাজকারবার ও বিরোধিতাপূর্ণ কথাবার্তার রিপোর্ট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে দিতেন। এতে এ মুনাফিকরা গোস্বা হয়ে বলতো, আপনি আমাদের মতো সম্মানিত ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে যে কোন কাংগাল–ভিখিরীর দেয়া খবরে বিশ্বাস করে বসেন।

৭০. এ দোষারোপের জবাবে একটি ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলা হয়েছে। এর দু'টো দিক রয়েছে। এক, তিনি বিপর্যয়, বিকৃতি ও দুষ্কৃতির কথা শোনার মতো লোক নন। বরং তিনি শুধুমাত্র এমনসব কথায় কান দেন যেগুলোর মধ্যে রয়েছে মঙ্গল ও সুকৃতি এবং উম্মতের কল্যাণ ও দীনের কল্যাণের জন্য যেগুলোতে কান দেয়া শুভ ফলদায়ক। দুই, তাঁর এমন ধরনের হওয়া তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যদি তিনি প্রত্যেকের কথা না শুনতেন এবং ধৈর্য ও সংযমের সাথে কাজ না করতেন, তাহলে তোমরা ঈমানের যে মিথ্যা দাবী করে থাকো, শুভেচ্ছার যেসব লোক দেখানো বুলি আওড়ে যাও এবং আল্লাহর পথ থেকে সটকান দেয়ার জন্য যেসব ঠুনকো ওযর পেশ করে থাকো, সেগুলো ধৈর্যসহকারে শুনার পরিবর্তে তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। তার ফলে এ মদীনা শহরে জীবনধারণ করা তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়তো। কাজেই তাঁর এ গুণটি তোমাদের জন্য খারাপ নয় বরং ভাল।

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا ۚ إِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের সামনে কসম খায়। অথচ যদি তারা মুমিন হয়ে থাকে তাহলে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার কথা চিন্তা করবে, কারণ তাঁরাই এর বেশী হকদার। তারা কি জানে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মোকাবিলা করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। এটি একটি বিরাট লাঞ্ছনার ব্যাপার।

এ মুনাফিকরা ভয় করছে, মুসলমানদের ওপর এমন একটি সূরা না নাযিল হয়ে যায়, যা তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে।[৭২] *হে নবী। তাদের বলে দাও, "বেশ, ঠাট্টা করতেই থাকো, তবে তোমরা যে জিনিসটির প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয় করছো আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন।"*

৭১. অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকের কথা বিশ্বাস করেন, তোমাদের এ ধারণা ভুল। তিনি যদিও সবার কথাই শোনেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন একমাত্র যথার্থ ও সাচ্চা মুমিনদের কথা। তোমাদের যেসব শয়তানী ও দুষ্কৃতির খবর তাঁর কাছে পৌছে গেছে এবং যেগুলো তিনি বিশ্বাস করে ফেলেছেন, সেগুলো দুষ্কৃতিকারী চোগলখোরদের সরবরাহ করা নয় বরং সৎ ঈমানদার লোকরাই সেগুলো সরবরাহ করেছে এবং সেগুলো নির্ভরযোগ্য।

৭২. তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতে সঠিক অর্থে বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু বিগত আট নয় বছরের অভিজ্ঞতায় তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিল যে, তাঁর কাছে নিশ্চয়ই এমন কোন না কোন অতি প্রাকৃতিক তথ্য–মাধ্যম আছে, যার সাহায্যে তিনি তাদের গোপন কথা জানতে পারেন এবং এভাবে অনেক সময় কুরআনে (যাকে তারা রসূলের নিজের রচনা বলে মনে করতো) তাদের মুনাফিকী ও চক্রান্তসমূহ প্রকাশ করে দেন।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۚ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কথা বলছিলে? তাহলে তারা ঝটপট বলে দেবে, আমরা তো হাসি–তামাসা ও পরিহাস করছিলাম।[৭৩] তাদের বলো, "তোমাদের হাসি–তামাসা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলের সাথে ছিল? এখন আর ওযর পেশ করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছো, যদি আমরা তোমাদের একটি দলকে মাফও করে দেই তাহলে আরেকটি দলকে তো আমরা অবশ্যি শাস্তি দেবো। কারণ তারা অপরাধী।[৭৪]

৭৩. তাবুকের যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা প্রায়ই তাদের আসরগুলোয় বসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের নিয়ে হাসি–তামাসা ও বিদ্রূপ করতো। এভাবে তারা যাদেরকে সদুদ্দেশ্যে জিহাদ করতে প্রস্তুত দেখতো নিজেদের বিদ্রূপ পরিহাসের মাধ্যমে তাদেরকে হিম্মতহারা করার চেষ্টা করতো। হাদীসে এ ধরনের লোকদের বহু উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন এক মাহফিলে কয়েক জন মুনাফিক বসে আড্ডা দিচ্ছিল। তাদের একজন বললো, "আরে, এ রোমানদেরকেও কি তোমরা আরবদের মতো মনে করেছো? কালকে দেখে নিও এ যেসব বীর বাহাদুর লড়তে এসেছেন এদের সবাইকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।" দ্বিতীয় জন বললো, "মজা হবে তখন যখন একশটি করে চাবুক মারার নির্দেশ দেয়া হবে।" আরেক মুনাফিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বিপুলভাবে কর্মতৎপর দেখে নিজের ইয়ার বন্ধুদের বললো ঃ "উনাকে দেখো উনি রোম ও সিরিয়ার দূর্গ জয় করতে চলেছেন।"

৭৪. অর্থাৎ স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ভাঁড়দেরকে তো তবুও মাফ করে দেয়া যেতে পারে। কারণ তারা হয়তো এ ধরনের কথা শুধু এ জন্য বলে যাচ্ছে যে, তাদের কাছে দুনিয়ার কোন জিনিসেরই কোন গুরুত্ব নেই। সব কিছুকেই তারা হাল্কা নজরে দেখে। কিন্তু যারা জেনে–বুঝে নিজেদের ঈমানের দাবী সত্ত্বেও শুধুমাত্র রসূলকে এবং তিনি যে দীন এনেছেন তাকে হাস্যাস্পদ মনে করার কারণেই একথা বলে থাকে এবং যাদের বিদ্রূপের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানদারদের হিম্মত ও সাহস যেন নিস্তেজ হয়ে যায় এবং তারা যেন পূর্ণ শক্তিতে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে না পারে। এরূপ অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত যারা তাদেরকে তো কোনক্রমেই ক্ষমা করা যেতে পারে না। কারণ তারা ভাঁড় নয়, তারা অপরাধী।

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

৯ রুকূ'

মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরের দোসর। খারাপ কাজের হুকুম দেয়, ভাল কাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে।[৭৫] তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিশ্চিতভাবেই এ মুনাফিকরাই ফাসেক। এ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। তার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। সেটিই তাদের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপর এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।

৭৫. সমস্ত মুনাফিকের এটা সাধারণ বৈশিষ্ট। তারা সবাই খারাপ কাজের ব্যাপারে আগ্রহী এবং ভাল কাজের প্রতি তাদের প্রচণ্ড অনিহা ও শত্রুতা। কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করতে চাইলে তারা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তাকে পরামর্শ দেয়। তার মনে সাহস যোগায়। তাকে সাহায্য–সহায়তা দান করে। তার জন্য সুপারিশ পেশ করে। তার প্রশংসা করে। মোট কথা তার জন্য নিজেদের সব কিছুই তারা ওয়াকফ করে দেয়। মনেপ্রাণে তারা তার ঐ খারাপ কাজে শরীক হয়। অন্যদেরকেও তাতে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে এরা তার সাহস বাড়াতে থাকে। তাদের প্রতিটি অংগ ভংগী ও নড়াচড়া থেকে একথা প্রকাশ হতে থাকে যে, এ অসৎকাজটির বিস্তার ঘটলে তাদের হৃদয়ে কিছুটা প্রশান্তি অনুভূত হতে থাকে এবং তাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। অন্যদিকে কোন ভাল কাজ হতে থাকলে তার খবর শুনে তারা মনে ব্যথা অনুভব করতে থাকে। একথার কল্পনা করতেই তাদের মন বিষিয়ে ওঠে। এ সম্পর্কিত কোন প্রস্তাবও তারা শুনতে পারে না। এর দিকে কাউকে এগিয়ে যেতে দেখলে তারা অস্থির হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে পড়ে। তাকে এ সৎকাজ থেকে বিরত রাখার জন্য এবং বিরত রাখতে সক্ষম না হলে যাতে সে এ কাজে সফলকাম না হতে পারে এ জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তাছাড়া ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করার জন্য তাদের হাত কখনো এগিয়ে আসে না, এটাও তাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট। তারা কৃপণ হোক বা দানশীল সর্বাবস্থায় এটা দেখা যায়। তাদের অর্থ সিন্দুকে জমা থাকে, আর নয়তো হারাম পথে আসে হারাম পথে ব্যয় হয়। অসৎকাজের ব্যাপারে তারা যেন নিজেদের যুগের কারূন (অর্থাৎ দেদার অর্থ ব্যয় করতে পারংগম) হলেও সৎকাজের ব্যাপারে তারা চরম দরিদ্র।

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَٰقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَاضُوٓا ۚ أُولَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْءَاخِرَةِ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْخَٰسِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَٰهِيمَ وَأَصْحَٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَٰتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَٰتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

তোমাদের[৭৬] আচরণ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতোই। তারা ছিল তোমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী এবং তোমাদের চাইতে বেশী সম্পদ ও সন্তানের মালিক। তারপর তারা দুনিয়ায় নিজেদের অংশের স্বাদ উপভোগ করেছে এবং তোমরাও একইভাবে নিজেদের অংশের স্বাদ উপভোগ করেছো যেমন তারা করেছিল এবং তারা যেমন অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত ছিল তেমনি বিতর্কে তোমরাও লিপ্ত রয়েছো। কাজেই তাদের পরিণতি হয়েছে এই যে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে তাদের সমস্ত কাজকর্ম পণ্ড হয়ে গেছে এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাদের[৭৭] কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌছেনি? নূহের জাতির, আদ, সামূদ ও ইবরাহীমের জাতির, মাদ্ইয়ানের অধিবাসীদের এবং যে জনবসতিগুলো উল্টে দেয়া হয়েছিল সেগুলোর? তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিশানীসহ তাদের কাছে এসেছিলেন। এরপর তাদের ওপর জুলুম করা আল্লাহর কাজ ছিল না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল।[৭৮]

৭৬. মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা প্রথম পুরুষে করতে করতে হঠাৎ এখান থেকে আবার তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা শুরু হয়েছে।

৭৭. এখান থেকে আবার তাদের আলোচনা শুরু হয়েছে প্রথম পুরুষে।

৭৮. লূত জাতির জনবসতিগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۷۱﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ
جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۷۲﴾

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এরা ভাল কাজের হুকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে।[৮০] *এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবেই। অবশ্যি আল্লাহ সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। এ মুমিন পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এমন বাগান দান করবেন যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবহমান হবে এবং তারা তার মধ্যে চিরকাল বাস করবে। এসব চির সবুজ বাগানে তাদের জন্য থাকবে বাসগৃহ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।*

৭৯. অর্থাৎ তাদের সাথে আল্লাহর কোন শত্রুতা ছিল এবং তিনি তাদেরকে ধ্বংস করতে চাচ্ছিলেন বলে তারা ধ্বংস হয়নি। বরং প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই এমন ধরনের জীবন যাপন প্রণালী পছন্দ করে নিয়েছিল যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাদের চিন্তা–ভাবনা করার ও সামলে নেবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন। তাদেরকে উপদেশ দেবার ও পরিচালনা করার জন্য রসূল পাঠিয়েছিলেন। রসূলদের মাধ্যমে ভুল পথ অবলম্বন করার অনিষ্টকর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং কোন প্রকার রাখ ঢাক না করে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে সাফল্য ও ধ্বংসের পথ বাতলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা অবস্থার সংশোধনের কোন একটি সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করলো না এবং ধ্বংসের পথে চলার ওপর অবিচল থাকলো তখন তাদের অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হতেই হলো। তাদের ওপর এ জুলুম আল্লাহ করেননি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর এ জুলুম করেছিল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ
جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ
ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ ۚ وَمَا نَقَمُوٓا۟
إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُوا۟ يَكُ خَيْرًا
لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا۟ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى ٱلدُّنْيَا
وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

১০ রুকূ'

হে নবী![৮১] পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাফের ও মুনাফিক উভয়ের মোকাবিলা করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও।[৮২] শেষ পর্যন্ত তাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থান স্থল। তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে বলে, "আমরা ও কথা বলিনি।" অথচ তারা নিশ্চয়ই সেই কুফরীর কথাটা বলেছে।[৮৩] তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে। তারা এমনসব কিছু করার সংকল্প করেছিল যা করতে পারেনি।[৮৪] আল্লাহ ও তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন বলেই তাদের এত ক্রোধ ও আক্রোশ।[৮৫] এখন যদি তারা নিজেদের এহেন আচরণ থেকে বিরত হয়, তাহলে তাদের জন্যই ভাল। আর যদি বিরত না হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং পৃথিবীতে তাদের পক্ষ অবলম্বনকারী ও সাহায্যকারী কেউ থাকবে না।

৮০. মুনাফিকরা যেমন একটি জাতি বা দল তেমনি মুমিনরাও একটি স্বতন্ত্র দল। যদিও উভয় দলই প্রকাশ্যে ঈমানের স্বীকৃতি দেয়া এবং বাহ্যত ইসলামের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশ নেয় কিন্তু তবুও উভয়ের স্বভাব–প্রকৃতি, আচার–আচরণ, অভ্যাস, চিন্তা–পদ্ধতি ও কর্মধারা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেখানে কেবল মুখে ঈমানের দাবী কিন্তু অন্তরে সত্যিকার ঈমানের ছিঁটেফোটাও নেই সেখানে জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ড তার প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। বাইরে লেবেল আটা রয়েছে "মিশ্‌ক" (মৃগনাভি) বলে। কিন্তু লেবেলের নীচে যা কিছু আছে তা তার নিজের সমগ্র অস্তিত্বের সাহায্যে প্রমাণ করছে যে, সে গোবর ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে ঈমান যেখানে তার মূল তাৎপর্য সহকারে বিরাজিত সেখানে "মিশ্‌ক" তার নিজের চেহারা–আকৃতিতে নিজের খোশবু–সুরভিতে এবং নিজের বৈশিষ্ট–গুণাবলীতে সব

ব্যাপারেই ও সব পরীক্ষাতেই নিজের "মিশক" হবার কথা সাড়ম্বরে প্রকাশ করে যাচ্ছে। ইসলাম ও ঈমানের পরিচিত নামই বাহ্যত উভয় দলকে এক উম্মতের অন্তরভূক্ত করে রেখেছে। নয়তো আসলে মুনাফিক মুসলমানের নৈতিক বৃত্তি ও স্বভাব প্রকৃতি সত্যিকার ও সাচ্চা ঈমানদার মুসলমান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ কারণে মুনাফিকী স্বভাবের অধিকারী পুরুষ ও নারীরা একটি পৃথক দলে পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া, অসৎকাজে আগ্রহী হওয়া, নেকীর কাছ থেকে দূরে থাকা এবং সৎকাজের সাথে অসহযোগিতা করার সাধারণ বৈশিষ্টগুলো তাদেরকে পরস্পরের সাথে যুথিবদ্ধ করেছে এবং মুমিনদের সাথে কার্যত সম্পর্কহীন করে দিয়েছে। অন্যদিকে সাচ্চা মুমিন পুরুষ ও নারীরা একটি পৃথক দলে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা নেকীর কাজে আগ্রহী এবং গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আল্লাহর স্মরণ তাদের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অন্তরভুক্ত। আল্লাহর পথে অর্থ–সম্পদ ব্যয় করার জন্য তাদের অন্তর ও হাত সারাক্ষণ উন্মুক্ত থাকে। আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য তাদের জীবনাচরণের অন্তরভুক্ত। এ সাধারণ নৈতিক বৃত্তি ও জীবন যাপন পদ্ধতি তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছে এবং মুনাফিকদের দল থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

৮১. তাবুক যুদ্ধের পর যে ভাষণটি নাযিল হয়েছিল এখান থেকে সেই তৃতীয় ভাষণটি শুরু হচ্ছে।

৮২. এ পর্যন্ত মুনাফিকদের কার্যকলাপের ব্যাপারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিল। এর দু'টি কারণ ছিল। এক, তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের হাত এত বেশী শক্তিশালী হতে পারেনি যে, বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে তারা ভেতরের শত্রুদের সাথেও লড়াই করতে পারতো। দুই, যারা সন্দেহ–সংশয়ে ডুবে ছিল ঈমান ও প্রত্যয় লাভ করার জন্য তাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এ দু'টি কারণ এখন আর বর্তমান ছিল না। মুসলিম শক্তি এখন সমগ্র আরব ভুখণ্ডকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছিল এবং আরবের বাইরের শক্তিগুলোর সাথে সংঘাতের সিলসিলা শুরু হতে যাচ্ছিল। এ কারণে ঘরের এ শত্রুদের মাথা গুঁড়ো করে দেয়া এখন সম্ভবও ছিল এবং অপরিহার্যও হয়ে পড়েছিল। তাহলে তারা আর বিদেশী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দেশে আভ্যন্তরীণ বিপদ সৃষ্টি করতে পারতো না। তাছাড়া তাদেরকে ৯ বছর সময় দেয়া হয়েছিল চিন্তা–ভাবনা করার, বুঝার এবং আল্লাহর সত্য দীনকে যাচাই–পর্যালোচনা করার জন্য। তাদের মধ্যে যথার্থই কল্যাণ লাভের কোন আকাংখা থাকলে তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারতো। এরপর তাদেরকে আরো বেশী সুযোগ–সুবিধা দেয়ার আর কোন কারণ ছিল না। তাই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কাফেরদের সাথে সাথে এ মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও এবার জিহাদ শুরু করে দিতে হবে এবং এদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে উদার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে।

তাই বলে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও কঠোর নীতি অবলম্বন করার মানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়। আসলে এর অর্থ হচ্ছে, তাদের মুনাফিকী মনোভাব ও কর্মনীতিকে এ পর্যন্ত যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং যে কারণে তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থেকেছে, সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের সমাজেরই একটি

অংশ মনে করেছে এবং তারা ইসলামী দল ও সংগঠনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ও ইসলামী সমাজে মুনাফিকীর বিষ ছড়াবার যে সুযোগ পেয়েছে তা এখন ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। এখন যে ব্যক্তিই মুসলমানদের অন্তরভুক্ত হয়ে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করবে এবং যার কার্যধারা থেকে একথাও প্রকাশ হবে যে, সে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, সর্বসমক্ষে তার মুখোশ খুলে দিতে হবে এবং নিন্দা করতে হবে। মুসলিম সমাজে তার মর্যাদা ও আস্থা লাভের সকল প্রকার সুযোগ খতম করে দিতে হবে। তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। দলীয় পরামর্শের ক্ষেত্র থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে। আদালতে তার সাক্ষ অনির্ভরযোগ্য গণ্য করতে হবে। বড় বড় পদ ও মর্যাদার দরজা তার জন্য বন্ধ করে দিতে হবে। সভা–সমিতিতে তাকে গুরুত্ব দেবে না। প্রত্যেক মুসলমান তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে নিজে অনুভব করতে পারে যে, সমগ্র মুসলিম সমাজে কোথাও তার কোন মর্যাদা ও গুরুত্ব নেই এবং কারো অন্তরে তার জন্য এতটুকু সম্ভ্রমবোধও নেই। তারপর তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি কোন সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তার অপরাধ লুকানো যাবে না এবং তাকে ক্ষমা করাও যাবে না। বরং সর্বসমক্ষে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাতে হবে এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এ পর্যায়ে মুসলমানদেরকে এ নির্দেশটি দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া ইসলামী সমাজকে অবনতি ও পতনের আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ থেকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। যে জামায়াত ও সংগঠন তার নিজের মধ্যে মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতকদেরকে লালন করে এবং যেখানে দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা হয়, তার নৈতিক অধপতন এবং সবশেষে পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুনাফিকী প্লেগের মতো একটি মহামারী। আর মুনাফিক হচ্ছে এমন একটি ইঁদুর যে এ মহামারীর জীবাণু বহন করে বেড়ায়। তাকে জনবসতির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেয়ার অর্থ গোটা জনবসতিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। মুসলমানদের সমাজে একজন মুনাফিকের মর্যাদা ও সম্ভ্রম লাভ করার অর্থ হলো হাজার হাজার মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফিকী করতে দুঃসাহস যোগানো। এতে সাধারণ্যে এ ধারণা বিস্তার লাভ করে যে, এ সমাজে মর্যাদা লাভ করার জন্য আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সাচ্চা ঈমানদারীর কোন প্রয়োজন নেই। বরং মিথ্যা ঈমানের প্রদর্শনীর সাথে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করেও এখানে মানুষ ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে উঠতে পারে। একথাটিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

"যে ব্যক্তি কোন বিদআতপন্থীকে সম্মান করলো সে আসলে ইসলামের ইমারত ভেংগে ফেলতে সাহায্য করলো।"

৮৩. এখানে যে কথার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে সেটি কি ছিল? সে সম্পর্কে কোন নিশ্চিত তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছেনি। তবে হাদীসে বেশ কিছু কুফরী কথাবার্তার উল্লেখ করা হয়েছে যা মুনাফিকরা বলাবলি করতো। যেমন এক মুনাফিকের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّاۤ اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ
مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَاۤ
اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا
اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর কাছে অংগীকার করেছিল, যদি তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের ধন্য করেন তাহলে আমরা দান করবো এবং সৎ হয়ে যাবো। কিন্তু যখন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে বিত্তশালী করে দিলেন তখন তারা কার্পণ্য করতে লাগলো এবং নিজেদের অংগীকার থেকে এমনভাবে পিছটান দিল যে, তার কোন পরোয়াই তাদের রইলো না।[৮৬] ফলে তারা আল্লাহর সাথে এই যে অংগীকার ভংগ করলো এবং এই যে, মিথ্যা বলতে থাকলো, এ কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন ; তাঁর দরবারে তাদের উপস্থিতির দিন পর্যন্ত তা তাদের পিছু ছাড়বে না। তারা কি জানে না, আল্লাহ তাদের গোপন কথা ও গোপন সলা–পরামর্শ পর্যন্ত জানেন এবং তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ও পুরোপুরি অবগত?

সে তার আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন মুসলিম যুবকের সাথে কথা বলার সময় বললো ঃ "যদি এ ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলছেন তা সব সত্য হয় তাহলে আমরা সবাই গাধার চেয়েও অধম।" আর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তাবুকের সফরে এক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটনী হারিয়ে যায়। মুসলমানরা সেটি খুঁজে বেড়াতে থাকে। মুনাফিকদের একটি দল এ ব্যাপারটি নিয়ে নিজেদের মজলিসে খুব হাসাহাসি করতে থাকে। তারা বলতে থাকে, "ইনি তো আকাশের খবর খুব শুনিয়ে থাকেন কিন্তু নিজের উটনীটি এখন কোথায় সে খবরতো তাঁর জানা নেই।"

৮৪. তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যেসব ষড়যন্ত্র করেছিল এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ষড়যন্ত্রটির মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তাবুক থেকে ফেরার পথে মুসলিম সেনাদল যখন এমন একটি পাহাড়ী রাস্তার কাছে পৌছুল তখন কয়েক জন মুনাফিক নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিল যে, রাতে উঁচু গিরিপথ দিয়ে চলার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা পার্শ্ববর্তী গভীর খাদের মধ্যে

ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴿٨٠﴾

(তিনি এমনসব কৃপণ ধনীদেরকে ভাল করেই জানেন) যারা ঈমানদারদের সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রতি দোষ ও অপবাদ আরোপ করে এবং যাদের কাছে (আল্লাহর পথে দান করার জন্য) নিজেরা কষ্ট সহ্য করে যা কিছু দান করে তাছাড়া আর কিছুই নেই, তাদেরকে—বিদ্রূপ করে।[৮৭] *আল্লাহ এ বিদ্রূপকারীদেরকে বিদ্রূপ করেন। এদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। হে নবী! তুমি এ ধরনের লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো বা না করো, তুমি যদি এদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ ফাসেকদেরকে মুক্তির পথ দেখান না।*

ঠেলে ফেলে দেবে। নবী (সা) একথা জানতে পারলেন। তিনি সমগ্র সেনাদলকে গিরীপথ এড়িয়ে উপত্যকার সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন এবং নিজে শুধুমাত্র আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) ও হুযাইফা ইবনে ইয়ামনকে (রা) নিয়ে গিরিপথের মধ্য দিয়ে চলতে থাকলেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন, দশ বারোজন মুনাফিক মুখোশ পরে পিছনে পিছনে আসছে। এ অবস্থা দেখে হযরত হুযাইফা (রা) তাদের দিকে ছুটলেন, যাতে তিনি তাদের উটগুলোকে আঘাত করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তারা দূর থেকেই হযরত হুযাইফাকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে গেলো এবং ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সংগে সংগেই পালিয়ে গেলো।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে ষড়যন্ত্রটির কথা বর্ণিত হয়েছে সেটি হচ্ছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিশ্বস্ত সাথীরা রোমানদের সাথে লড়াই করে নিরাপদে ফিরে আসবেন, এটা মুনাফিকরা আশা করেনি। তাই তারা ঠিক করে নিয়েছিল যে, যখনই ওদিকে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাবে তখনই তারা মদীনায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই–এর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবে।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ
يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا
فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۗ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوْا
قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاِنْ رَّجَعَكَ
اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا
مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۗ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ
اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

১১ রুকূ'

যাদেরকে পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল তারা আল্লাহর রসূলের সাথে সহযোগিতা না করার ও ঘরে বসে থাকার জন্য আনন্দিত হলো এবং তারা নিজেদের ধন–প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অপছন্দ করলো। তারা লোকদেরকে বললো, "এ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বের হয়ো না।" তাদেরকে বলে দাও, জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও বেশী গরম, হায়! যদি তাদের সেই চেতনা থাকতো! এখন তাদের কম হাসা ও বেশী কাঁদা উচিত। কারণ তারা যে গোনাহ উপার্জন করেছে তার প্রতিদান এ ধরনেরই হয়ে থাকে (যে, সে জন্য তাদের কাঁদা উচিত)। যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আগামীতে তাদের মধ্য থেকে কোন দল জিহাদ করার জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় তাহলে পরিষ্কার বলে দেবে, "এখন আর তোমরা কখ্খনো আমার সাথে যেতে পারবে না এবং আমার সংগী হয়ে কোন দুশমনের সাথে লড়াইও করতে পারবে না। তোমরা তো প্রথমে বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, তাহলে এখন যারা ঘরে বসে আছে তাদের সাথে তোমরাও বসে থাকো।"

৮৫. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বে মদীনা ছিল আরবের মফস্বল এলাকার ছোট শহরগুলোর মত একটি মামুলী শহর। আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টিও অর্থ–সম্পদ ও মর্যাদা–প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কোন উঁচু পর্যায়ের ছিল না। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সা) সেখানে আগমনের পর আনসাররা যখন তাঁর সাথে সহযোগিতা করে

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

আর আগামীতে তাদের মধ্য থেকে কেউ মারা গেলে তার জানাযার নামাযও তুমি কখ্‌খনো পড়বে না। এবং কখনো তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তাদের মৃত্যু হয়েছে ফাসেক অবস্থায়।[৮৮] তাদের ধনাঢ্যতা ও তাদের অধিক সংখ্যক সন্তান সন্তুতি তোমাকে যেন প্রতারিত না করে। আল্লাহ তো তাদেরকে এ ধন ও সম্পদের সাহায্যে এ দুনিয়ায়ই সাজা দেবার সংকল্প করে ফেলেছেন এবং কাফের থাকা অবস্থায় তাদের মৃত্যু হোক—এটাই চেয়েছেন।

নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিল তখন মাত্র আট নয় বছরের মধ্যে এ মাঝারী ধরনের মফস্বল শহরটি সারা আরবের রাজধানীতে পরিণত হলো। আর সেই আওস ও খাযরাজের কৃষকরাই হয়ে গেলেন রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও পরিচালক। চতুরদিক থেকে বিজয়, গনীমাতের মাল ও ব্যবসায় বাণিজ্যের মুনাফা লব্ধ সম্পদ এ কেন্দ্রীয় শহরটির ওপর বৃষ্টি ধারার মতো বর্ষিত হতে থাকলো। এ অবস্থাটিকে সামনে রেখে আল্লাহ তাদেরকে এ বলে লজ্জা দিচ্ছেন যে, আমার এ নবীর বদৌলতে তোমাদের ওপর এসব নিয়ামত বর্ষণ করা হচ্ছে—এটাই কি তাঁর দোষ এবং এ জন্যই কি তার প্রতি তোমাদের এ ক্রোধ?

৮৬. উপরের আয়াতে মুনাফিকদের যে অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্ন আচরণের নিন্দা করা হয়েছিল তার আর একটি প্রমাণ তাদের নিজেদেরই জীবন থেকে পেশ করে এখানে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, আসলে এরা দাগী অপরাধী। এদের নৈতিক বিধানে কৃতজ্ঞতা, অনুগ্রহের স্বীকৃতি ও অংগীকার পালন ইত্যাদি গুণাবলীর নামগন্ধও পাওয়া যায় না।

৮৭. তাবুক যুদ্ধের সময় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদার জন্য আবেদন জানালেন তখন বড় বড় ধনশালী মুনাফিকরা হাত গুটিয়ে বসে রইলো। কিন্তু যখন নিষ্ঠাবান ঈমানদাররা সামনে এগিয়ে এসে চাঁদা দিতে লাগলেন তখন ঐ মুনাফিকরা তাদেরকে বিদ্রূপ করতে লাগলো। কোন সামর্থবান মুসলমান নিজের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনুযায়ী বা তার চেয়ে বেশী অর্থ পেশ করলে তারা তাদের অপবাদ দিতো যে, তারা লোক দেখাবার ও সুনাম কুড়াবার জন্য এ পরিমাণ দান করছে। আর যদি কোন গরীব মুসলমান নিজের ও নিজের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের অভুক্ত রেখে সামান্য পরিমাণ টাকাকড়ি নিয়ে

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُوا۟ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ أُو۟لُوا۟ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا۟ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

আল্লাহকে মেনে চলো এবং তাঁর রসূলের সহযোগী হয়ে জিহাদ করো, এ মর্মে যখনই কোন সূরা নাযিল হয়েছে তোমরা দেখেছো, তাদের মধ্যে যারা সামর্থবান ছিল তারাই তোমাদের কাছে আবেদন জানিয়েছে, জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে তাদেরকে রেহাই দেয়া হোক এবং তারা বলেছে, আমাদের ছেড়ে দাও। যারা বসে আছে তাদের সাথে আমরা বসে থাকবো। তারা গৃহবাসিনী মেয়েদের সাথে শামিল হয়ে ঘরে থাকতে চেয়েছে এবং তাদের দিলে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। তাই তারা কিছুই বুঝতে পারছে না।[৮৯] *অন্যদিকে রসূল ও তাঁর ঈমানদার সাথীরা নিজেদের জান–মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। সমস্ত কল্যাণ এখন তাদের জন্য এবং তারাই সফলকাম হবে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হচ্ছে। তার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য।*

আসতো, অথবা সারা রাত মেহনত মজদুরি করে সামান্য কিছু খেজুর উপার্জন করে তাই এনে রসূলের (সা) সামনে হাযির করতো, তাহলে এ মুনাফিকরা তাদেরকে এ বলে ঠাট্টা করতো, "সাবাশ, এবার এক ফড়িং এর ঠ্যাং পাওয়া গেল। এ দিয়ে রোমের দূর্গ জয় করা যাবে।"

৮৮. তাবুক থেকে ফিরে আসার পর বেশী দিন যেতে না যেতেই মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলো। তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে কাফনে ব্যবহারের জন্য তাঁর কোর্তা চাইলেন। তিনি অত্যন্ত উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

১২ রুকূ'

গ্রামীণ আরবদের[৯০] মধ্য থেকেও অনেক লোক এলো। তারা ওযর পেশ করলো, যাতে তাদেরকেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে ঈমানের মিথ্যা অংগীকার করেছিল তারাই এভাবে বসে রইল। এ গ্রামীণ আরবদের মধ্য থেকে যারাই কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে[৯১] শীঘ্রই তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। দুর্বল ও রুগ্ন লোকেরা এবং যেসব লোক জিহাদে শরীক হবার জন্য পাথেয় পায় না, তারা যদি পিছনে থেকে যায় তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই, যখন তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বস্ত।[৯২] এ ধরনের সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন অবকাশই নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

কোর্তা দিয়ে দিলেন। তারপর আবদুল্লাহ তাঁকেই জানাযার নামায পড়াবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি এ জন্যও তৈরী হয়ে গেলেন। হযরত উমর (রা) বারবার এ মর্মে আবেদন জানাতে লাগলেন—"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এমন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াবেন যে অমুক অমুক কাজ করেছে? কিন্তু তিনি তাঁর এ সমস্ত কথা শুনে মুচকি হাসতে লাগলেন। তাঁর অন্তরে শত্রু মিত্র সবার প্রতি যে করুণার ধারা প্রবাহিত ছিল তারি কারণে তিনি ইসলামের এ নিকৃষ্টতম শত্রুর মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেও ইতস্তত করলেন না। শেষে যখন, তিনি জানাযার নামায পড়াবার জন্য দাঁড়িয়েই গেলেন, তখন এ আয়াতটি নাযিল হলো। এবং সরাসরি আল্লাহর হুকুমে তাঁকে জানাযা পড়ানো থেকে বিরত রাখা হলো। কারণ এ সময় মুনাফিকদের ব্যাপারে স্থায়ী নীতি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের সমাজে আর মুনাফিকদেরকে কোন প্রকারে শিকড় গেড়ে বসার সুযোগ দেয়া যাবে না এবং এমন কোন কাজ করা যাবে না যাতে এ দলটির সাহস বেড়ে যায়।

এ থেকে শরীয়াতের এ বিষয়টি স্থিরিকৃত হয়েছে যে, ফাসেক, অশ্লীল ও নৈতিকতা বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি এবং ফাসেক হিসেবে পরিচিত ব্যক্তির জানাযার নামায মুসলমানদের ইমাম ও নেতৃস্থানীয় লোকদের পড়ানো উচিত নয়। তাতে শরীক হওয়াও উচিত নয়। এ আয়াতগুলো নাযিল হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, কোন জানাযায় শরীক হবার জন্য তাঁকে ডাকা হলে তিনি প্রথমে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। জিজ্ঞেস করতেন, সে কেমন লোক ছিল। যদি জানতে পারতেন সে অসৎ চরিত্রের অধিকারী ছিল, তাহলে তার পরিবারের লোকদের বলে দিতেন, তোমরা যেভাবে চাও একে দাফন করে দিতে পারো।

৮৯. অর্থাৎ যদিও এটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ, সুঠামদেহী ও সামর্থবান লোকেরা ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও কাজের সময় মাঠে ময়দানে বের হবার পরিবর্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে বসে থাকবে এবং মেয়েদের দলে শামিল হবে, তবুও যেহেতু এ লোকেরা জেনে বুঝে নিজেদের জন্য এ পথটি পছন্দ করে নিয়েছিল তাই প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের থেকে এমন সব পবিত্র অনুভূতি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে যেগুলোর উপস্থিতিতে মানুষ এ ধরনের ঘৃণ্য আচরণ করতে লজ্জা বোধ করে।

৯০. গ্রামীণ আরব মানে মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী পল্লী ও মরুবাসী আরবরা। এদেরকে সাধারণভাবে বেদুঈন বা বদ্দূ বলা হয়।

৯১. মুনাফিক সুলভ তথা ভণ্ডামীপূর্ণ ঈমানের প্রকাশ, যার ভেতরে নেই সত্যের যথার্থ স্বীকৃতি, আত্মসমর্পণ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আনুগত্য এবং যার বাহ্যিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহ ও তাঁর দীনের তুলনায় নিজের স্বার্থ এবং পার্থিব মোহ ও আশা–আকাংখাকে প্রিয়তর মনে করে। এ ধরনের ঈমান প্রকৃতপক্ষে কুফরী ও অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। দুনিয়ায় এ ধরনের লোকদেরকে কাফের গণ্য না করা এবং তাদের সাথে মুসলমানের মতো ব্যবহার করা হলেও আল্লাহর দরবারে তাদের সাথে অবাধ্য অস্বীকারকারী ও বিদ্রোহীদের মতো আচরণ করা হবে। এ পার্থিব জীবনে মুসলিম সমাজের ভিত্তি যে আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে বিধানের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও তার বিচারক আইন প্রয়োগ করেন তার প্রেক্ষিতে মুনাফিকীকে কুফরী বা কুফরী সদৃশ কেবল তখনই বলা যেতে পারে যখন অস্বীকৃতি, বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিশ্বস্ততার প্রকাশ সুস্পষ্টভাবে হবে। তাই মুনাফিকীর এমন অনেক ধরন ও অবস্থা থেকে যায় শরীয়াতের বিচারে যেগুলোকে কুফরী নামে অভিহিত করা যায় না। কিন্তু শরীয়াতের বিচারে কোন মুনাফিকের কুফরীর অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর বিচারেও সে এ অভিযোগ ও এর শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

৯২. এ থেকে জানা যায়, যারা বাহ্যত অক্ষম, তাদের জন্যও নিছক শারীরিক দুর্বলতা, রুগ্নতা বা নিছক অপারগতা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাদের অক্ষমতাগুলো কেবলমাত্র তখনই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের কারণ হতে পারে যখন তারা হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সত্যিকার বিশ্বস্ত ও অনুগত। অন্যথায় কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি বিশ্বস্ততা না থাকে তাহলে তাকে শুধুমাত্র এ জন্য মাফ করা যেতে পারে না যে, কর্তব্য পালনের সময় সে রোগগ্রস্ত বা অপারগ ছিল। আল্লাহ শুধু বাইরের অবস্থাই দেখেন না। তাই যেসব লোক অসুস্থতার ডাক্তারী সার্টিফিকেট অথবা বার্ধক্য ও শারীরিক

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

অনুরূপভাবে তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোন সুযোগ নেই যারা নিজেরা এসে তোমার কাছে আবেদন করেছিল, তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে, কিন্তু তুমি বলেছিলে, আমি তোমাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না। তখন তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গিয়েছিল। তখন তাদের অবস্থা এ ছিল যে, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং নিজেদের অর্থ ব্যয়ে জিহাদে শরীক হতে অসমর্থ হবার দরুন তাদের মনে বড়ই কষ্ট ছিল।[৯৩] অবশ্যি অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তশালী হবার পরও জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে তোমার কাছে অব্যাহতি চাচ্ছে। তারা পুরবাসিনীদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছে। আল্লাহ তাদের দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাই তারা এখন কিছুই জানে না (যে, আল্লাহর কাজে তাদের এহেন কর্মনীতি গ্রহণের ফল কী দাঁড়াবে)।

ত্রুটির ওযর পেশ করবে তাদেরকে আল্লাহর দরবারেও তদ্রূপ অক্ষম গণ্য করা হবে এবং তাদেরকে আর কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে না, একথা ঠিক নয়। তিনি তো তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির মন-মানসিকতা বিশ্লেষণ করবেন, তার সমগ্র গোপন ও আপাতদৃষ্ট আচরণ নিরীক্ষণ করবেন এবং তাদের অক্ষমতা কোন বিশ্বস্ত বান্দার অক্ষমতার পর্যায়ভুক্ত ছিল, না বিদ্রোহীর পর্যায়ভুক্ত, তা যাচাই করবেন। কেউ কেউ এমন আছে যে, কর্তব্যের ডাক শুনে লাখো লাখো শুকরিয়া আদায় করে এবং মনে মনে বলে, "বড় ভালো সময়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, নয়তো কোনক্রমেই এ বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতো না এবং অনর্থক আমাকে গঞ্জনা ভুগতে হতো।" আবার অন্য একজন এ একই ডাক শুনে অস্থির হয়ে উঠে বলে, "হায়, কেমন এক সময় আমি অসুখে পড়লাম। যখন মাঠে-ময়দানে নেমে কাজ করার সময় তখন কিনা আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে অযথা সময় নষ্ট করছি।" একজন নিজের রোগকে কর্তব্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাহানা হিসেবে ব্যবহার তো করছিলই এ সংগে সে অন্যদেরকেও এ কর্তব্য পালনে বাধা দেবার চেষ্টা করলো। অন্যজন বাধ্য হয়ে রোগশয্যায় পড়ে থাকলেও বরাবর নিজের ভাই-বেরাদর, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করে

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ۗ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْ
مِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۗ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ
تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾
سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۗ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۗ
اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُوْنَ
لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ
الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾

তোমরা যখন ফিরে তাদের কাছে পৌঁছবে তখন তারা নানা ধরনের ওযর পেশ করতে থাকবে। কিন্তু তুমি পরিষ্কার বলে দেবে, "বাহানাবাজী করো না, আমরা তোমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করবো না। তোমাদের অবস্থা আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবেন। তারপর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই জানেন এবং তোমরা কি কাজ করছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।"

তোমরা ফিরে এলে তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। ঠিক আছে, তোমরা অবশ্যি তাদেরকে উপেক্ষা করো[৯৪] কারণ তারা অপবিত্র এবং তাদের আসল আবাস জাহান্নাম। তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ এটি তাদের ভাগ্যে জুটবে। তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও। অথচ তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ কখনো এহেন ফাসেকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

চলছিল এবং নিজের সেবা ও শুশ্রূষাকারীদেরকেও বলে চলছিল, "আমাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিয়ে যাও। অষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা কোন না কোনভাবে হয়েই যাবে। আমার একজনের জন্য আল্লাহর সত্য দীনের সেবায় নিবেদিত মূল্যবান সময়টি তোমরা নষ্ট করো না।" একজন অসুস্থতার অজুহাতে ঘরে বসে থেকে যুদ্ধের সারাটা সময় মানুষের মন ভাংগাবার, দুঃসংবাদ ছড়াবার, যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার এবং মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তাদের পারিবারিক জীবন বিধ্বস্ত করার কাজ করে। অন্যজন নিজেকে যুদ্ধের

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٩٧ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٩٨ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٩٩

এ বেদুইন আরবরা কুফরী ও মুনাফিকীতে বেশী কঠোর এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যে দীন নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।[৯৫] আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। এ গ্রামীণদের মধ্যে এমন এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করলে তাকে নিজেদের ওপর জোরপূর্বক চাপানো অর্থদণ্ড মনে করে[৯৬] এবং তোমাদের ব্যাপারে কালের আবর্তনের প্রতীক্ষা করছে (অর্থাৎ তোমরা কোন বিপদের মুখে পড়লে যে শাসন ব্যবস্থার আনুগত্যের শৃংখল তোমরা তাদের গলায় বেঁধে দিয়েছ তা তারা গলা থেকে নামিয়ে ফেলবে)। অথচ মন্দের আবর্তন তাদের ওপরই চেপে বসেছে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। আবার এ গ্রামীণদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমনও আছে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা কিছু খরচ করে তাকে আল্লাহর দরবারে নৈকট্য লাভের এবং রসূলের কাছ থেকে রহমতের দোয়া লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। হাঁ, অবশ্যি তা তাদের জন্য নৈকট্যলাভের উপায় এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে নিজের রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। অবশ্যি আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

ময়দানে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে দেখে জেহাদের ঘরোয়া অংগনকে (Home front) মজবুত রাখার জন্য নিজের সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালায়। বাহ্যত এরা দু'জনই অক্ষম। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে এ দুই ধরনের অক্ষমরা কখনো সমান হতে পারে না। আল্লাহ যদি ক্ষমা করেন তাহলে কেবল এ দ্বিতীয় জনকেই ক্ষমা করবেন। আর প্রথম ব্যক্তি নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতকতা ও নাফরমানীর অপরাধে অভিযুক্ত হবে।

৯৩. যারা দীনের খেদমত করার জন্য সর্বক্ষণ উদগ্রীব থাকে তারা যদি কোন সত্যিকার অক্ষমতার কারণে অথবা উপায়-উপকরণ বা মাধ্যম যোগাড় না হওয়ার দরুন

কার্যত খেদমত করতে না পারে তাহলে মনে ঠিক তেমনি কষ্ট পায় যেমন কোন বৈষয়িক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেলে অথবা কোন বড় আকারের লাভের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে মনে কষ্ট হয়, তারা বাস্তবে কোন খেদমত না করলেও আল্লাহর কাছে খেদমতকারী হিসেবেই গণ্য হবে।কারণ তারা হাত–পা চালিয়ে কোন কাজ করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে তারা সর্বক্ষণ কাজের মধ্যেই থাকে। এ কারণে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সংগী–সাথীদেরকে সম্বোধন করে বলেন,

ان بالمدينة اقواما ماسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم

"মদীনায় কিছু লোক আছে, যারা প্রতিটি উপত্যকা অতিক্রমকালে এবং প্রতিটি যাত্রার সময় তোমাদের সাথে থেকেছে।"

সাহাবীগণ অবাক হয়ে বলেন, "মদীনায় অবস্থান করেই?" বলেন, "হাঁ, মদীনায় অবস্থান করেই। কারণ অক্ষমতা তাদেরকে আটকে রেখেছিল, নয়তো তারা নিজেরা থেকে যাবার লোক ছিল না।"

৯৪. প্রথম বাক্যে উপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে, এড়িয়ে যাওয়া আর দ্বিতীয় বাক্যে এর অর্থ হচ্ছে সম্পর্ক ছিন্ন করা। অর্থাৎ তারা চায় তোমরা যেন তাদের ব্যাপারে বেশী মাথা না ঘামাও এবং অনুসন্ধান না চালাও। কিন্তু তোমাদের পক্ষেও এটাই উত্তম যে, তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না এবং মনে করে নেবে যে, তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছো এবং তারাও তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

৯৫. আমরা আগেই বলে এসেছি, বেদুইন আরব বলতে এখানে গ্রামীণ ও মরুবাসীদের কথা বলা হয়েছে। এরা মদীনার আশপাশে বসবাস করতো। মদীনায় একটি মজবুত ও সংগঠিত শক্তির উত্থান ঘটতে দেখে এরা প্রথমে শংকিত হয়। তারপর ইসলাম ও কুফরের সংঘাতকালে বেশ কিছুকাল তারা সুযোগ সন্ধানী নীতি অবলম্বন করতে থাকে। এরপর ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হেজায ও নজদের একটি বড় অংশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং তার মোকাবিলায় বিরোধী গোত্রগুলোর শক্তি ভেংগে পড়তে থাকলে তারা ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করাকেই সে সময় নিজেদের জন্য সুবিধাজনক ও নিরাপদ মনে করে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ইসলামকে যথার্থই আল্লাহর সত্য দীন মনে করে সাচ্চা দিলে ঈমান আনে এবং আন্তরিকতার সাথে তার দাবীসমূহ পূর্ণ করতে উদ্যোগী হয়। অধিকাংশ বেদুইনের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ঈমান ও আকিদার ব্যাপার নয় বরং নিছক স্বার্থ, সুবিধা ও কৌশলের ব্যাপার ছিল। তারা চাচ্ছিল, ক্ষমতাসীন দলের সদস্যপদ লাভ করার ফলে যেসব সুবিধা ভোগ করা যায় শুধু সেগুলোই তাদের ভাগে এসে যাক। কিন্তু ইসলাম তাদের ওপর যেসব নৈতিক বিধি–নিষেধ আরোপ করেছিল ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই তাদের ওপর নামায পড়ার ও রোযা করার যে বিধান আরোপিত হতো, যথারীতি তহশীলদার নিযুক্ত করে তাদের খেজুর বাগান ও শস্যগোলা থেকে যে যাকাত উসূল করা হতো,. তাদের জাতীয় ইতিহাসে এ প্রথমবারের মতো তাদেরকে যে আইন–শৃংখলার রশিতে শক্তভাবে বাঁধা হয়েছিল এবং লুটতরাজের যুদ্ধের জন্য নয় বরং খালেস আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য দিনের পর দিন তাদের কাছ থেকে যে জানমালের কুরবানী চাওয়া

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰۰﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕۛ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ؔۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾

১৩ রুকূ'

মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা সবার আগে ঈমানের দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে এবং যারা পরে নিষ্ঠা সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা তার মধ্যে থাকবে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য।

তোমাদের আশেপাশে যেসব বেদুইন থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মুনাফিক। অনুরূপভাবে মদীনাবাসীদের মধ্যেও রয়েছে এমন কিছু মুনাফিক, যারা মুনাফিকীতে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। তোমরা তাদেরকে চিন না, আমি চিনি তাদেরকে।[৯৭] *শীঘ্রই আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেবো।*[৯৮] *তারপর আরো বেশী বড় শাস্তির জন্য তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।*

হচ্ছিল—এসব জিনিস তাদের কাছে ছিল অতিশয় অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর এবং এগুলোর হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা নানা ধরনের চালবাজী ও টালবাহানার আশ্রয় নিতো। সত্য কি এবং তাদের ও সমস্ত মানুষের যথার্থ কল্যাণ কিসে, তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথা ছিল না। তারা শুধুমাত্র নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ, নিজেদের আয়েশ-আরাম, নিজেদের জমি, উট, ছাগল-ভেড়া এবং নিজেদের তাঁবুর চারপাশের জগত নিয়ে মাথা ঘামাতো। এর উর্ধের কোন জিনিসের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। অবশ্য পীর-ফকীরদের কাছে যেমন নযরানা পেশ করা হয়, এবং তার বিনিময়ে তারা আয় বৃদ্ধি, বিপদ থেকে নিষ্কৃতি এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য ঝাড়ফুঁক করেন, তাবীজ দেন ও

তাদের জন্য দোয়া করেন ঠিক তেমনি ধরনের কোন কাল্পনিক জিনিসের প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধা পোষণের প্রবণতা হয়তো তাদের ছিল। কিন্তু এমন কোন ঈমান ও আকীদার জন্য তারা তৈরী ছিলো না, যা তাদের সমগ্র তামাদ্দুনিক ও সামাজিক জীবনকে একটি নৈতিক ও আইনগত বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে এবং এ সংগে একটি বিশ্বজনীন সংস্কার কার্যক্রমের জন্য তাদের কাছে জান–মালের কুরবানীরও দাবী জানাবে।

তাদের এ অবস্থাটিকেই এখানে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নগরবাসীদের তুলনায় এ গ্রামীণ ও মরুবাসী লোকরাই বেশী মুনাফিকী ও ভণ্ডামীর আচরণ অবলম্বন করে থাকে এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা এদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। আবার এর কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, নগরবাসীরা তো জ্ঞানীগুণী ও সত্যানুসারী লোকদের সাহচর্যে এসে দীন ও তার বিধি–বিধান সম্পর্কে কিছু না কিছু জ্ঞান লাভ করতেও পারে কিন্তু এ বেদুইনরা যেহেতু সারাটা জীবন নিরেট খাদ্যান্বেষী জীব–জানোয়ারের মতো দিন রাত কেবল রুজী রোজগারের ধান্দায় লেগে থাকে এবং পশু জীবনের প্রয়োজনের চাইতে উন্নত পর্যায়ের কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেবার সময়ই তাদের থাকে না, তাই ইসলাম ও তার বিধি–বিধান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ থাকার সম্ভাবনাই বেশী।

এখানে এ বাস্তব সত্যটির প্রতি ইংগিত করাও অপ্রাসংগিক হবে না যে, এ আয়াতগুলো নাযিলের প্রায় দু'বছর পর হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতের প্রাথমিক যুগে মুরতাদ হওয়ার ও যাকাত বর্জনের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল আলোচ্য আয়াতগুলোতে বর্ণিত এ কারণটি তার অন্যতম ছিল।

৯৬. এর অর্থ হচ্ছে, তাদের থেকে যে যাকাত আদায় করা হয় তারা তাকে একটা জরিমানা মনে করে। মুসাফিরদের আহার করাবার ও মেহমানদারীর যে দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে, তা তাদের কাছে অসহনীয় বোঝা মনে হয়। আর যদি কোন যুদ্ধ উপলক্ষে তারা কোন চাঁদা দেয় তাহলে আন্তরিকভাবে আবেগ আপ্লুত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দেয় না। বরং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার জন্য দিয়ে থাকে।

৯৭. অর্থাৎ নিজেদের মুনাফিকী গোপন করার ব্যাপারে তারা এতই দক্ষতা অর্জন করেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তাঁর অসাধারণ অন্তরদৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সত্ত্বেও তাদেরকে চিনতে পারতেন না।

৯৮. দ্বিগুণ শাস্তি মানে হচ্ছে, একদিকে যে দুনিয়ার প্রেমে মত্ত হয়ে তারা ঈমান ও আন্তরিকতার পরিবর্তে মুনাফিকী, ভণ্ডামী ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অবলম্বন করেছে তা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং তারা ধন–সম্পদ, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভের পরিবর্তে বরং শোচনীয় অমর্যাদা, লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার শিকার হবে। অন্যদিকে তারা যে সত্যের দাওয়াতকে ব্যর্থ ও অসফল দেখতে এবং নিজেদের চালবাজীর মাধ্যমে নস্যাৎ করে দিতে চায় তা তাদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের চোখের সামনে উন্নতি ও বিকাশ লাভ করতে থাকবে।

وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا۟ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا۟ عَمَلًا صَٰلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى
ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ
وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟
فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ
ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

আরো কিছু লোক আছে, যারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের কাজকর্ম মিশ্র ধরনের কিছু ভাল, কিছু মন্দ। অসম্ভব নয়, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার মেহেরবান হয়ে যাবেন। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। হে নবী! তাদের ধন–সম্পদ থেকে সাদকা নিয়ে তাদেরকে পাক–পবিত্র করো, (নেকীর পথে) তাদেরকে এগিয়ে দাও এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। তারা কি জানে না, আল্লাহই তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, তাদের দান–খয়রাত গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়? আর হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা কাজ করতে থাকো। আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনরা তোমাদের কাজের ধারা এখন কেমন থাকে তা দেখবেন।[৯৯] তারপর তোমাদের তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন এবং তোমরা কি করতে তা তিনি তোমাদের বলে দেবেন।[১০০]

৯৯. এখানে মিথ্যা ঈমানের দাবীদার ও গোনাহগার মুমিনের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি ঈমানের দাবী করে কিন্তু আসলে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের জামায়াতের ব্যাপারে আন্তরিক নয়, তার এ আন্তরিকতাহীনতার প্রমাণ যদি তার কার্যকলাপের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তাহলে তার সাথে কঠোর ব্যবহার করা হবে। আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য সে কোন সম্পদ পেশ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। সে মারা গেলে কোন মুসলমান তার জানাযার নামায পড়বে না। এবং তার গোনাহ মাফের জন্য দোয়াও করবে না, সে তার বাপ বা ভাই হলেও। অন্যদিকে যে ব্যক্তি সত্যিকার মুমিন

কিন্তু এ সত্ত্বেও সে এমন কিছু কাজ করে বসেছে যা তার আন্তরিকতাহীনতা প্রমাণ করে, এ ক্ষেত্রে সে যদি নিজের ভুল স্বীকার করে নেয় তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। তার সাদ্‌কা, দান–খয়রাত গ্রহণ করা হবে এবং তার ওপর রহমত নাযিলের জন্য দোয়াও করা হবে। এখন কোন ব্যক্তির আন্তরিকতাবিহীন কার্যকলাপের পরও তাকে নিছক একজন গোনাহগার মুমিন গণ্য করতে হলে তাকে তিনটি মানদণ্ডে যাচাই করতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ মানদণ্ডগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) নিজের ভুলের জন্য সে খোঁড়া অজুহাত ও মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করবে না। বরং যে ভুল হয়ে গেছে সহজ সরলভাবে তা মেনে নেবে।

(২) তার আগের কার্যকলাপ দেখা হবে। সে আন্তরিকতাহীনতার দাগী অপরাধী কিনা তা যাচাই করা হবে। যদি আগে সে ইসলামী জামায়াতের এক সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে এবং তার জীবনের সমস্ত কার্যকলাপে আন্তরিক সেবা, ত্যাগ, কুরবানী ও ভালো কাজে অগ্রবর্তী থাকার রেকর্ড থেকে থাকে, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, বর্তমানে যে ভুল সে করেছে তা ঈমান ও আন্তরিকতাহীনতার ফল নয় বরং তা নিছক সাময়িকভাবে সৃষ্ট একটি দুর্বলতা বা পদস্খলন ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) তার ভবিষ্যত কার্যকলাপের ওপর নজর রাখা হবে। দেখতে হবে, তার ভুলের স্বীকৃতি কি নিছক মৌখিক, না তার মধ্যে লজ্জার গভীর অনুভূতি রয়েছে। যদি নিজের ভুল সংশোধনের জন্য তাকে অস্থির ও উৎকণ্ঠিত দেখা যায় এবং তার প্রতিটি কথা থেকে এ কথা প্রকাশ হয় যে, তার জীবনে যে ঈমানী ক্রটির চিত্র ভেসে উঠেছিল তাকে মুছে ফেলার ও তা সংশোধন করার জন্য সে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সে যথার্থই লজ্জিত হয়েছে বলে মনে করা হবে। এ লজ্জা ও অনুশোচনাই হবে তার ঈমান ও আন্তরিকতার প্রমাণ।

মুহাদ্দিসগণ এ আয়াতগুলোর নাযিলের পটভূমি হিসেবে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা থেকে এ বিষয়বস্তুটি আয়নার মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তাঁরা বলেন, এ আয়াতগুলো আবু লুবাবাহ ইবনে আবদুল মুনযির ও তাঁর ছ'জন সাথীর প্রসংগে নাযিল হয়েছিল। হিজরতের আগে আকাবার বাইআতের সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু লুবাবাহ ছিলেন তাদের একজন। বদর, ওহোদ ও অন্যান্য যুদ্ধে তিনি বরাবর অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময় মানসিক দুর্বলতা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কোন প্রকার শরয়ী ওযর ছাড়াই তিনি ঘরে বসে থাকেন। তার অন্য সাথীরাও ছিলেন তারই মতো আন্তরিকতা সম্পন্ন। তারাও এ একই প্রকার দুর্বলতার শিকার হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন এবং যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মতামত কি তা তারা জানতে পারলেন তখন তারা ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলেন। কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের আগেই তারা নিজেদেরকে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে নেন এবং বলেন, আমাদের মাফ না করে দেয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য আহার–নিদ্রা হারাম। এ অবস্থায় আমাদের প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেলেও আমরা তার পরোয়া করবো না। কয়েক দিন পর্যন্ত এভাবেই তারা বাঁধা অবস্থায় অনাহার অনিদ্রায় কাটান। এমনকি একদিন তারা বেহুশ হয়ে পড়ে যান। শেষে তাদের জানানো হলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًۢا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

অপর কিছু লোকের ব্যাপার এখনো আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছে, তিনি চাইলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আবার চাইলে তাদের প্রতি নতুন করে অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।[১০১]

আরো কিছু লোক আছে, যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে (সত্যের দাওয়াতকে) ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে, (আল্লাহর বন্দেগী করার পরিবর্তে) কুফরী করার জন্য, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষে এবং (এ বাহ্যিক ইবাদাতগাহকে) এমন এক ব্যক্তির জন্য গোপন ঘাঁটি বানাবার উদ্দেশ্যে যে ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তারা অবশ্যি কসম খেয়ে বলবে, ভালো ছাড়া আর কোন ইচ্ছাই আমাদের ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা একেবারেই মিথ্যেবাদী। তুমি কখনো সেই ঘরে দাঁড়াবে না। যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই মসজিদে দাঁড়ানোই (ইবাদাতের জন্য) তোমার পক্ষে অধিকতর সমীচীন। সেখানে এমন লোক আছে, যারা পাক-পবিত্র থাকা পছন্দ করে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।[১০২]

সাল্লামকে বলেন, ঘরের যে আরাম আয়েশ আমাদের ফরয থেকে গাফেল করে দিয়েছিল তা এবং নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ আমরা আল্লাহর পথে দান করে দেবো, এটাও আমাদের তাওবার অন্তরভুক্ত। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সমস্ত ধন-সম্পদ দান করে দেবার দরকার নেই, শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। তদনুসারে তখনই তারা সেগুলো আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দেন। এ ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার জানা যায়, কোন্ ধরনের দুর্বলতা আল্লাহ মাফ করেন। উল্লিখিত মহান

সাহাবীগণ এ ধরনের আন্তরিকতাহীন আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন না। বরং তাদের বিগত জীবনের কার্যকলাপ তাদের ঈমানী নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ ছিল। এবারেও রসূল (সা)-এর নিকট তাদের কেউ মিথ্যা অজুহাত পেশ করেননি। বরং নিজেদের ভুলকে নিজেরাই অকপটে ভুল হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তাঁরা ভুলের স্বীকারোক্তি সহকারে নিজেদের কার্য ধারার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তারা যথার্থই লজ্জিত হয়েছেন এবং নিজেদের গোনাহ মাফ করাবার জন্য অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন।

এখানে আলোচ্য আয়াতটিতে আর একটি মূল্যবান কথা বলা হয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে, গোনাহ মাফের জন্য মুখ ও অন্তর দিয়ে তাওবা করার সাথে সাথে বাস্তব কাজের মাধ্যমেও তাওবা করতে হবে। আর আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দান করা হচ্ছে বাস্তব তাওবার একটি পদ্ধতি। এভাবে নফসের মধ্যে যে দূষিত ময়লা আবর্জনা লালিত হচ্ছিল এবং যার কারণে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়েছিল তা দূর হয়ে যায় এবং ভালো ও কল্যাণের দিকে ফিরে যাবার যোগ্যতা বেড়ে যায়। গোনাহ করার পর তা স্বীকার করার ব্যাপারটি এমন যেমন এক ব্যক্তি গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং নিজের পড়ে যাওয়াটা সে অনুভব করতে পারে। তারপর নিজের গোনাহের ওপর তার লজ্জিত হওয়াটা এ অর্থ বহন করে যে, এ গর্তকে সে নিজের অবস্থানের জন্য বড়ই খারাপ জায়গা মনে করে এবং এ জন্য ভীষণ কষ্ট অনুভব করতে থাকে। এরপর সাদ্‌কা, দান-খয়রাত এবং অন্যান্য সৎকাজের মাধ্যমে এর ক্ষতি পূরণ করার প্রচেষ্টা চালানোর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সে গর্ত থেকে বের হয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছে এবং হাত-পা ছুঁড়ছে।

১০০. এর অর্থ হচ্ছে, চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ এমন এক সত্তা যার কাছে কোন কিছু গোপন থাকতে পারে না। এ জন্য কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় তার ভণ্ডামী ও মুনাফিকী গোপন করতে সক্ষমও হয় এবং মানুষ যেসব মানদণ্ডে কারোর ঈমান ও আন্তরিকতা পরখ করতে পারে সেসবগুলোতে পুরাপুরি উত্তীর্ণ হলেও একথা মনে করা উচিত নয় যে, সে মুনাফিকীর শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

১০১. এদের ব্যাপারটি ছিল সন্দেহপূর্ণ। এদেরকে না মুনাফিক বলে চিহ্নিত করা যেতো আর না বলা যেতো গোনাহগার মুমিন। এ দু'টি জিনিসের কোনটিরই আলামত তখনো তাদের মধ্যে পুরোপুরি ফুটে ওঠেনি। তাই আল্লাহ তাদের ব্যাপারটি মুলতবী রাখেন। মুলতবী রাখার অর্থ এই নয় যে, আসলে আল্লাহর কাছেও তাদের ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ ছিল। বরং এর অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি বা দলের ব্যাপারে মুসলমানদের নিজেদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে অতিমাত্রায় তাড়াহুড়ো করা চাই না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এমন ধরনের আলামতের মাধ্যমে তার অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে যায়, যা অদৃশ্য জ্ঞান দিয়ে নয় বরং যুক্তি ও অনুভূতি দিয়ে পরখ করা যেতে পারে, ততক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত।

১০২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের আগে খায্‌রাজ গোত্রে আবু আমের নামে এক ব্যক্তি ছিল। জাহেলী যুগে সে খৃষ্টান রাহেবের (সাধু) মর্যাদা লাভ করেছিল। তাকে আহলে কিতাবদের আলেমদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ্য করা হতো। অন্যদিকে সাধুগিরির কারণে পণ্ডিত সুলভ মর্যাদার পাশাপাশি তার দরবেশীর প্রভাবও মদীনা ও আশপাশের এলাকার অশিক্ষিত আরব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন সেখানে বিরাজ করছিল আবু আমেরের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের রমরমা অবস্থা। কিন্তু এ জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও দরবেশী তার মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যকে চেনার মতো ক্ষমতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে উলটো তার জন্য একটি বিরাট অন্তরাল সৃষ্টি করলো। আর এ অন্তরাল সৃষ্টির ফলে রসূলের আগমনের পরে সে নিজে ঈমানের নিয়ামত থেকে শুধু বঞ্চিতই রইল না বরং রসূলকে নিজের ধর্মীয় পৌরহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং নিজের দরবেশী ও সাধুবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের শত্রু মনে করে তাঁর ও তাঁর সমুদয় কার্যক্রমের বিরোধিতায় নেমে পড়লো। প্রথম দু'বছর তার আশা ছিল কুরাইশী কাফেরদের শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা চরমভাবে পরাজিত হলো। এ অবস্থায় সে আর নীরব থাকতে পারলো না। সেই বছরই সে মদীনা থেকে বের হয়ে পড়লো। সে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করলো। যেসব কুচক্রীর চক্রান্ত ও যোগসাজশে ওহোদ যুদ্ধ বাধে, তাদের মধ্যে এ আবু আমেরও অন্যতম। বলা হয়ে থাকে, ওহোদের যুদ্ধের ময়দানে সে অনেকগুলো গর্ত খুঁড়েছিল। এরই একটির মধ্যে পড়ে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হয়েছিলেন। তারপর আহযাব যুদ্ধের সময় চারদিক থেকে যে সেনাবাহিনী মদীনার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল তাকে আক্রমণে উস্কে দেয়ার ব্যাপারেও তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। এরপর হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত আরব মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোতেই এ ঈসায়ী দরবেশ ইসলামের বিরুদ্ধে মুশরিক শক্তির সক্রিয় সহায়ক ছিল। শেষ পর্যন্ত আরবের কোন শক্তি ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখে দিতে পারবে বলে তার আর আশা রইল না। কাজেই সে আরব দেশ ত্যাগ করে রোমে চলে যায় এবং আরব থেকে যে "বিপদ" মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল সে সম্পর্কে সে কাইসারকে (সীজার) অবহিত করে। এ সময়ই মদীনায় খবর পৌঁছে যে, কাইসার আরব আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এরই প্রতিবিধান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাবুক অভিযান করতে হয়।

ঈসায়ী রাহেব আবু আমেরের এ ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় তার সাথে শরীক ছিল মদীনার মুনাফিক গোষ্ঠীর একটি দল। আবু আমেরকে তার ধর্মীয় প্রভাব ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে রোমের কাইসার ও উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টান আরব রাজ্যগুলোর সামরিক সাহায্য লাভ করতেও এ মুনাফিকরা তাকে পরামর্শ দেয় ও মদদ যোগায়। যখন সে রুমের পথে রওয়ানা হচ্ছিল তখন তার ও এ মুনাফিকদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো। এ চুক্তি অনুযায়ী স্থির হলো যে, মদীনায় তারা নিজেদের একটি পৃথক মসজিদ তৈরী করে নেবে। এভাবে সাধারণ মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে মুনাফিক মুসলমানদের এমন একটি স্বতন্ত্র জোট গড়ে উঠবে, যা ধর্মীয় আলখেল্লায় আবৃত থাকবে। তার প্রতি সহজে কোন প্রকার সন্দেহ করা যাবে না। সেখানে শুধু যে, মুনাফিকরাই সংগঠিত হবে এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য পরামর্শ করবে তা নয়। বরং আবু আমেরের কাছ থেকে যেসব এজেন্ট খবর ও নির্দেশ নিয়ে আসবে তারাও সন্দেহের উর্ধে থেকে নিরীহ ফকীর ও মুসাফিরের বেশে এ মসজিদে অবস্থান করতে থাকবে। এ ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্রটির ভিত্তিতেই এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং এরি কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে।

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

তাহলে তুমি কি মনে করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ভীতি ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের উপর নিজের ইমারতের ভীত্তি স্থাপন করলো সে ভাল, না যে ব্যক্তি তার ইমারতের ভিত্ উঠালো একটি উপত্যকার স্থিতিহীন ফাঁপা প্রান্তের ওপর[১০৩] এবং তা তাকে নিয়ে সোজা জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়লো? এ ধরনের জালেমদেরকে আল্লাহ কখনো সোজা পথ দেখান না।[১০৪] তারা এই যে ইমারত নির্মাণ করেছে এটা সবসময় তাদের মনে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে (যার বের হয়ে যাওয়ার আর কোন উপায়ই এখন নেই)—যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।[১০৫] আল্লাহ অত্যন্ত সচেতন, জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

মদীনায় এ সময় দু'টি মসজিদ ছিল। একটি মসজিদে কুবা। এটি ছিল নগর উপকণ্ঠে। অন্যটি ছিল মসজিদে নববী। শহরের অভ্যন্তরে ছিল এর অবস্থান। এ দু'টি মসজিদ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় একটি মসজিদ নির্মাণ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আর এটা কোন যুক্তিহীন ধর্মীয় আবেগের যুগ ছিল না যে, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক মসজিদ নামে নিছক একটি ইমারত তৈরী করে দিলেই তখন নেকীর কাজ বলে মনে করা হবে। বরং একটি নতুন মসজিদ তৈরী করার অর্থই ছিল মুসলমানদের জামায়াতের মধ্যে অনর্থক বিভেদ সৃষ্টি করা। একটি সত্যনিষ্ঠ ইসলামী ব্যবস্থা কোনক্রমেই এটা বরদাশত করতে পারে না। তাই তারা নিজেদের পৃথক মসজিদ তৈরী করার আগে তার প্রয়োজনের বৈধতা প্রমাণ করতে বাধ্য ছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ নতুন নির্মাণ কাজের প্রয়োজন পেশ করে। এ প্রসঙ্গে তারা বলে, বৃষ্টি-বাদলের জন্য এবং শীতের রাতে সাধারণ লোকদের বিশেষ করে উল্লেখিত দু'টি মসজিদ থেকে দূরে অবস্থানকারী বৃদ্ধ, দুর্বল ও অক্ষম লোকদের প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে হাজিরা দেয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আমরা শুধুমাত্র নামাযীদের সুবিধার্থে এ নতুন মসজিদটি নির্মাণ করতে চাই।

মুখে এ পবিত্র ও কল্যাণমূলক বাসনার কথা উচ্চারণ করে যখন এ "দ্বিরার" (ক্ষতিকর) মসজিদটির নির্মাণ কাজ শেষ হলো তখন এ দুর্বৃত্তরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং সেখানে একবার নামায পড়িয়ে মসজিদটির উদ্বোধন করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানালো। কিন্তু "আমি এখন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি এবং শীঘ্রই আমাকে একটি বড় অভিযানে বের হতে হবে, সেখান থেকে ফিরে এসে

দেখা যাবে," একথা বলে তিনি তাদের আবেদন এড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাবুক রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং তাঁর রওয়ানা হওয়ার পর এ মুনাফিকরা এ মসজিদে নিজেদের জোট গড়ে তুলতে এবং ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলো।

এমনকি তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, ওদিকে রোমানদের হাতে মুসলমানদের মূলোৎপাটনের সাথে সাথেই এদিকে এরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিবে। কিন্তু তাবুকে যা ঘটলো তাতে তাদের সে আশার গুড়ে বালি পড়লো। ফেরার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনার নিকটবর্তী 'যী আওয়ান' নামক স্থানে পৌছলেন তখন এ আয়াত নাযিল হলো। তিনি তখনই কয়েকজন লোককে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন, তাঁর মদীনায় পৌছার আগেই যেন তাঁরা 'যিরার' মসজিদটি ভেংগে ধূলিস্মাত করে দেয়।

১০৩. এখানে কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে جرف (জুরুফ)। আরবী ভাষায় সাগর বা নদীর এমন কিনারাকে জুরুফ বলা হয় স্রোতের টানে যার তলা থেকে মাটি সরে গেছে এবং ওপরের অংশ কোন বুনিয়াদ ও নির্ভর ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে। যারা আল্লাহকে ভয় না করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির পরোয়া না করার ওপর নিজেদের কার্যক্রমের ভিত্ গড়ে তোলে, তাদের জীবন গঠনকে এখানে এমন একটি ইমারতের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা এমনি ধরনের একটি অন্তসারশূন্য অস্থিতিশীল সাগর কিনারে নির্মাণ করা হয়েছে। এটি একটি নজীরবিহীন উপমা। এর চাইতে সুন্দরভাবে এ অবস্থার আর কোন চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। এর সমগ্র অন্তরনিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে বুঝে নিতে হবে যে, দুনিয়ার জীবনের যে উপরিভাগের ওপর মুমিন, মুনাফিক, কাফের, সৎকর্মশীল, দুষ্কৃতকারী তথা সমস্ত মানুষ কাজ করে, তা মাটির উপরিভাগের স্তরের মতো, যার ওপর দুনিয়ার সমস্ত ইমারত নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এ স্তরের মধ্যে কোন স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা নেই। বরং এর নীচে নিরেট জমি বিদ্যমান থাকার ওপরই এর স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। যে স্তরের নীচের মাটি কোন জিনিসের (যেমন নদীর পানির তোড়ে ভেসে গেছে তার ওপর যদি কোন মানুষ (যে মাটির প্রকৃত অবস্থা জানে না) বাহ্যিক অবস্থায় প্রতারিত হয়ে নিজের গৃহ নির্মাণ করে, তাহলে তা তার গৃহসহ ধ্বসে পড়বে এবং সে কেবল নিজেই ধ্বংস হবে না বরং এ অস্থিতিশীল ভিতের ওপর নির্ভর করে নিজের জীবনের যা কিছু পুঁজিপাট্টা সে সংশ্লিষ্ট গৃহের মধ্যে জমা করেছিল সবই এ সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়ার জীবনের এ বাহ্যিক স্তরটিরও এ উপমাটির সাথে হুবহু মিল রয়েছে। এ স্তরটির ওপরই আমরা সবাই আমাদের জীবনের যাবতীয় কার্যক্রমের ইমারত নির্মাণ করি। অথচ এর নিজের কোন স্থিতি ও স্থায়িত্ব নেই। বরং আল্লাহর ভয়, তাঁর সামনে জবাবদিহির অনুভূতি এবং তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি মতো চলার শক্ত ও নিরেট পাথর যদি তার নীচে বসানো থাকে, এরি ওপর তার মজবুতী ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। যে অজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী মানুষ নিছক দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকের ওপর ভরসা করে আল্লাহর ভয়ে ভীত না হয়ে এবং তাঁর সন্তোষলাভের পরোয়া না করে দুনিয়ায় কাজ করে যায় সে আসলে নিজের জীবন গঠনের বুনিয়াদ নীচে থেকেই অন্তসার শূন্য করে দেয়। তার শেষ পরিণতি এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, ভিত্তিহীন যে উপরিস্তরের ওপর সে তার সারা জীবনের সঞ্চয় জমা করেছে। একদিন অকস্মাৎ তা ধ্বসে পড়বে এবং তাকে তার জীবনের সমস্ত সম্পদসহ ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

১৪ রুকূ'

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধন–সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।[১০৬] তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ।[১০৭] আর আল্লাহর চাইতে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনা–বেচা করেছো সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

১০৪. 'সোজা পথ' অর্থাৎ যে পথে মানুষ সফলকাম হয় এবং যে পথে অগ্রসর হয়ে সে যথার্থ সাফল্যের মনযিলে পৌঁছে যায়।

১০৫. অর্থাৎ তারা মুনাফিক সুলভ ধোঁকা ও প্রতারণার বিরাট অপরাধ করে নিজেদের অন্তরকে চিরকালের জন্য ঈমানী যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করেছে। বেঈমানী ও নাফরমানীর রোগ তাদের অন্তরের অন্তস্থলে অনুপ্রবেশ করেছে। যতদিন তাদের এ অন্তর থাকবে ততদিন এ রোগও সেখানে অবস্থান করবে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে মন্দির নির্মাণ করে অথবা তাঁর দীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্যরিকেড ও ঘাঁটি তৈরী করে তার হেদায়াতও কোন না কোন সময় সম্ভব। কারণ তার মধ্যে স্পষ্টবাদিতা, আন্তরিকতা ও নৈতিক সাহসের সুক্ষ্মতম উপাদান মৌলিকভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। আর এ উপাদান সত্য ও ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করার জন্য ঠিক তেমনিভাবে কাজে লাগে যেমন মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করার জন্য কাজে লাগে। কিন্তু যে কাপুরুষ, মিথ্যুক ও প্রতারক আল্লাহর নাফরমানী ও হুকুম অমান্য করার জন্য মসজিদ নির্মাণ করে এবং আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্লাহ পরস্তির প্রতারণামূলক পোশাক পরিধান করে, মুনাফিকীর ঘুণে তার চরিত্র কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে। আন্তরিকতার সাথে ঈমানের বোঝা বহন করার ক্ষমতা সে কোথা থেকে পাবে?

১০৬. আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে ঈমানের যে ব্যাপারটা স্থিরিকৃত হয় তাকে কেনাবেচা বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, ঈমান শুধুমাত্র একটা অতি প্রাকৃতিক আকীদা–বিশ্বাস নয়। বরং এটা একটা চুক্তি। এ চুক্তির প্রেক্ষিতে বান্দা তার নিজের প্রাণ ও নিজের ধন–সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এর বিনিময়ে সে আল্লাহর

পক্ষ থেকে এ ওয়াদা কবুল করে নেয় যে, মরার পরে পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম কেনা–বেচার তাৎপর্য ও স্বরূপ কি তা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

নিরেট সত্যের আলোকে বিচার করলে বলা যায়, মানুষের ধন–প্রাণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। কারণ, তিনিই তার এবং তার কাছে যা কিছু আছে সব জিনিসের স্রষ্টা। সে যা কিছু ভোগ ও ব্যবহার করছে তাও তিনিই তাকে দিয়েছেন। কাজেই এদিক দিয়ে তো কেনাবেচার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষের এমন কিছু নেই, যা সে বিক্রি করবে। আবার কোন জিনিস আল্লাহর মালিকানার বাইরেও নেই, যা তিনি কিনবেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে, যা আল্লাহ পুরোপুরি মানুষের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে তার ইখতিয়ার অর্থাৎ নিজের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Free will and freedom of choice)। এ ইখতিয়ারের কারণে অবশ্যি প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মানুষ এ মর্মে স্বাধীনতা লাভ করে যে, সে চাইলে প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে পারে এবং চাইলে তা অস্বীকার করতে পারে। অন্য কথায়, এ ইখতিয়ারের মানে এ নয় যে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে তার নিজের প্রাণের, নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তির এবং দুনিয়ায় সে যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে, তার মালিক হয়ে গেছে। এ সংগে এ জিনিসগুলো সে যেভাবে চাইবে সেভাবে ব্যবহার করার অধিকার লাভ করেছে, একথাও ঠিক নয়। বরং এর অর্থ কেবল এতটুকুই যে, তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার জোর–জবরদস্তি ছাড়াই সে নিজেই নিজের সত্তার ও নিজের প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর আল্লাহর মালিকানা ইচ্ছা করলে স্বীকার করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের মালিক হয়ে যেতে পারে এবং নিজেই একথা মনে করতে পারে যে, সে আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজের ইখতিয়ার তথা স্বাধীন কর্মক্ষমতার সীমানার মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার রাখে। এখানেই কেনা–বেচার প্রশ্নটা দেখা দেয়। আসলে এ কেনা–বেচা এ অর্থে নয় যে, মানুষের একটি জিনিস আল্লাহ কিনতে চান, বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি আল্লাহর মালিকানাধীন, যাকে তিনি আমানত হিসেবে মানুষের হাতে সোপর্দ করেছেন এবং যে ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকার বা অবিশ্বস্ত হবার স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়ে রেখেছেন সে ব্যাপারে তিনি মনুষের কাছে দাবী করেন, আমার জিনিসকে তুমি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে (বাধ্য হয়ে নয়) আমার জিনিস বলে মেনে নাও এবং সারা জীবন স্বাধীন মালিকের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নয় বরং আমানতদার হিসেবে তা ব্যবহার করার বিষয়টি গ্রহণ করে নাও। এ সংগে খেয়ানত করার যে স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এভাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অস্থায়ী জীবনে নিজের স্বাধীনতাকে (যা তোমার অর্জিত নয় বরং আমার দেয়া) আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরন্তন জীবনে এর মূল্য জান্নাতের আকারে তোমাকে দান করবো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেনা–বেচার এ চুক্তি সম্পাদন করে সে মুমিন। ঈমান আসলে এ কেনা–বেচার আর এক নাম। আর যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে অথবা অঙ্গীকার করার পরও এমন আচরণ করবে যা কেবলমাত্র কেনা–বেচা না করার অবস্থায় করা যেতে পারে সে কাফের। আসলে এ কেনা–বেচাকে পাস কাটিয়ে চলার পারিভাষিক নাম কুফরী।

কেনা-বেচার এ তাৎপর্য ও স্বরূপটি অনুধাবন করার পর এবার তার অন্তরনিহিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা যাক ঃ

এক ঃ এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ মানুষকে দু'টি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। প্রথম পরীক্ষাটি হচ্ছে, তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবার পর সে মালিককে মালিক মনে করার এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের পর্যায়ে নেমে না আসার মতো সৎ আচরণ করে কিনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নিজের প্রভু ও মালিক আল্লাহর কাছ থেকে আজ নগদ যে মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না বরং মরার পর পরকালীন জীবনে যে মূল্য আদায় করার ওয়াদা তাঁর পক্ষ থেকে করা হয়েছে তার বিনিময়ে নিজের আজকের স্বাধীনতা ও তার যাবতীয় স্বাদ বিক্রি করতে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাজী হয়ে যাবার মত আস্থা তাঁর প্রতি আছে কিনা।

দুই ঃ যে ফিকাহর আইনের ভিত্তিতে দুনিয়ায় ইসলামী সমাজ গঠিত হয় তার দৃষ্টিতে ঈমান শুধুমাত্র কতিপয় বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। এ স্বীকৃতির পর নিজের স্বীকৃতি ও অংগীকারের ক্ষেত্রে মিথ্যুক হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শরীয়াতের কোন বিচারক কাউকে অমুমিন বা ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত ঘোষণা করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ঈমানের তাৎপর্য ও স্বরূপ হচ্ছে, বান্দা তার চিন্তা ও কর্ম উভয়ের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিবে এবং নিজের মালিকানার দাবী পুরোপুরি তাঁর সপক্ষে প্রত্যাহার করবে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের কালেমার স্বীকৃতি দেয় এবং নামায-রোযা ইত্যাদির বিধানও মেনে চলে কিন্তু নিজেকে নিজের দেহ ও প্রাণের, নিজের মন, মস্তিষ্ক ও শারীরিক শক্তির, নিজের ধন-সম্পদ, উপায়-উপকরণ ইত্যাদির এবং নিজের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত জিনিসের মালিক মনে করে এবং সেগুলোকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখে, তাহলে হয়তো দুনিয়ায় তাকে মুমিন মনে করা হবে কিন্তু আল্লাহর কাছে সে অবশ্যি অমুমিন হিসেবে গণ্য হবে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে কেনা-বেচার ব্যাপারকে ঈমানের আসল তাৎপর্য ও স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে আদতে কোন কেনা-বেচার কাজই করেনি। যেখানে আল্লাহ চান সেখানে ধন-প্রাণ নিয়োগ না করা এবং যেখানে তিনি চান না সেখানে ধন-প্রাণ নিয়োগ ও ব্যবহার করা—এ দু'টি কার্যধারাই চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করে দেয় যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি তার ধন-প্রাণ আল্লাহর হাতে বিক্রি করেইনি অথবা বিক্রির চুক্তি করার পরও সে বিক্রি করা জিনিসকে যথারীতি নিজের জিনিস মনে করছে।

তিন ঃ ঈমানের এ তাৎপর্য ও স্বরূপ ইসলামী জীবনাচরণকে কাফেরী জীবনাচরণ থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে মুসলিম ব্যক্তি সঠিক অর্থে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে সে জীবনের সকল বিভাগে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করে। তার আচরণে কোথাও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ ঘটতে পারে না। তবে কোন সময় সাময়িকভাবে সে গাফলতির শিকার হতে পারে এবং আল্লাহর সাথে নিজের কেনা-বেচার চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা অবলম্বন করাও তার পক্ষে সম্ভব। এটা অবশ্যি ভিন্ন ব্যাপার। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের সমন্বয়ে গঠিত কোন দল বা সমাজ সমষ্টিগতভাবেও আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর শরয়ী আইনের বিধিনিষেধমুক্ত হয়ে কোন নীতি-পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় নীতি, তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি

এবং কোন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তরজাতিক আচরণ অবলম্বন করতে পারে না। কোন সাময়িক গাফলতির কারণে যদি সেটা অবলম্বন করেও থাকে তাহলে যখনই সে এ ব্যাপারে জানতে পারবে তখনই স্বাধীন ও স্বৈরাচারী আচরণ ত্যাগ করে পুনরায় বন্দেগীর আচরণ করতে থাকবে। আল্লাহর আনুগত্য মুক্ত হয়ে কাজ করা এবং নিজের ও নিজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে নিজে নিজেই কি করবো না করবো, সিদ্ধান্ত নেয়া অবশ্যি একটি কুফরী জীবনাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের জীবন যাপন পদ্ধতি এ রকম তারা "মুসলমান" নামে আখ্যায়িত হোক বা "অমুসলিম" নামে তাতে কিছু যায় আসে না।

চার ঃ এ কেনা–বেচার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর যে ইচ্ছার আনুগত্য মানুষের জন্য অপরিহার্য হয় তা মানুষের নিজের প্রস্তাবিত বা উদ্ভাবিত নয় বরং আল্লাহ নিজে যেমন ব্যক্ত করেন তেমন। নিজে নিজেই কোন জিনিসকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে ধরে নেয়া এবং তার আনুগত্য করতে থাকা মূলত আল্লাহর ইচ্ছার নয় বরং নিজেরই ইচ্ছার আনুগত্য করার শামিল। এটি এ কেনাবেচার চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। যে ব্যক্তি ও দল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর হেদায়াত থেকে নিজের সমগ্র জীবনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে একমাত্র তাকেই আল্লাহর সাথে কৃত নিজের কেনা–বেচার চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হবে।

এ হচ্ছে এ কেনা–বেচার অন্তরনিহিত বিষয়। এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর এ কেনা–বেচার ক্ষেত্রে বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসানের পর মূল্য (অর্থাৎ জান্নাত) দেবার কথা বলা হয়েছে কেন তাও আপনাআপনিই বুঝে আসে। "বিক্রেতা নিজের প্রাণ ও ধন–সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেবে" কেবলমাত্র এ অংগীকারের বিনিময়েই যে জান্নাত পাওয়া যাবে তা নয়। বরং "বিক্রেতা নিজের পার্থিব জীবনে এ বিক্রি করা জিনিসের ওপর নিজের স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রত্যাহার করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের রক্ষক হয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করবে।" এরূপ বাস্তব ও সক্রিয় তৎপরতার বিনিময়েই জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং বিক্রেতার পার্থিব জীবনকাল শেষ হবার পর যখন প্রমাণিত হবে যে, কেনা–বেচার চুক্তি করার পর সে নিজের পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চুক্তির শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলেছে একমাত্র তখনই এ বিক্রি সম্পূর্ণ হবে। এর আগে পর্যন্ত ইনসাফের দৃষ্টিতে সে মূল্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

এ বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে বুঝে নেবার সাথে সাথে এ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কোন্ প্রেক্ষাপটে এ বিষয়বস্তুটির অবতারণা হয়েছে তাও জেনে নেয়া উচিত। ওপর থেকে যে ধারবাহিক ভাষণ চলে আসছিল তাতে এমন সব লোকের কথা ছিল যারা ঈমান আনার অংগীকার করেছিল ঠিকই কিন্তু পরীক্ষার কঠিন সময় সমুপস্থিত হলে তাদের অনেকে গাফলতির কারণে, অনেকে আন্তরিকতার অভাবে এবং অনেকে চূড়ান্ত মুনাফিকীর পথ অবলম্বন করার ফলে আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য নিজের সময়, ধন–সম্পদ, স্বার্থ ও প্রাণ দিতে ইতস্তত করেছিল। কাজেই এ বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর আচরণের সমালোচনা করার পর এখন তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়া হচ্ছে, তোমরা যে ঈমান গ্রহণ করার অংগীকার করেছো তা নিছক আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব মেনে নেবার নাম নয়। বরং একমাত্র আল্লাহই যে তোমাদের জান ও তোমাদের ধন–সম্পদের মালিক এ অকাট্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব

মেনে নেয়া ও এর স্বীকৃতি দেয়ার নামই ঈমান। কাজেই এ অংগীকার করার পর যদি তোমরা এ প্রাণ ও ধন–সম্পদ আল্লাহর হুকুমে কুরবানী করতে ইতস্তত করো এবং অন্যদিকে নিজের দৈহিক ও আত্মিক শক্তিসমূহ এবং নিজের উপায়–উপকরণসমূহ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকো তাহলে এ থেকে একথাই প্রমাণিত হবে যে, তোমাদের অংগীকার মিথ্যা। সাচ্চা ঈমানদার একমাত্র তারাই যারা যথার্থই নিজেদের জান–মাল আল্লাহর হাতে বিকিয়ে দিয়েছে এবং তাঁকেই এ সবের মালিক মনে করেছে। তিনি এগুলো যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন সেখানে নির্দ্বিধায় এগুলো ব্যয় করে এবং যেখানে তিনি নিষেধ করেন সেখানে দেহ ও আত্মার সামান্যতম শক্তিও এবং আর্থিক উপকরণের নগণ্যতম অংশও ব্যয় করতে রাজী হয় না।

১০৭. এ ব্যাপারে অনেকগুলো আপত্তি তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, এখানে যে ওয়াদার কথা বলা হয়েছে তা তাওরাত ও ইনজীলে নেই। কিন্তু ইনজীলের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলার কোন ভিত্তি নেই। বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যে ইনজীলসমূহ পাওয়া যায় সেগুলোয় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এমন অনেকগুলো উক্তি পাওয়া যায় যেগুলো এ আয়াতের সমার্থক। যেমন ঃ

"ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" (মথি ৫ ঃ ১০)

"যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারাইবে; এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।" (মথি ১০ ঃ ৩৯)

"আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী, কি পিতা ও মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।" (মথি ১৯ ঃ ২৯)

তবে তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তাতে অবশ্যি এ বিষয়বস্তুটি পাওয়া যায় না। শুধু এটি কেন, সেখানে তো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, শেষ বিচারের দিন ও পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির ধারণাই অনুপস্থিত। অথচ এ আকীদা সবসময় আল্লাহর সত্য দীনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবেই বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বর্তমান তাওরাতে এ বিষয়টির অস্তিত্ব না থাকার ফলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও ঠিক নয় যে, যথার্থই তাওরাতে এর অস্তিত্ব ছিল না। আসলে ইহুদিরা তাদের অবনতির যুগে এতই বস্তুবাদী ও দুনিয়াবী সমৃদ্ধির মোহে এমন পাগল হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের কাছে নিয়ামত ও পুরস্কার এ দুনিয়ায় লাভ করা ছাড়া তার আর কোন অর্থই ছিলো না। এ কারণে আল্লাহর কিতাবে বন্দেগী ও আনুগত্যের বিনিময়ে তাদেরকে যেসব পুরস্কার দেবার ওয়াদা করা হয়েছিল সে সবকে তারা দুনিয়ার এ মাটিতেই নামিয়ে এনেছিল এবং জান্নাতের প্রতিটি সংজ্ঞা ও বৈশিষ্টকে তারা তাদের আকাংখিত ফিলিস্তিনের ওপর প্রয়োগ করেছিল। তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে আমরা এ ধরনের বিষয়বস্তু দেখতে পাই। যেমন ঃ

"হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভূ একই সদাপ্রভূ; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভূকে প্রেম করিবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬ ঃ ৪, ৫)

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাগমনকারী[১০৮] তাঁর ইবাদাতকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে বিচরণকারী[১০৯] তার সামনে রুকূ' ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজ থেকে বিরতকারী এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী[১১০] (সেই সব মুমিন হয়ে থাকে যারা আল্লাহর সাথে কেনাবেচার সওদা করে)। আর হে নবী! এ মুমিনদেরকে সুখবর দাও।

আরো দেখি ঃ

"তিনি কি তোমার পিতা নহেন, যিনি তোমাকে লাভ করিলেন। তিনিই তোমার নির্মাতা ও স্থিতিকর্তা।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২ ঃ ৬)

কিন্তু আল্লাহর সাথে এ সম্পর্কের যে পুরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তোমরা এমন একটি দেশের মালিক হয়ে যাবে যেখানে দুধ ও মধুর নহর প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ ফিলিস্তিন। এর আসল কারণ হচ্ছে, তাওরাত বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা প্রথমত সম্পূর্ণ নয়, তাছাড়া নির্ভেজাল আল্লাহর বাণী সম্বলিতও নয়। বরং তার মধ্যে আল্লাহর বাণীর সাথে অনেক ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যও সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে ইহুদীদের জাতীয় ঐতিহ্য, বংশপ্রীতি, কুসংস্কার, আশা-আকাংখা, ভুল ধারণা ও ফিকাহভিত্তিক ইজতিহাদের একটি বিরাট অংশ একই ভাষণ ও বাণী পরম্পরার মধ্যে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে যে, অধিকাংশ স্থানে আল্লাহর আসল কালামকে তার মধ্য থেকে পৃথক করে বের করে নিয়ে আসা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। (এ প্রসঙ্গে আরো দেখুন সূরা আলে ইমরানের ২ টীকা)।

১০৮. মূল আয়াতে التَّائِبُوْنَ (আত্‌ তা-য়েবুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'তাওবাকারী'। কিন্তু যে বর্ণনা রীতিতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাওবা করা ঈমানদারদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অন্তরভুক্ত। তাই এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, তারা কেবলমাত্র একবার তাওবা করে না বরং সবসময় তাওবা করতে থাকে। আর তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে, ফিরে আসা। কাজেই এ শব্দটির মূল প্রাণ সত্তা প্রকাশ করার জন্য আমি এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এভাবে করেছি, "তারা আল্লাহর দিকে বারবার ফিরে আসে।" মুমিন যদিও তার পূর্ণ চেতনা ও সংকল্প সহকারে আল্লাহর সাথে নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ কেনা-বেচার কারবার করে কিন্তু যেহেতু বাইরের অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাই অনুভূত হয় যে, প্রাণ তার নিজের এবং ধনও তার নিজের আর তাছাড়া এ প্রাণ ও ধনের আসল মালিক মহান আল্লাহ

কোন অনুভূত সত্তা নন বরং একটি যুক্তিগ্রাহ্য সত্তা। তাই মুমিনের জীবনে বারবার এমন সময় আসতে থাকে যখন সে সাময়িকভাবে আল্লাহর সাথে করা তার কেনা–বেচার চুক্তি ভুলে যায়। এ অবস্থায় এ চুক্তি থেকে গাফেল হয়ে সে কোন লাগামহীন কার্যকলাপ করে বসে। কিন্তু একজন প্রকৃত ও যথার্থ মুমিনের বৈশিষ্ট এই যে, এ সাময়িক ভুলে যাওয়ার হাত থেকে যখনই সে রেহাই পায়, তখনই নিজের গাফলতির পর্দা ছিঁড়ে সে বেরিয়ে আসে এবং অনুভব করতে থাকে যে, অবচেতনভাবে সে নিজের অংগীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে ফেলেছে তখনই সে লজ্জা অনুভব করে, তীব্র অনুশোচনা সহকারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমা চায় এবং নিজের অংগীকারকে পুনরায় তরতাজা করে নেয়। এ বারবার তাওবা করা, বারবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং প্রত্যেকটি পদস্খলনের পর বিশ্বস্ততার পথে ফিরে আসাই ঈমানের স্থিতি ও স্থায়িত্বের প্রতীক। নয়তো যেসব মানবিক দুর্বলতা সহকারে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলোর উপস্থিতিতে তার পক্ষে এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর হাতে একবার ধন–প্রাণ বিক্রি করার পর চিরকাল পূর্ণ সচেতন অবস্থায় এ কেনা–বেচার দাবী পূরণ করতে থাকবে এবং কখনো গাফলতি ও বিস্মৃতির শিকার হবে না। তাই মহান আল্লাহ মুমিনের এ সজ্ঞা বর্ণনা করেন না যে, বন্দেগীর পথে এসে কখনো যার পা পিছলে যায় না সে মুমিন। বরং বার বার পা পিছলে যাবার পরও প্রতিবারই সে একই পথে ফিরে আসে, এটিকেই আল্লাহ মুমিনের প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এটিই হচ্ছে মানুষের আয়ত্বের ভেতরের শ্রেষ্ঠতম গুণ।

আবার এ প্রসংগে মুমিনদের গুণাবলীর মধ্যে সবার আগে তাওবার কথা বলার আর একটি উপযোগিতাও রয়েছে। আগে থেকে যে ধারাবাহিক বক্তব্য চলে আসছে তাতে এমনসব লোকের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে যাদের থেকে ঈমান বিরোধী কার্যকলাপের প্রকাশ ঘটেছিল। কাজেই তাদেরকে ঈমানের তাৎপর্য ও তার মৌলিক দাবী জানিয়ে দেবার পর এবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, মুমিনদের যে অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুণ হচ্ছে ঃ যখনই বন্দেগীর পথ থেকে তাদের পা পিছলে যায় তারা যেন সংগে সংগেই আবার সেদিকে ফিরে আসে। নিজেদের সত্য বিচ্যুতির ওপর যেন অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে না থাকে এবং পিছনের দিকে বেশী দূরে চলে না যায়।

১০৯. মূল ইবারতে السائحون (আস্ সায়েহুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন الصائمون (আস্ সা–য়েমুন) অর্থাৎ যারা রোযা রাখে। কিন্তু السائحون বা বিচরণকারীকে রোযাদার অর্থে ব্যবহার করলে সেটা হবে তার রূপক ও পরোক্ষ অর্থ। এর প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ এটা নয়। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ শব্দটির এ অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন সেটিকে নবীর (সা) ওপর প্রয়োগ করা ঠিক নয়। তাই আমরা একে এর প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করাকেই বেশী সঠিক মনে করি। কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় ইনফাক শব্দটি সরল ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, এর মানে হয় ব্যয় করা এবং এর উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা। ঠিক তেমনি এখানে বিচরণ করা মানেও নিছক ঘোরাফেরা করা নয়। বরং এমন উদ্দেশ্যে যমীনে চলাফেরা করা, যা পবিত্র ও উন্নত এবং যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। যেমন দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা, কুফর শাসিত

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা সংগত নয়, তারা তাদের আত্মীয়–স্বজন হলেই বা কি এসে যায়, যখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছ যে, তারা জাহান্নামেরই উপযুক্ত।[১১১] ইবরাহীম তার বাপের জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিল তা তো সেই ওয়াদার কারণে ছিল যা সে তার বাপের সাথে করেছিল।[১১২] কিন্তু যখন তার কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তার বাপ আল্লাহর দুশমন তখন সে তার প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে। যথার্থই ইবরাহীম কোমল হৃদয়, আল্লাহভীরু ও ধৈর্যশীল ছিল।[১১৩]

এলাকা থেকে হিজরত করা, দীনের দাওয়াত দেয়া, মানুষের চরিত্র সংশোধন করা, পরিচ্ছন্ন ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করা, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করা এবং হালাল জীবিকা উপার্জন করা। এ গুণটিকে এখানে বিশেষভাবে মুমিনদের গুণের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে এ জন্য যে, যারা ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও জিহাদের আহবানে ঘর থেকে বেব হয়নি তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সত্যিকার মুমিন ঈমানের দাবী করার পর নিজের জায়গায় আরামে বসে থাকতে পারে না। বরং সে আল্লাহর দীন গ্রহণ করার পর তার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার দাবী পূরণ করার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী অবিরাম প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকে।

১১০. অর্থাৎ মহান আল্লাহ আকীদা–বিশ্বাস, ইবাদাত–বন্দেগী, নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, তামাদ্দুন অর্থনীতি–রাজনীতি, আইন–আদালত এবং যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন তারা তা পুরোপুরি মেনে চলে। নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ড এ সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কখনো এ সীমা অতিক্রম করে ইচ্ছামতো কাজ করতে থাকে না। আবার কখনো আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মনগড়া আইনের বা মানুষের তৈরী ভিন্নতর আইনকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না। এ ছাড়াও আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণের মধ্যে এ মর্মার্থও নিহিত রয়েছে যে, এ সীমারেখাগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এগুলো লংঘন করতে দেয়া যাবে না। কাজেই সাচ্চা ঈমানদারদের সংজ্ঞা কেবল এতটুকুই নয় যে, তারা নিজেরা আল্লাহর সীমা মেনে চলে বরং তাদের অতিরিক্ত গুণাবলী হচ্ছে এই যে, তারা দুনিয়ায় আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সেগুলো অটুট রাখার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

১১১. কোন ব্যক্তির জন্য ক্ষমার আবেদন জানানোর অনিবার্য অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা তার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাকে ভালোবাসি। দ্বিতীয়ত আমরা তার দোষকে ক্ষমাযোগ্য মনে করি। যারা বিশ্বস্তদের অন্তরভুক্ত এবং শুধুমাত্র গোনাহগার তাদের ক্ষেত্রে এ দু'টো কথাই ঠিক। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, তাকে ভালবাসা ও তার অপরাধকে ক্ষমাযোগ্য মনে করা শুধু যে, নীতিগতভাবে ভুল তাই নয় বরং এর ফলে আমাদের নিজেদের বিশ্বস্ততাও সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। আর যদি শুধুমাত্র আমাদের আত্মীয় বলে আমরা তাকে মাফ করে দিতে চাই তাহলে এর মানে হবে, আমাদের কাছে আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততার দাবীর তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান। আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি আমাদের ভালবাসা নির্ভেজাল ও শর্তহীন নয়। আল্লাহদ্রোহীদের সাথে আমরা যে সম্পর্ক জুড়ে রেখেছি তার ফলে আমরা চাচ্ছি, আল্লাহ নিজেও যেন এ সম্পর্ক গ্রহণ করেন এবং আমাদের আত্মীয়কে যেন অবশ্যই ক্ষমা করে দেন, যদিও এ একই অপরাধ করার কারণে অন্যান্য অপরাধীদেরকে তিনি জাহান্নামের শাস্তি দিয়ে থাকেন। বস্তুত এ সমস্ত কথাই ভুল, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার বিরোধী এবং সেই একনিষ্ঠ ঈমানের পরিপন্থী যার দাবী হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি আমাদের ভালবাসা নির্ভেজাল হতে হবে, আল্লাহর বন্ধু হবে আমাদের বন্ধু এবং তাঁর শত্রু হবে আমাদের শত্রু। এ কারণে মহান আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, "তোমরা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো না।" বরং তিনি বলেছেন, "তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা তোমাদের পক্ষে শোভা পায় না।" অর্থাৎ আমার মানা করায় যদি তোমরা বিরত থাকো তাহলে তো এর তেমন কোন গুরুত্ব থাকে না। মূলত তোমাদের মধ্যে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অনুভূতি এত বেশী তীব্র হওয়া উচিত যার ফলে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারীদের সাথে সহানুভূতির সম্পর্ক রাখা এবং তাদের অপরাধকে ক্ষমাযোগ্য মনে করা তোমাদের নিজেদের কাছেই অশোভন ঠেকে।

এখানে আরো এতটুকু বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহদ্রোহীদের প্রতি যে সহানুভূতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা কেবলমাত্র এমন পর্যায়ের সহানুভূতি যা দীনের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে মানবিক সহানুভূতি এবং পার্থিব সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্ক এবং স্নেহ-সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার—এসব নিষিদ্ধ নয় বরং প্রশংসনীয়। আত্মীয় কাফের হোক বা মুমিন, তার সামাজিক অধিকার অবশ্যি প্রদান করতে হবে। বিপদগ্রস্ত মানুষকে সকল অবস্থায় সাহায্য দিতে হবে। অভাবীকে যে কোন সময় সহায়তা দান করতে হবে। রুগ্ন ও আহতের সেবা ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে কোন ত্রুটি দেখানো যাবে না। ইয়াতীমের মাথায় অবশ্যি স্নেহের হাত বুলাতে হবে। এসব ব্যাপারে কখনো মুসলিম ও অমুসলিমের বাছবিচার করা চলবে না।

১১২. হযরত ইবরাহীম তাঁর মুশরিক পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় যে কথা বলেছিলেন সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন ঃ

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا

"আপনার প্রতি সালাম, আপনার জন্য আমি আমার রবের কাছে দোয়া করবো যেন তিনি আপনাকে মাফ করে দেন। তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান।" (মারয়াম : ৪৭)

তিনি আরো বলেছিলেন :

لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط

"আমি আপনার জন্য অবশ্যি ক্ষমা চাইবো। তবে আপনাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা আমার নেই।" (আল মুমতাহিনা : ৪)

উপরোক্ত ওয়াদার ভিত্তিতে তিনি নিজের পিতার জন্য এ দোয়া করেছিলেন :

وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۙ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۙ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۙ

"আর আমার পিতাকে মাফ করে দাও, তিনি পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত ছিলেন। আর যেদিন সকল মানুষকে উঠানো হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না। যেদিন ধনসম্পদ এবং সন্তান সন্ততি কারোর কোন কাজে লাগবে না। একমাত্র সে-ই নাজাত পাবে, যে আল্লাহর সামনে হাযির হবে বিদ্রোহমুক্ত হৃদয় নিয়ে।" (আশ্ শুআরা : ৮৬-৮৯)

এ দোয়া তো প্রথমত অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত ভাষায় করা হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই হযরত ইবরাহীম চিন্তা করলেন যে, তিনি যে ব্যক্তির জন্য দোয়া করছেন সে তো ছিল প্রকাশ্য আল্লাহদ্রোহী এবং আল্লাহর দীনের ঘোরতর শত্রু তখন তিনি এ থেকে বিরত হলেন এবং একজন যথার্থ বিশ্বস্ত মুমিনের মত বিদ্রোহীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো থেকে পরিষ্কারভাবে সরে দাঁড়ালেন। অথচ এ বিদ্রোহী ছিল তাঁর পিতা, যে এক সময় স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে তাঁকে লালন পালন করেছিল।

১১৩. মূলে اواه (আওওয়াহুন) ও حليم (হালীমুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আওওয়াহুন মানে হচ্ছে, যে অনেক বেশী হা-হুতাশ করে, কান্নাকাটি করে, ভয় পায় ও আক্ষেপ করে। আর "হালীম" এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের মেজায সংযত রাখে, রাগে, শত্রুতায় ও বিরোধিতায় বেসামাল আচরণ করে না এবং অন্যদিকে ভালবাসায়, বন্ধুত্বে ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে যায় না। এখানে এ শব্দ দু'টি দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করছে। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল হৃদয় বৃত্তির অধিকারী। তাঁর পিতা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে, একথা ভেবে তিনি কেঁপে উঠেছিলেন। আবার তিনি ছিলেন হালীম—সংযমী ও ধৈর্যশীল। তাঁর পিতা ইসলামের পথে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বাধা দেবার জন্য তাঁর ওপর যে জুলুম নির্যাতন চালিয়েছিল তা সত্ত্বেও তাঁর মুখ থেকে পিতার জন্য দোয়া বের হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি দেখলেন, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন, তাই তিনি তার থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করে নিলেন। কারণ তিনি আল্লাহকে ভয় করতেন এবং কারোর প্রতি ভালোবাসায় সীমা অতিক্রম করতেন না।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

লোকদেরকে হেদায়াত দান করার পর আবার গোমরাহীতে লিপ্ত করা আল্লাহর রীতি নয়, যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে কোন্ জিনিস থেকে সংযত হয়ে চলতে হবে তা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন।[১১৪] আসলে আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের জ্ঞান রাখেন। আর এও সত্য, আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ইখতিয়ারভুক্ত এবং তোমাদের এমন কোন সহায় ও সাহায্যকারী নেই যে তোমাদেরকে তাঁর হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

১১৪. অর্থাৎ লোকদের কোন্ চিন্তা, কার্যধারা ও পদ্ধতি থেকে বাঁচতে হবে তা আল্লাহ আগেই বলে দেন। তারপর যখন তারা তা থেকে বিরত হয় না এবং ভুল চিন্তা ও কাজে লিপ্ত হয়ে তার ওপর অবিচল থাকে তখন আল্লাহও তাদের হেদায়াত করার ও সঠিক পথনির্দেশনা দেয়া থেকে বিরত হন এবং যে ভুল পথে তারা যেতে চায় তার ওপর তাদেরকে ঠেলে দেন।

এ বক্তব্যটি থেকে একটি মূলনীতি অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় হেদায়াত দেয়া ও গোমরাহ করাকে তাঁর নিজের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলো এ মূলনীতিটির মাধ্যমে ভালোভাবে বুঝা যেতে পারে। আল্লাহর হেদায়াত দেয়ার মানে হচ্ছে, তিনি নিজের নবী ও কিতাবসমূহের সাহায্যে লোকদের সামনে সঠিক চিন্তা ও কর্মধারা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তারপর যারা স্বেচ্ছায় এ পথে চলতে উদ্যোগী হয় তাদের চলার সুযোগ ও সামর্থ দান করেন। আর আল্লাহর গোমরাহীতে লিপ্ত করার মানে হচ্ছে, তিনি যে সঠিক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন যদি তার বিপরীত পথে চলার জন্য কেউ জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং সোজা পথে চলতে না চায় তাহলে আল্লাহ জোর করে তাকে সত্য পথ দেখান না এবং সত্যের দিকে চালিতও করেন না বরং যেদিকে সে নিজে যেতে চায় সেদিকে যাবার সুযোগ ও সামর্থ তাকে দান করেন।

আলোচ্য ভাষণটির একথাটি কোন্ প্রসংগে বর্ণনা করা হয়েছে, আগের ও পরের ভাষণগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে তা সহজেই বুঝা যেতে পারে। এটা এক ধরনের সতর্কবাণী। একে অত্যন্ত সংগতভাবে আগের বর্ণনার সমাপ্তি হিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে। আবার পরে যে আলোচনা আসছে তার ভূমিকাও বলা যেতে পারে।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾ وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۗ حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ۗ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾

আল্লাহ নবীকে মাফ করে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত কঠিন সময়ে যে মুহাজির ও আনসারগণ নবীর সাথে সহযোগিতা করেন তাদেরকেও মাফ করে দিয়েছেন।[১১৫] যদিও তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের দিল বক্রতার দিকে আকৃষ্ট হতে যাচ্ছিল[১১৬] (কিন্তু তারা এ বক্রতার অনুগামী না হয়ে নবীর সহযোগী হয়েছেন। ফলে) আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন।[১১৭] নিসন্দেহে এ লোকদের প্রতি তিনি স্নেহশীল ও মেহেরবান। আর যে তিনজনের ব্যাপার মুলতবী করে দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও তিনি মাফ করে দিয়েছেন।[১১৮] পৃথিবী তার সমগ্র ব্যাপকতা সত্ত্বেও যখন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো, তাদের নিজেদের প্রাণও তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ালো এবং তারা জেনে নিল যে, আল্লাহর হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিজের রহমতের আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই তখন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের দিকে ফিরলেন যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। অবশ্যি আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১১৯]

১১৫. অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যেসব ছোটখাটো ত্রুটি–বিচ্যুতি হয়েছিল তাদের উৎকৃষ্ট মানের কার্যকলাপের বদৌলতে আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজে যে ত্রুটি হয়েছিল আগেই ৪৩ আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল তাদেরকে তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন।

১১৬. অর্থাৎ কোন কোন আন্তরিকতা সম্পন্ন সাহাবাও এ কঠিন সময়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে কোন না কোন ভাবে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাদের দিলে ঈমান ছিল এবং তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর সত্য দীনকে ভালবাসতেন তাই শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের দুর্বলতার ওপর বিজয়ী হতে পেরেছিলেন।

১১৭. অর্থাৎ তাদের মনে ভ্রান্ত নীতির প্রতি এ ঝোঁক কেন সৃষ্টি হয়েছিল সে জন্য আল্লাহ এখন আর তাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কারণ মানুষ নিজেই যে দুর্বলতার সংশোধন করে নেয় আল্লাহ সে জন্য কোন কৈফিয়ত তলব করেন না।

১১৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক থেকে মদীনায় ফিরে এলেন তখন যারা পিছনে অর্থাৎ মদীনায় থেকে গিয়েছিল। তারা ওযর পেশ করার জন্য হাজির হলো। তাদের মধ্যে ৮০ জনেরও বেশী ছিল মুনাফিক। মুনাফিকরা মিথ্যা ওযর পেশ করছিল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মেনে নিচ্ছিলেন। তারপর এলো এ তিন জন মুমিনের পালা। তারা পরিষ্কারভাবে নিজেদের দোষ স্বীকার করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তিনজনের ব্যাপারে ফায়সালা মুলতবী রাখলেন।

তিনি সাধারণ মুসলমানদের হুকুম দিলেন, আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক রাখা যাবে না। এ বিষয়টির ফায়সালা করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। (এখানে একথাটি অবশ্যি) সামনে রাখতে হবে যে, ৯৯ টীকায় যে সাতজন সাহাবীর আলোচনা এসেছে তাদের ব্যাপারটি কিন্তু এদের থেকে স্বতন্ত্র। তারা তো জবাবদিহির আগেই নিজেরাই নিজেদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন।)

১১৯. এ তিন জন সাহাবী ছিলেন কা'ব ইবনে মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়াহ এবং মুরারাহ ইবনে রুবাই। আগেই বলেছি, এরা তিনজন ছিলেন সাচ্চা মুমিন। এর আগে তারা বহুবার নিজেদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। শেষের দু'জন তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তাঁদের ঈমানী সত্যতা সব রকমের সংশয়-সন্দেহের উর্ধে ছিল। আর প্রথম জন যদিও বদরী সাহাবী ছিলেন না কিন্তু বদর ছাড়া প্রতিটি যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের জন্য তাঁর এসব ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা সত্ত্বেও এমন এক নাজুক সময়ে যখন যুদ্ধ করার শক্তি ও সামর্থের অধিকারী প্রত্যেক মুমিনকে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসার হুকুম দেয়া হয়েছিল তখন তাঁরা যে অলসতা ও গাফলতির পরিচয় দিয়েছিলেন সে জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে মুসলমানদের প্রতি কড়া নির্দেশ জারি করেন—কেউ এদের সাথে সালাম কালাম করতে পারবে না। ৪০ দিন পরে তাদের স্ত্রীদেরকেও তাদের থেকে আলাদা বসবাস করার কঠোর আদেশ দেয়া হলো। আসলে এ আয়াতে তাদের অবস্থার যে ছবি আঁকা হয়েছে মদীনার জনবসতিতে তাদের অবস্থা ঠিক তা-ই হয়ে গিয়েছিল। শেষে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি যখন ৫০ দিনে এসে ঠেকলো তখন ক্ষমার এ ঘোষণা নাযিল হলো।

এ তিন জনের মধ্য থেকে হযরত কা'ব ইবনে মালেক অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনা বড়ই শিক্ষাপ্রদ। বৃদ্ধ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ তাঁকে হাত ধরে নিয়ে চলাফেরা করতেন। আবদুল্লাহকে তিনি নিজেই এ ঘটনা এভাবে শুনান ঃ

"তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই মুসলমান-দেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানাতেন তখনই আমি মনে মনে সংকল্প করে নিতাম যে, যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নেবো। কিন্তু ফিরে এসে আমাকে অলসতায় পেয়ে বসতো এবং আমি বলতাম, এখনই এতো তাড়াহুড়া কিসের, রওয়ানা দেবার সময় যখন আসবে তখন তৈরী হতে কতটুকু সময়ই বা লাগবে। এভাবে আমার প্রস্তুতি পিছিয়ে যেতে থাকলো। তারপর একদিন সেনাবাহিনীর রওয়ানা দেবার সময় এসে গেল। অথচ তখনো আমি তৈরী ছিলাম না। আমি মনে মনে বললাম, সেনাবাহিনী চলে যাক, আমি এক-দু'দিন পরে পথে তাদের সাথে যোগ দেবো। কিন্তু তখনো একই অলসতা আমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়ালো। এভাবে সময় পার হয়ে গেলো।

এ সময় যখন আমি মদীনায় থেকে গিয়েছিলাম আমার মন ক্রমেই বিষিয়ে উঠছিল। কারণ আমি দেখছিলাম যাদের সাথে এ শহরে আমি রয়েছি তারা হয় মুনাফিক, নয়তো দুর্বল, বৃদ্ধ ও অক্ষম লোক, যাদেরকে আল্লাহ অব্যাহতি দিয়েছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে যথারীতি মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নফল নামায পড়লেন। তারপর তিনি লোকদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য বসলেন। মুনাফিকরা এ মজলিসে এসে লম্বা লম্বা কসম খেয়ে তাদের ওযর পেশ করতে লাগলো। এদের সংখ্যা ছিল ৮০-এর চাইতেও বেশী। রসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রত্যেকের বানোয়াট ও সাজানো কথা শুনলেন। তাদের লোক দেখানো ওযর মেনে নিলেন এবং তাদের অন্তরের ব্যাপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন। তারপর আমার পালা এলো। আমি সামনে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, আসুন! আপনাকে কিসে আটকে রেখেছিল? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! যদি আমি কোন দুনিয়াদারের সামনে হাযির হতাম তাহলে অবশ্যি কোন না কোন কথা বানিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতাম। কথা বানিয়ে বলার কৌশল আমিও জানি। কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এখন কোন মিথ্যা ওযর পেশ করে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করেও নেই তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনাকে আমার প্রতি আবার নারাজ করে দেবেন। তবে যদি আমি সত্য বলি তাহলে আপনি নারাজ হয়ে গেলেও আমি আশা রাখি আল্লাহ আমার জন্য ক্ষমার কোন পথ তৈরী করে দেবেন। আসলে পেশ করার মতো কোন ওযরই আমার নেই। যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সক্ষম ছিলাম।" একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। ঠিক আছে, চলে যাও এবং আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো।" আমি উঠে নিজের গোত্রের লোকদের মধ্যে গিয়ে বসলাম। এখানে সবাই আমার পিছনে লাগলো। তারা আমাকে এ বলে তিরস্কার করতে লাগলো যে, তুমিও কোন মিথ্যা ওযর পেশ করলে না কেন! এসব কথা শুনে আবার রসূলের কাছে গিয়ে কিছু বানোয়াট ওযর পেশ করার জন্য আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো। কিন্তু যখন আমি শুনলাম আরো দু'জন সৎলোক (মুরারাহ ইবনে রুবাই ও হেলাল ইবনে উমাইয়াহ) আমার মতো একই সত্য কথা বলেছেন তখন আমি মানসিক প্রশান্তি অনুভব করলাম এবং আমার সত্য কথার ওপর অটল থাকলাম।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ হুকুম জারি করলেন, আমাদের তিন জনের সাথে কেউ কথা বলতে পারবে না। অন্য দু'জন তো ঘরের মধ্যে বসে রইলো কিন্তু আমি বাইরে বের হতাম, জামায়াতে নামায পড়তাম এবং বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। মনে হতো, এ দেশটি একদম বদলে গেছে। আমি যেন এখানে একজন অপরিচিত, আগন্তুক। এ জনপদের কেউ আমাকে জানে না, চেনে না। মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে যথারীতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করতাম। আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠছে কিনা তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করতাম। কিন্তু শুধু অপেক্ষা করাই সার হতো। তাঁর নজর আমার ওপর কিভাবে পড়ছে তা দেখার জন্য আমি আড়চোখে তাঁর প্রতি তাকাতাম। কিন্তু অবস্থা ছিল এই যে, যতক্ষণ আমি নামায পড়তাম ততক্ষণ তিনি আমাকে দেখতে থাকতেন এবং যেই আমি নামায শেষ করতাম অমনি আমার ওপর থেকে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতেন। একদিন ঘাবড়ে গিয়ে আমার চাচাত ভাই ও ছেলে বেলার বন্ধু আবু কাতাদার কাছে গেলাম। তার বাগানের পাঁচিলের ওপর উঠে তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর সেই বান্দাটি আমার সালামের জবাবও দিলো না। আমি বললাম ঃ "হে আবু কাতাদাহ! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি না?" সে নীরব রইলো। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে নীরব রইলো। তৃতীয়বার যখন আমি কসম দিয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম তখন সে শুধুমাত্র এতটুকু বললো ঃ "আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।" একথায় আমার চোখে পানি এসে গেলো। আমি পাঁচিল থেকে নেমে এলাম। এ সময় আমি একদিন বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার নাবৃতী বংশীয় এক লোকের সাথে দেখা হলো। সে রেশমে মোড়া গাসসান রাজার একটি পত্র আমার হাতে দিল। আমি পত্রটা খুলে পড়লাম। তাতে লেখা ছিল, "আমরা শুনেছি, তোমার নেতা তোমার ওপর উৎপীড়ন করছে। তুমি কোন নগণ্য ব্যক্তি নও। তোমাকে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমাকে মর্যাদা দান করবো।" আমি বললাম, এ দেখি, আর এক আপদ! তখনই চিঠিটাকে চুলোর আগুনে ফেলে দিলাম।

চল্লিশটা দিন এভাবে কেটে যাবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে তাঁর দূত এই হুকুম নিয়ে এলেন যে, নিজের স্ত্রী থেকেও আলাদা হয়ে যাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাকে কি তালাক দিয়ে দেবো? জবাব এলো, না, তালাক নয়, শুধু আলাদা থাকো। কাজেই আমি স্ত্রীকে বলে দিলাম, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো।

এভাবে উনপঞ্চাশ দিন পার হয়ে পঞ্চাশ দিন পড়লো। সেদিন সকালে নামাযের পরে আমি নিজের ঘরের ছাদের ওপর বসে ছিলাম। নিজের জীবনের প্রতি আমার ধিক্কার জাগছিল হঠাৎ এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে বললো ঃ "কা'ব ইবনে মালিককে অভিনন্দন।" একথা শুনেই আমি সিজদায় নত হয়ে গেলাম। আমি নিশ্চিত হলাম যে, আমার ক্ষমার ঘোষণা জারি হয়েছে। এরপর লোকেরা দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো। তারা প্রত্যেকে পাল্লা দিয়ে আমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমার তাওবা কবুল হয়েছে। আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীর দিকে গেলাম। দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি সালাম দিলাম। তিনি বললেন, "তোমাকে মোবারকবাদ! আজকের দিনটি তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে? বললেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে" এবং এ সংগে তিনি সংশ্লিষ্ট আয়াত শুনিয়ে দিলেন। আমি বললাম ঃ "হে আল্লাহর রসূল! আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে সাদকা করে দিতে চাই। এটাও আমার তাওবার অংশ বিশেষ।" বললেন ঃ "কিছু রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য ভাল।" এ বক্তব্য অনুযায়ী আমি নিজের খয়বরের সম্পত্তির অংশটুকু রেখে দিলাম। বাদবাকি সব সাদকা করে দিলাম। তারপর আল্লাহর কাছে অংগীকার করলাম, যে সত্যকথা বলার কারণে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তার ওপর আমি সারা জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকবো। কাজেই আজ পর্যন্ত আমি জেনে বুঝে যথার্থ সত্য ও প্রকৃত ঘটনা বিরোধী কোন কথা বলিনি এবং আশা করি আল্লাহ আগামীতেও তা থেকে আমাকে বাঁচাবেন।"

এ ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। প্রত্যেক মুমিনের মনে তা বদ্ধমূল হয়ে যাওয়া উচিত।

এ থেকে প্রথম যে শিক্ষাটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে কুফর ও ইসলামের সংঘাতের ব্যাপারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক। এ সংঘাতে কুফরের সাথে সহযোগিতা করা তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে অসৎ উদ্দেশ্যে নয়, সৎ উদ্দেশ্যে এবং সারা জীবনও নয় বরং কোন এক সময় ভুল করে বসে, তারও সারা জীবনের ইবাদাত-বন্দেগী ও দীনদারী ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এমন কি এমন উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকও পাকড়াও হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না যে বদর, ওহোদ, আহযাব ও হুনায়েনের ভয়াবহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করেছিল এবং যার ঈমান ও আন্তরিকতার মধ্যে বিন্দুমাত্র খাদ ছিলো না।

দ্বিতীয় শিক্ষাটিও এর চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেটি হচ্ছে, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গড়িমসি করা কোন মামুলি ব্যাপার নয়। বরং অনেক সময় শুধুমাত্র গড়িমসি করতে করতে মানুষ এমন কোন ভুল করে বসে যা বড় বড় গোনাহের অন্তরভুক্ত। তখন একথা বলে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে না যে, সে অসৎ উদ্দেশ্যে এ কাজটি করেনি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল। এ ঘটনা খুবই চমৎকারভাবে তার প্রাণসত্তা উন্মোচন করে দেয়। একদিকে রয়েছে মুনাফিকের দল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সবার কাছে সুস্পষ্ট ছিল। এরপরও তাদের বাহ্যিক ওযরসমূহ শোনা হয় এবং সেগুলোর সত্যাসত্য এড়িয়ে যাওয়া হয়। কারণ তাদের কাছ থেকে তো আন্তরিকতার আশাই করা হয়নি কোন দিন। কাজেই এখন আন্তরিকতার অভাব নিয়ে অভিযোগ তোলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে রয়েছেন একজন পরীক্ষিত মুমিন। তার উৎসর্গীত প্রাণ কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কারো মনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশই নেই। তিনি মিথ্যাও বলেন না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের ভুল স্বীকার করে নেন। কিন্তু তার ওপর ক্রোধ বর্ষিত হয়। এ ক্রোধের কারণ এ নয় যে, তার মুমিন হবার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে বরং এর কারণ হচ্ছে, মুমিন হওয়া সত্ত্বেও সে মুনাফিক সুলভ কাজ করলো কেন? আসলে এভাবে তাকে একথাই বলা হচ্ছে যে, তোমরাই পৃথিবীর সারবস্তু। তোমাদের থেকে যদি মৃত্তিকা উর্বরতা লাভ করতে না পারে তাহলে উর্বরতা কোথা থেকে

আসবে? তারপর মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ পুরো ঘটনায় নেতা যেভাবে শাস্তি দিচ্ছেন এবং ভক্ত যেভাবে তা মাথা পেতে নিচ্ছেন আর এ সাথে সমগ্র দলটি যেভাবে এ শাস্তি কার্যকর করছে তার প্রত্যেকটি দিকই তুলনা বিহীন। এ ক্ষেত্রে কে বেশী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তা স্থির করাই কঠিন। নেতা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিচ্ছেন। কিন্তু সেখানে ক্রোধ বা ঘৃণার লেশমাত্র নেই। বরং গভীর স্নেহ ও প্রীতি সহকারে তিনি শাস্তি দিচ্ছেন। ক্রুদ্ধ পিতার ন্যায় তার দৃষ্টি একদিকে অনল বর্ষণ করে চলেছে ঠিকই কিন্তু অন্য দিকে আবার তাকে প্রতি মুহূর্তে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, তোমার সাথে কোন শত্রুতা নেই বরং তোমার ভুলের কারণে আমার অন্তরটা ব্যথায় টনটন করছে। তুমি নিজের ভুল শুধরে নিলে তোমাকে এ বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য আমি ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছি। ভক্ত শাস্তির তীব্রতায় অস্থির হয়ে পড়ছে। কিন্তু তার পদযুগল আনুগত্যের রাজপথ থেকে এক চুল পরিমাণও টলছে না। সে আত্মম্ভরিতা ও জাহেলী দাম্ভিকতারও শিকার হচ্ছে না এবং প্রকাশ্যে অহংকার করে বেড়ানো তো দূরের কথা, এমনকি নিজের প্রিয় নেতার বিরুদ্ধে মনের গভীরে সামান্যতম অভিযোগও সৃষ্টি হতে দিচ্ছে না। বরং নেতার প্রতি ভালবাসায় তার মন আরো ভরে উঠেছে। শাস্তির পুরো পঞ্চাশ দিন তার দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী অধীর হয়ে যে জিনিসটি খুঁজে বেড়িয়েছে, সেটি হচ্ছে, নেতার চোখে তার প্রতি আগের সেই মমত্বপূর্ণ দৃষ্টি বহাল আছে কিনা, যা তার সমস্ত আশা-আকাংখার শেষ আশ্রয় স্থল। সে যেন একজন দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক। আকাশের এক কিনারে যে ছোট্ট এক টুকরো মেঘ দেখা যাচ্ছে সেটিই তার সমস্ত আশার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। তারপর দলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, তার অভূতপূর্ব শৃংখলা ও নৈতিক প্রাণ স্পন্দন মানুষকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে দেয়। সেখানে এমন অটুট শৃংখলা বিরাজিত যে, নেতার মুখ থেকে বয়কটের নির্দেশ উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই অপরাধীর ওপর থেকে দলের সমস্ত লোক দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রকাশ্যে তো দূরের কথা গোপনেও কোন নিকটতম আত্মীয় এবং সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুও তার সাথে কথা বলছে না। স্ত্রীও তার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর দোহাই দিয়ে সে জিজ্ঞেস করছে, আমার আন্তরিকতায় কি তোমাদের কোন সন্দেহ জেগেছে? কিন্তু যারা দীর্ঘকাল তাকে আন্তরিক দেখে আসছিল তারা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে ঃ "আমাদের কাছ থেকে নয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছ থেকে নিজের আন্তরিকতার সনদ নাও।" অন্যদিকে দলের নৈতিক প্রাণসত্তা এত বেশী উন্নত ও পবিত্র যে, এক ব্যক্তির উঁচু মাথা নীচু হবার সাথে সাথেই নিন্দুকদের কোন দল তার নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠে না। বরং শাস্তির এ পুরো সময়টায় দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের এ সাজাপ্রাপ্ত ভাইয়ের বিপদে মর্মবেদনা অনুভব করে এবং পুনরায় তাকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যাকুল থাকে। ক্ষমার কথা ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই লোকেরা অতি দ্রুত তার কাছে পৌঁছে তার সাথে সাক্ষাত করার ও তাকে সুসংবাদ দেবার জন্য দৌড়াতে থাকে। কুরআন যে ধরনের সত্যনিষ্ঠ দল দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এটি হচ্ছে তারই দৃষ্টান্ত।

এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আয়াত বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সাহাবীগণ আল্লাহর দরবার থেকে যে ক্ষমা লাভ করেছিলেন এবং সেই ক্ষমার কথা বর্ণনা করার ভাষার মধ্যে যে স্নেহ ও করুণা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তার মূলে রয়েছে তাদের আন্তরিকতা। পঞ্চাশ দিনের কঠোর শাস্তি ভোগকালে তারা এ আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। ভুল করার পর যদি তারা অহংকার করতেন, নিজেদের নেতার **অসন্তোষের**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ
لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ
رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ
ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ
الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১৫ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সহযোগী হও। মদীনাবাসী ও তাদের আশপাশের বেদুইনদের জন্য আল্লাহর রসূলকে ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকা এবং তার ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে নিজেদের জীবনের চিন্তায় মশগুল হয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সমীচীন ছিল না। কারণ আল্লাহর পথে তারা যখনই ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও শারীরিক কষ্ট ভোগ করবে, যখনই এমন পথ অবলম্বন করবে যা সত্য অমান্যকারীদের কাছে অসহনীয় এবং যখনই কোন দুশমনের ওপর (সত্যের প্রতি দুশমনির) প্রতিশোধ নেবে তৎক্ষণাৎ তার বদলে তাদের জন্য একটি সৎকাজ লেখা হবেই। এর ব্যতিক্রম কখনো হবে না। অবশ্যি আল্লাহর দরবারে সৎ কর্মশীলদের পরিশ্রম বিফল যায় না।

জবাবে ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতেন, শাস্তিলাভের ফলে এমনই বিক্ষুব্ধ হতেন যেমন স্বার্থবাদী লোকদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, সামাজিক বয়কটকালে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে রাজি। কিন্তু নিজের আত্মাভিমানকে আহত করতে রাজি নই—এ নীতি অবলম্বন করতেন এবং যদি এ সমগ্র শাস্তিকালে দলের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে বেড়াতেন এবং অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ লোকদের খুঁজে বের করে এক সাথে মিলিয়ে জোটবদ্ধ করতেন, তাহলে তাদের ক্ষমা করা তো দূরের কথা বরং নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, দল থেকে তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হতো এবং এ শাস্তির মেয়াদ শেষ হবার পর তাদের যোগ্য শাস্তিই তাদেরকে দেয়া হতো। তাদেরকে বলা হতো, যাও তোমরা নিজেদের অহম পূজায় লিপ্ত থাকো। সত্যের কালেমা বুলন্দ করার সংগ্রামে অংশ নেবার সৌভাগ্য তোমাদের আর কখনো হবে না।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

অনুরূপভাবে তারা যখনই (আল্লাহর পথে) কম বা বেশী কিছু সম্পদ ব্যয় করবে এবং (সংগ্রাম সাধনায়) যখনই কোন উপত্যকা অতিক্রম করবে, অমনি তা তাদের নামে লেখা হয়ে যাবে, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের এ ভাল কাজের পুরস্কার দান করেন।

আর মুমিনদের সবার এক সাথে বের হয়ে পড়ার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশের কিছু লোক বেরিয়ে এলে ভাল হতো। তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতো এবং ফিরে গিয়ে নিজের এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করতো, যাতে তারা (অমুসলমানী আচরণ থেকে) বিরত থাকতো, এমনটি হলো না কেন?[১২০]

কিন্তু এ কঠিন পরীক্ষায় ঐ তিনজন সাহাবী এ পথ অবলম্বন করেননি, যদিও এ পথটি তাদের জন্য খোলা ছিল। তারা বরঞ্চ আমাদের আলোচিত পূর্বোক্ত পথ অবলম্বন করেছিলেন। এ পথ অবলম্বন করে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর আনুগত্যের নীতি তাদের হৃদয় থেকে পূজা ও বন্দনা করার মতো সকল মূর্তি অপসারিত করেছে। নিজেদের সমগ্র ব্যক্তি সত্তাকে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম সাধনা করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছে। নিজেদের ফিরে যাবার নৌকাগুলোকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দিয়ে ইসলামী জামায়াতে প্রবেশ করেছিলেন যে, পেছনে ফিরে যেতে চাইলেও আর ফেরার কোন জায়গা ছিল না। এখানেই মার খাবেন এবং এখানেই মরবেন। অন্য কোথাও কোন বৃহত্তম সম্মান ও মর্যাদা লাভের নিশ্চয়তা পেলেও এখানকার লাঞ্ছনা ত্যাগ করে তা গ্রহণ করতে এগিয়ে যাবেন না। এরপর তাদেরকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে না ধরে আর কী করা যেতো? এ কারণেই আল্লাহ তাদের ক্ষমার কথা বলেছেন অত্যন্ত স্নেহমাখা ভাষায়। তিনি বলেছেন ঃ "আমি তাদের দিকে ফিরলাম যাতে তারা আমার দিকে ফিরে আসে।" এ কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে এমন একটি অবস্থার ছবি আঁকা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে, প্রভু আগে ঐ বান্দাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু যখন তারা পালিয়ে না গিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে তাঁরই দোরগোড়ায় বসে পড়লো তখন তাদের বিশ্বস্ততার চিত্র দেখে প্রভু নিজে আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রেমের আবেগে অধীর হয়ে তাকে দরজা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি নিজেই বের হয়ে এলেন।

১২০. এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার জন্য এ সূরার ৯৭ আয়াতটি সামনে রাখতে হবে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

"মরুচারী আরবরা কুফরী ও মুনাফিকীতে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যে দীন নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী।"

সেখানে শুধু এতটুকু বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, দারুল ইসলামের গ্রামীণ এলাকার বেশীরভাগ জনবসতি মুনাফিকী রোগে আক্রান্ত। কারণ এসব লোক অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে। জ্ঞানের কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ না থাকা এবং জ্ঞানবানদের সাহচর্য না পাওয়ার ফলে এরা আল্লাহর দীনের সীমারেখা জানে না। আর এখানে বলা হচ্ছে, গ্রামীন জনবসতিকে এ অবস্থায় থাকতে দেয়া যাবে না। বরং তাদের অজ্ঞতা দূর এবং তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করার জন্য এখন যথাযথ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এ জন্য গ্রামীণ এলাকার সমস্ত আরব অধিবাসীদের নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে মদীনায় জমায়েত হবার এবং এখানে বসে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন নেই। বরং এ জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, প্রত্যেক গ্রাম, পল্লী ও গোত্র থেকে কয়েকজন করে লোক বের হবে। তারা জ্ঞানের কেন্দ্রগুলো যেমন মদীনা ও মক্কা এবং এ ধরনের অন্যান্য জায়গায় আসবে। এখানে এসে তারা দীনের জ্ঞান আহরণ করবে। এখান থেকে তারা নিজেদের জনবসতিতে ফিরে যাবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দীনী চেতনা ও জাগরণ সৃষ্টিতে তৎপর হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। ইসলামী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও মজবুত করার জন্য সঠিক সময়ে এ নির্দেশটি দেয়া হয়েছিল। শুরুতে ইসলাম যখন আরবে ছিল একেবারেই নতুন এবং একটি চরম প্রতিকূল পরিবেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন এ ধরনের নির্দেশের প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখন যে ব্যক্তি ইসলামকে পুরোপুরি বুঝে নিতো এবং সব দিক দিয়ে তাকে যাচাই করে নিশ্চিন্ত হতে পারতো একমাত্র সে-ই ইসলাম গ্রহণ করতো। কিন্তু যখন এ আন্দোলন সাফল্যের পর্যায়ে প্রবেশ করলো এবং পৃথিবীতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো এবং এলাকার পর এলাকা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকলো। এ সময় খুব কম লোকই ইসলামের যাবতীয় চাহিদা ও দাবী অনুধাবন করে ভালভাবে জেনে বুঝে ইসলাম গ্রহণ করতো। বেশীর ভাগ লোকই নিছক অচেতনভাবে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে আসছিল। নতুন মুসলিম জনবসতির এ দ্রুত বিস্তার বাহ্যত ইসলামের শক্তিমত্তার কারণ ছিল। কেননা, ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের জনবসতি ইসলামী ব্যবস্থার কোন কাজে লাগছিল না বরং তার জন্য ক্ষতিকর ছিল। কারণ তাদের ইসলামী চেতনা ছিল না এবং এ ব্যবস্থার নৈতিক দাবী পূরণ করতেও তারা প্রস্তুত ছিল না। বস্তুত তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় এ ক্ষতি সুস্পষ্ট আকারে সামনে এসে গিয়েছিল। তাই সঠিক সময়ে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, ইসলামী আন্দোলনের বিস্তৃতির কাজ যে গতিতে চলছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাকে শক্তিশালী ও মজবুত করার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে ব্যবস্থাটি হচ্ছে, প্রত্যেক এলাকার লোকদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নিয়ে শিক্ষা ও অনুশীলন দান করতে হবে, তারপর তারা প্রত্যেকে নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও

অনুশীলনের দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে সমগ্র মুসলিম জনবসতিতে ইসলামের চেতনা ও আল্লাহর বিধানের সীমারেখা সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে পড়বে।

এ প্রসংগে এতটুকু কথা অবশ্যি অনুধাবন করতে হবে যে, এ আয়াতে যে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করার হুকুম দেয়া হয়েছে তার আসল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে নিছক সাক্ষরতা সম্পন্ন করা এবং তাদের মধ্যে বইপত্র পড়ার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি করা ছিল না। বরং লোকদের মধ্যে দীনের বোধ ও জ্ঞান সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে অমুসলিম সুলভ জীবনধারা থেকে রক্ষা করা, সতর্ক ও সজ্ঞান করে তোলা এর আসল উদ্দেশ্য হিসেবে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। এটিই মুসলমানদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ নিজেই চিরকালের জন্য এ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করতে হবে। দেখতে হবে এ উদ্দেশ্য সে কতটুকু পূরণ করতে সক্ষম। এর অর্থ এ নয় যে, ইসলাম লোকদেরকে লেখা–পড়া শেখাতে, বই পড়তে সক্ষম করে তুলতে ও পার্থিব জ্ঞান দান করতে চায় না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, ইসলাম লোকদের মধ্যে এমন শিক্ষা বিস্তার করতে চায় যা ওপরে বর্ণিত শিক্ষালাভের জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত আসল উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নয়তো প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার যুগের আইনষ্টাইন ও ফ্রয়েড হয়ে যায় কিন্তু দীনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা শূন্যের কোঠায় অবস্থান করে এবং অমুসলিম সুলভ জীবনধারায় বিভ্রান্ত হতে থাকে তাহলে ইসলাম এ ধরনের শিক্ষার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।

এ আয়াতে উল্লেখিত لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّيْنِ বাক্যাংশটির ফলে পরবর্তীকালে লোকদের মধ্যে আশ্চর্য ধরনের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা বরং তাদের ধর্মীয় জীবনধারার ওপরও এর বিষময় প্রভাব দীর্ঘকাল থেকে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ "তাফাক্কুহ্ ফিদ্ দীন" কে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিণত করেছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে ঃ দীন অনুধাবন করা বা বুঝা, দীনের ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা, তার প্রকৃতি ও প্রাণশক্তির সাথে পরিচিত হওয়া এবং এমন যোগ্যতার অধিকারী হওয়া যার ফলে চিন্তা ও কর্মের সকল দিক ও জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে কোন্ চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি ইসলামের প্রাণশক্তির অনুসারী তা মানুষ জানতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে যে আইন সম্পর্কিত জ্ঞান পারিভাষিক অর্থে ফিক্‌হ নামে পরিচিত হয় এবং যা ধীরে ধীরে ইসলামী জীবনের নিছক বাহ্যিক কাঠামোর (প্রাণশক্তির মোকাবিলায়) বিস্তারিত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, লোকেরা শাব্দিক অভিন্নতার কারণে তাকেই আল্লাহর নির্দেশ-অনুযায়ী শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ মনে করে বসেছে। অথচ সেটিই সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ নয়। বরং তা ছিল উদ্দেশ্য ও লক্ষের একটি অংশ মাত্র। এ বিরাট ভুল ধারণার ফলে দীন ও তার অনুসারীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করতে হলে একটি বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আমরা এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্য সংক্ষেপে শুধুমাত্র এতটুকু ইংগিত করছি যে, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাকে যে জিনিসটি দীনী প্রাণশক্তি বিহীন করে নিছক দীনী কাঠামো ও দীনী আকৃতির ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং অবশেষে যার বদৌলতে মুসলমানদের জীবনে একটি নিছক প্রাণহীন বাহ্যিকতা দীনদারীর শেষ মনযিলে পরিণত হয়েছে তা বহুলাংশে এ ভুল ধারণারই ফল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

১৬ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ। সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো।[১২১] *তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়।*[১২২] *জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।*[১২৩] *যখন কোন নতুন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের কেউ কেউ (ঠাট্টা করে মুসলমানদের) জিজ্ঞেস করে, "বলো, এর ফলে তোমাদের কার ঈমান বেড়ে গেছে?" (এর জবাব হচ্ছে) যারা ঈমান এনেছে (প্রত্যেকটি অবতীর্ণ সূরা) যথার্থই তাদের ঈমান বাড়িয়েই দিয়েছে এবং তারা এর ফলে আনন্দিত।*

১২১. মূল আয়াতে যে শব্দ সংযোজিত হয়েছে তার বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, দারুল ইসলামের যে অংশ ইসলামের শত্রুদের এলাকার যে অংশের সাথে মিশে আছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রাথমিক দায়িত্ব ঐ অংশের মুসলমানদের ওপর আরোপিত। কিন্তু পরে যা বলা হয়েছে তার সাথে—এ আয়াতটিকে মিলিয়ে পড়লে জানা যাবে, এখানে কাফের বলতে এমন সব মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে যাদের সত্য অস্বীকার করার বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে গিয়েছিল এবং যাদের ইসলামী সমাজের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে থাকার কারণে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছিল। ১০ রুকূর শুরুতেও এ ভাষণটি আরম্ভ করার সময় প্রথম কথার সূচনা এভাবেই করা হয়েছিল ঃ এবার এ ঘরের শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য যথারীতি জিহাদ শুরু করে দিতে হবে। এখানে ভাষণ শেষ করার সময় তাকীদ সহকারে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করবে। যে আত্মীয়তা এবং বংশগত ও সামাজিক সম্পর্কের কারণে তারা মুনাফিকদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে ছিল এরপর আর তারা তাদের সাথে ঐ সম্পর্কের পরোয়া করবে না। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর এখানে তার চেয়ে কড়া "কিতাল" শব্দ (সশস্ত্র যুদ্ধ করে হত্যা করা) ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, তাদেরকে পুরোপুরি উৎখাত করে দাও, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে। সেখানে "কাফের" ও "মুনাফিক" দু'টো আলাদা শব্দ বলা হয়েছিল। আর এখানে শুধুমাত্র "কাফের" শব্দের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। কারণ তাদের সত্য অস্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٢٥﴾ اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾ وَاِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٢٧﴾

তবে যাদের অন্তরে (মুনাফিকী) রোগ বাসা বেঁধেছিল তাদের পূর্ব কলুষতার ওপর (প্রত্যেকটি নতুন সূরা) আরো একটি কলুষতা বাড়িয়ে দিয়েছে[১২৪] এবং তারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে। এরা কি দেখে না, প্রতি বছর এদেরকে দু'একটি পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়?[১২৫] কিন্তু এরপরও এরা তাওবাও করে না কোন শিক্ষাও গ্রহণ করে না। যখন কোন সূরা নাযিল হয়, এরা চোখের ইশারায় একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের কেউ দেখতে পায়নি তো?" তারপর চুপেচুপে সরে পড়ে।[১২৬] আল্লাহ তাদের মন বিমুখ করে দিয়েছেন কারণ তারা এমন একদল লোক যাদের বোধশক্তি নেই।[১২৭]

কাজেই ঈমানের বাহ্যিক স্বীকৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করে তা যে কোন প্রকার সুবিধা আদায় করতে না পারে একথাটি ব্যক্ত করাই এর উদ্দেশ্য।

১২২. অর্থাৎ এ পর্যন্ত তাদের সাথে যে নরম ব্যবহার করা হয়েছে তার এখন পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। দশ রুকূ'র শুরুতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে واغلظ عليهم তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করো।

১২৩. এ সতর্ক বাণীর দু'টি অর্থ হয়। দু'টো অর্থই এখানে সমানভাবে প্রযোজ্য। এক, এ সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে যদি তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরোয়া করো তাহলে এটা হবে তাকওয়া বিরোধী। কারণ মুত্তাকী হওয়া এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে মানসিক সম্পর্ক রাখা—এ দু'টো বিষয় পরস্পর বিরোধী। কাজেই আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে এ ধরনের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে হবে। দুই, এ কঠোরতা ও যুদ্ধ করার যে হুকুম দেয়া হচ্ছে এর অর্থ এ নয় যে, তাদের প্রতি কঠোর হবার ব্যাপারে নৈতিকতা ও মানবিকতার সমস্ত সীমারেখা ভেংগে ফেলতে হবে। সমস্ত কাজে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা অটুট রাখার দায়িত্ব অবশ্যি মানুষের ওপর বর্তায়। মানুষ যদি তা পরিত্যাগ করে তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহও তাকে পরিত্যাগ করবে।

১২৪. ঈমান, কুফরী ও মুনাফিকীর মধ্যে কম–বেশী হওয়ার অর্থ কি? এর আলোচনা দেখুন সূরা আনফালের ২ টীকায়।

১২৫. অর্থাৎ এমন কোন বছর অতিবাহিত হয় না যখন তাদের ঈমানের দাবী এক–দু'বার পরীক্ষার সম্মুখীন হয় না এবং এভাবে তার অন্তসারশূণ্যতা প্রকাশ হয়ে যায় না। কখনো কুরআনে এমন কোন হুকুম আসে যার মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির আশা–আকাংখার ওপর কোন নতুন বিধি–নিষেধ আরোপ করা হয়। কখনো দীনের এমন কোন দাবী সামনে এসে যায় যার ফলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। কখনো এমন কোন আভ্যন্তরীণ সংকট সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে তারা নিজেদের পার্থিব সম্পর্ক এবং নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও গোত্রীয় স্বার্থের মোকাবিলায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দীনকে কি পরিমাণ ভালবাসে তার পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য হয়। কখনো এমন কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার মাধ্যমে তারা যে দীনের ওপর ঈমান আনার দাবী করছে তার জন্য ধন, প্রাণ, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে তারা কতটুকু আগ্রহী তার পরীক্ষা হয়ে যায়। এ ধরনের সকল অবস্থায় কেবল তাদের মিথ্যা অংগীকারের মধ্যে যে মুনাফিকীর আবর্জনা চাপা পড়ে আছে তা শুধু উন্মুক্ত হয়ে সামনে চলে আসে না বরং যখন তারা ঈমানের দাবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পালাতে থাকে তখন তাদের ভেতরের ময়লা আবর্জনা আগের চাইতে আরো বেশী বেড়ে যায়।

১২৬. নিয়ম ছিল, কোন সূরা নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সম্মেলন আহবান করতেন তারপর সাধারণ সভায় ভাষণের আকারে সূরাটি পড়ে শুনাতেন। এ ধরনের মাহফিলে ঈমানদাররা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে ভাষণ শুনতেন এবং তার মধ্যে ডুবে যেতেন। কিন্তু মুনাফিকদের ওপর এর ভিন্নতর প্রভাব পড়তো। হাযির হওয়ার হুকুম ছিল বলে তারা হাযির হয়ে যেতো। তাছাড়া মাহফিলে শরীক না হলে তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে যাবে, একথা মনে করেও তারা সম্মেলনে হাযির হতো। কিন্তু এ ভাষণের ব্যাপারে তাদের মনে কোন আগ্রহ জাগতো না। অত্যন্ত অনীহা ও বিরক্তি সহকারে তারা সেখানে বসে থাকতো। নিজেদের উপস্থিতি গণ্য করাবার পর তাদের চিন্তা হতো, কিভাবে দ্রুত এখান থেকে পালাবে। তাদের এ অবস্থার চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে।

১২৭. অর্থাৎ এ নির্বোধরা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থ বুঝে না। নিজেদের কল্যাণের ব্যাপারে তারা গাফেল এবং নিজেদের ভালর কথা চিন্তা করে না। তারা যে এ কুরআন ও এ পয়গম্বরের মাধ্যমে কত বড় নিয়ামত লাভ করেছে তার কোন অনুভূতিই তাদের নেই। নিজেদের সংকীর্ণ জগত এবং এর নিতান্ত নিম্ন পর্যায়ের কার্যকলাপের মধ্যে তা'রা কুয়ার ব্যাঙের মতো ডুবে আছে। যার ফলে যে মহা জ্ঞান ও অতি উন্নত পর্যায়ের পথনির্দেশনার বদৌলতে তারা আরবের এ মরু প্রান্তরের সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ত থেকে বের হয়ে সমগ্র বিশ্ব মানবতার নেতা ও সর্বাধিনায়কে পরিণত হতে পারে এবং শুধুমাত্র এ নশ্বর দুনিয়াতেই নয় বরং পরবর্তী অনন্তকালীণ অবিনশ্বর জীবনেও চিরন্তন সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়, সেই জ্ঞান ও শিক্ষার মূল্য ও মর্যাদা তারা বুঝতে পারে না। এ অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে আল্লাহ লাভবান হবার সুযোগ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। যখন কল্যাণ ও সাফল্য এবং শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের এ সম্পদ বিনামূল্যে বিতরণ করা

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

দেখো, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল। তোমাদের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। মুমিনদের প্রতি সে স্নেহশীল ও করুণাসিক্ত।—এখন যদি তারা তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করেছি এবং তিনি মহা–আরশের অধিপতি।"

হয়ে থাকে এবং সৌভাগ্যবানরা দু'হাতে তা লুটতে থাকে তখন এ দুর্ভাগাদের মন অন্য কোন দিকে বাঁধা পড়ে এবং এ অবসরে কত বড় মহামূল্যবান সম্পদ থেকে যে তারা বঞ্চিত হয়ে গেছে তা তারা ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারে না।

ইউনুস

১০

নামকরণ

যথারীতি ৯৮ আয়াত থেকে নিছক আলামত হিসেবে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ আয়াতে প্রসংগক্রমে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কথা এসেছে কিন্তু মূলত এ সূরার আলোচ্য বিষয় হযরত ইউনুসের কাহিনী নয়।

নাযিল হওয়ার স্থান

এ গোটা সূরাটি মক্কা মুয়াযযামায় নাযিল হয়। হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত। সূরার বিষয়বস্তুও এ বক্তব্য সমর্থন করে। কেউ কেউ মনে করেন এর কিছু আয়াত মাদানী যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটা শুধুমাত্র একটা হাওয়াই অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। বক্তব্যের ধারাবাহিক উপস্থাপনা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এগুলো একাধিক ভাষণ বা বিভিন্ন সময় নাযিলকৃত বিভিন্ন আয়াতের সমষ্টি নয়। বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা একটা সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ ভাষণ। এটা সম্ভবত এক সাথে নাযিল হয়ে থাকবে এবং এর বক্তব্য বিষয় একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটা মক্কী যুগের সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

এ সূরাটি কখন নাযিল হয়, এ সম্পর্কিত কোন হাদীস আমরা পাইনি। কিন্তু এর বক্তব্য বিষয় থেকে বুঝা যায়, এ সূরাটি রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কায় অবস্থানের শেষের দিকে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ, এর বক্তব্য বিষয় থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সময় ইসলামী দাওয়াতের বিরোধীদের পক্ষ থেকে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজ প্রচণ্ডভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে আর বরদাশত করতে রাযী নয়। উপদেশ–অনুরোধের মাধ্যমে তারা সঠিক পথে চলবে, এমন আশা করা যায় না। নবীকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদের যে অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার কথা। এখন তা থেকে তাদের সতর্ক করে দেয়ার সময় এসে গেছে। কোন্ ধরনের সূরা মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে বক্তব্য বিষয়ের এ বৈশিষ্টই তা আমাদের জানিয়ে দেয়। কিন্তু এ সূরায় হিজরতের প্রতি কোন ইংগিত পাওয়া যায় না। তাই যেসব সূরা থেকে আমরা হিজরতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন না কোন ইংগিত পাই এ সূরাটির যুগ সেগুলো থেকে আগের মনে করতে হবে। এ সময়–কাল চিহ্নিত করার পর ঐতিহাসিক

পটভূমি বর্ণনা করার প্রয়োজন থাকে না। কারণ, সূরা আনআম ও সূরা আরাফের ভূমিকায় এ যুগের ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

এ ভাষণের বিষয়বস্তু হচ্ছে, দাওয়াত দেয়া, বুঝানো ও সতর্ক করা। ভাষণের শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

একজন মানুষ নবুওয়াতের বাণী প্রচার করছে। তা দেখে লোকেরা অবাক হচ্ছে। তারা অযথা তার বিরুদ্ধে যাদুকরিতার অভিযোগ আনছে। অথচ যেসব কথা সে পেশ করছে তার মধ্যে আজব কিছুই নেই এবং যাদু ও জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোন বিষয়ও তাতে নেই। সে তো দু'টো গুরুত্বপূর্ণ সত্য তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। এক, যে আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এবং যিনি কার্যত এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন একমাত্র তিনিই তোমাদের মালিক ও প্রভূ এবং একমাত্র তিনিই তোমাদের বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের অধিকার রাখেন। দুই, বর্তমান পার্থিব জীবনের পরে আর একটি জীবন আসবে। সেখানে তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা হবে। সেখানে তোমরা নিজেদের বর্তমান জীবনের যাবতীয় কাজের হিসেব দেবে। একটি মৌলিক প্রশ্নের ভিত্তিতে তোমরা শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে নিজেদের প্রভূ মেনে নিয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সৎকাজ করেছো, না তার বিপরীত কাজ করেছ? তিনি তোমাদের সামনে এই যে সত্য দু'টি পেশ করছেন এ দু'টি যথার্থ ও অকাট্য বাস্তব সত্য। তোমাদের মানা নামানায় এর কিছু আসে যায় না। এ সত্য তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছে যে, একে মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী তোমরা নিজেদের জীবন গড়ে তোল। তার এ আহবানে সাড়া দিলে তোমাদের পরিণাম ভাল হবে। অন্যথায় দেখবে নিজেদের অশুভ পরিণতি।

আলোচনার বিষয়াদি

এ প্রাথমিক আলোচনার পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একটি বিশেষ ধারাবাহিকতা সহকারে সামনে আসে ঃ

এক ঃ যারা অন্ধ বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীতে লিপ্ত হয় না এবং আলোচনায় হারজিতের পরিবর্তে নিজেরা ভুল দেখা ও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাঁচার চিন্তা করে তাদের বুদ্ধি-বিবেককে আল্লাহর একত্ব ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার মতো যুক্তি প্রমাণাদি।

দুই ঃ লোকদের তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদা স্বীকার করে নেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যেসব বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল সেগুলো দূর করা এবং যেসব গাফলতি সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

তিন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত এবং তিনি যে বাণী এনেছিলেন সেসব সম্পর্কে যে সন্দেহ ও আপত্তি পেশ করা হতো, তার যথাযথ জবাব দান।

চার ঃ পরবর্তী জীবনে যা কিছু ঘটবে সেগুলো আগেভাগেই জানিয়ে দেয়া, যাতে মানুষ সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে নিজের কার্যকলাপ সংশোধন করে নেয় এবং পরে আর তাকে সে জন্য আফসোস করতে না হয়।

পাঁচ ঃ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া যে, এ দুনিয়ার বর্তমান জীবন আসলে একটি পরীক্ষার জীবন। এ পরীক্ষার জন্য তোমাদের যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র ততটুকুই যতটুকু সময় তোমরা এ দুনিয়ায় শ্বাস–প্রশ্বাস নিচ্ছ। এ সময়টুকু যদি তোমরা নষ্ট করে দাও এবং নবীর হেদায়াত গ্রহণ করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভের ব্যবস্থা না করো, তাহলে তোমরা আর দ্বিতীয় কোন সুযোগ পাবে না। এ নবীর আগমন এবং এ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে সত্য জ্ঞান পৌঁছে যাওয়া তোমাদের পাওয়া একমাত্র ও সর্বোত্তম সুযোগ। একে কাজে লাগাতে না পারলে পরবর্তী জীবনে তোমাদের চিরকাল পস্তাতে হবে।

ছয় ঃ এমন সব সুস্পষ্ট অজ্ঞতা, মূর্খতা ও বিভ্রান্তি চিহ্নিত করা, যা শুধুমাত্র আল্লাহর হেদায়াত ছাড়া জীবন যাপন করার কারণেই লোকদের জীবনে সৃষ্টি হচ্ছিল।

এ প্রসঙ্গে নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে এবং মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চারটি কথা অনুধাবন করানোই এ ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্য।

প্রথমত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তোমরা যে ব্যবহার করছো তা নূহ (আ) ও মূসার (আ) সাথে তোমাদের পূর্ববর্তীরা যে ব্যবহার করেছে অবিকল তার মতই। আর নিশ্চিত থাকো যে, এ ধরনের কার্যকলাপের যে পরিণতি তারা ভোগ করেছে তোমরাও সেই একই পরিণতির সম্মুখীন হবে। দ্বিতীয়ত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে আজ তোমরা যে অসহায়ত্ব ও দুর্বল অবস্থার মধ্যে দেখছো তা থেকে একথা মনে করে নিয়ো না যে, অবস্থা চিরকাল এ রকমই থাকবে। তোমরা জানো না, যে আল্লাহ মূসা ও হারুণের পেছনে ছিলেন এদের পেছনেও তিনিই আছেন। আর তিনি এমনভাবে গোটা পরিস্থিতি পাল্টে দেন যা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। তৃতীয়ত, নিজেদের শুধরে নেয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের যে অবকাশ দিচ্ছেন তা যদি তোমরা নষ্ট করে দাও এবং তারপর ফেরাউনের মতো আল্লাহর হাতে পাকড়াও হবার পর একেবারে শেষ মুহূর্তে তাওবা করো, তাহলে তোমাদের মাফ করা হবে না। চতুর্থত, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছিল তারা যেন প্রতিকূল পরিবেশের চরম কঠোরতা ও তার মোকাবিলায় নিজেদের অসহায়ত্ব দেখে হতাশ হয়ে না পড়ে। তাদের জানা উচিত, এ অবস্থায় তাদের কিভাবে কাজ করতে হবে। তাদের এ ব্যাপারেও সতর্ক হতে হবে যে, আল্লাহ যখন নিজের মেহেরবানীতে তাদেরকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন তখন যেন তারা বনী ইসরাঈল মিসর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যে আচরণ করেছিল তেমন আচরণ না করে।

সবশেষে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ এ আকীদা–বিশ্বাস অনুযায়ী এবং এ পথ ও নীতির ভিত্তিতে এগিয়ে চলার জন্য আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে সামান্যতমও কাটছাঁট করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তি এটা গ্রহণ করবে সে নিজের ভাল করবে এবং যে একে বর্জন করে ভুল পথে পা বাড়াবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا
اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ
مُّبِيْنٌ ﴿٢﴾ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ
سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ
بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾

আলিফ–লাম–রা। এগুলো এমন একটি কিতাবের আয়াত যা হিকমত ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ।[১]

মানুষের জন্য এটা কি একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে গেছে যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে নির্দেশ দিয়েছি, (গাফিলতিতে ডুবে থাকা) লোকদেরকে সজাগ করে দাও এবং যারা মেনে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা?[২] *(একথার ভিত্তিতেই কি) অস্বীকারকারীরা বলেছে, এ ব্যক্তি তো একজন সুস্পষ্ট যাদুকর?*[৩]

আসলে তোমাদের রব সেই আল্লাহই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছ'দিনে, তারপর শাসন কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্টিত হয়েছেন এবং বিশ্ব–জগতের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন।[৪] *কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) এমন নেই, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করতে পারে।*[৫] *এ আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রব। কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো।*[৬] *এরপরও কি তোমাদের চৈতন্য হবে না?*[৭]

১. এ প্রারম্ভিক বাক্যে একটি সূক্ষ্ম সতর্কবাণী রয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা মনে করছিল, নবী কুরআনের নামে যে বাণী শুনাচ্ছেন তা নিছক ভাষার তেলেসমাতী, কবিসুলভ অবাস্তব কল্পনা এবং গণক ও জ্যোতিষীদের মতো উর্ধজগৎ সম্পর্কিত কিছু আলোচনার সমষ্টি মাত্র। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমাদের ধারণা ঠিক নয়। এগুলো তো জ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। এর প্রতি মনোযোগী না হলে তোমরা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

২. অর্থাৎ এতে অবাক হবার কি আছে? মানুষকে সতর্ক করার জন্য মানুষ নিযুক্ত না করে কি জিন, ফেরেশতা বা পশু নিযুক্ত করা হবে? আর মানুষ যদি সত্য থেকে গাফেল হয়ে ভুল পথে জীবন যাপন করে তাহলে তাদের স্রষ্টা ও প্রভু তাদেরকে নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন অথবা তিনি তাদের হেদায়াত ও পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থা করবেন, এর মধ্যে কোন্‌টা বিস্ময়কর? আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত আসে তাহলে যারা তা মেনে নেবে তাদের মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হওয়া উচিত, না যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের? কাজেই যারা অবাক হচ্ছে তাদের চিন্তা করা উচিত, কি জন্য তারা অবাক হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ তারা তাঁকে যাদুকর বলে দোষারোপ করলো কিন্তু এ দোষ তাঁর ওপর আরোপিত হয় কিনা একথা চিন্তা করলো না। কোন ব্যক্তি উন্নত মানের বক্তৃতা ও ভাষণ দানের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ক জয় করে ফেললেই সে যাদুকরের কাজ করছে এ কথা বলা চলে না। দেখতে হবে এ বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সে কি বলছে? কি উদ্দেশ্যে তার বাগ্মীতার শক্তি ব্যবহার করছে? এ বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে ঈমানদারদের জীবনে কোন্ ধরনের প্রভাব পড়ছে? যে বক্তা কোন অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তার বাগ্মীতার অসাধারণ শক্তি ব্যবহার করে সে তো একজন নির্লজ্জ, নিয়ন্ত্রণহীন ও দায়িত্বহীন বক্তা। সত্য, ইনসাফ ও ন্যায়নীতিমুক্ত হয়ে সে এমন সব কথা বলে দেয়, যার প্রত্যেকটি কথা শ্রোতাদের প্রভাবিত করে, তা যতই মিথ্যা অতিরঞ্জিত ও অন্যায় হোক না কেন। তার কথায় বিজ্ঞতার পরিবর্তে থাকে জনতাকে প্রতারণা করার ফন্দী। কোন সুশৃংখল ও সমন্বিত চিন্তাধারার পরিবর্তে সেখানে থাকে স্ববিরোধিতা ও অসামঞ্জস্য। ভারসাম্যের পরিবর্তে থাকে অসমতা। সে নিছক নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বড় বড় বুলি আওড়ায় অথবা বাগ্মীতার মদে মত্ত করে পরস্পরকে লড়াবার এবং এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার জন্য উস্কানি দেয়। লোকদের ওপর এর যে প্রভাব পড়ে তার ফলে তাদের কোন নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় না এবং তাদের জীবনে কোন শুভ পরিবর্তনও দেখা দেয় না। অথবা কোন সৎচিন্তা কিংবা সৎকর্মময় পরিবেশ জন্ম লাভ করে না। বরং লোকেরা আগের চাইতেও খারাপ চরিত্রের প্রদর্শনী করতে থাকে। অথচ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছো, নবী যে কালাম পেশ করছেন তার মধ্যে রয়েছে সুগভীর তত্ত্বজ্ঞান, একটি উপযোগী ও সমন্বিত চিন্তা ব্যবস্থা, সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমতা ও ভারসাম্য, সত্য ও ন্যায়নীতির কঠোর ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি শব্দ মাপাজোকা এবং প্রতিটি বাক্য পাল্লায় ওজন করা। তাঁর বক্তৃতায় মানুষের সংশোধন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা যেতে পারে না। তিনি যা কিছু বলে থাকেন তার মধ্যে তাঁর নিজের, পরিবারের, জাতির বা কোন প্রকার দুনিয়াবী স্বার্থের কোন গন্ধই পাওয়া যায় না। লোকেরা যে গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে তিনি শুধু তাদেরকে তার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন এবং যে পথে

তাদের নিজেদের কল্যাণ সে দিকে তাদেরকে আহবান জানান। তারপর তার বক্তৃতার যে প্রভাব পড়ে তাও যাদুকরদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এখানে যে ব্যক্তিই তার প্রভাব গ্রহণ করেছে তার জীবনই সুন্দর ও সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। সে আগের তুলনায় উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়েছে। তার সকল কাজে কল্যাণ ও সৎবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, সত্যিই কি যাদুকর এমন কথা বলে এবং তার যাদুর ফলাফল কি এমনটিই হয়?

৪. অর্থাৎ সৃষ্টি করার পরে তিনি নিষ্ক্রীয় হয়ে যাননি। বরং নিজের সৃষ্ট বিশ্ব–জাহানের শাসন কর্তৃত্বের আসনে নিজেই সমাসীন হয়েছেন এবং এখন সমগ্র জগতের ব্যবস্থাপনা কার্যত তিনিই পরিচালনা করছেন। অবুঝ লোকেরা মনে করে, আল্লাহ বিশ্ব–জাহান সৃষ্টি করে তারপর একে এমনিই ছেড়ে দিয়েছেন। যে যেভাবে চায় চলতে পারে। অথবা একে অন্যদের হাওয়ালা করে দিয়েছেন। তারা যেভাবে চায় একে চালাতে ও ব্যবহার করতে পারে। এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কুরআন যে সত্য পেশ করে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর এ সৃষ্টিজগতের সমগ্র এলাকায় নিজেই শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানকার সমগ্র ক্ষমতার তিনিই একচ্ছত্র মালিক। সমগ্র কর্তৃত্ব তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশ্ব–জাহানের বিভিন্ন স্থানে প্রতি মুহূর্তে যা কিছু হচ্ছে তা সরাসরি তাঁর হুকুম বা অনুমতিক্রমে হচ্ছে। এ সৃষ্টি জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক শুধু এতটুকুই নয় যে, তিনি এক সময় একে সৃজন করেছিলেন বরং তিনিই সর্বক্ষণ এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক, একে তিনিই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন বলেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তিনি চালাচ্ছেন বলেই চলছে। (দেখুন সূরা আ'রাফ, ৪০ ও ৪১ টীকা)।

৫. অর্থাৎ দুনিয়ার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অন্য কারোর হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা, কারোর আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাঁর কোন ফায়সালা পরিবর্তন করার অথবা কারোর ভাগ্য ভাঙা গড়ার ইখতিয়ারও নেই। বড়জোর সে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে। কিন্তু তার দোয়া কবুল হওয়া না হওয়া পুরাপুরি আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর এ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার রাজ্যে নিজের কথা নিশ্চিতভাবে কার্যকর করিয়ে নেবার মতো শক্তিধর কেউ নেই। এমন শক্তি কারোর নেই যে, তার সুপারিশকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে এবং আল্লাহর আরশের পা জড়িয়ে ধরে বসে থেকে নিজের দাবী আদায় করে নিতে পারে।

৬. ওপরের তিনটি বাক্যে প্রকৃত সত্য বর্ণনা করা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব। এখন বলা হচ্ছে, এ প্রকৃত সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কোন্ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। মূলত রবুবীয়াত তথা বিশ্ব–জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতা, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব যখন পুরাপুরি আল্লাহর আয়ত্বাধীন তখন এর অনিবার্য দাবী স্বরূপ মানুষকে তাঁরই বন্দেগী করতে হবে। তারপর রবুবীয়াত শব্দটির যেমন তিনটি অর্থ হয় অর্থাৎ প্রতিপালন ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও শাসন ক্ষমতা ঠিক তেমনি–এর পাশাপাশি ইবাদাত শব্দেরও তিনটি অর্থ হয় অর্থাৎ পূজা, দাসত্ব ও আনুগত্য।

আল্লাহর একমাত্র রব হওয়ার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তাঁরই কাছে প্রার্থনা করবে এবং তাঁরই সামনে ভক্তি–শ্রদ্ধা-ভালবাসায় মাথা নোয়াবে। এটি হচ্ছে ইবাদাতের প্রাথমিক অর্থ।

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ④ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑥

তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।[৮] এটা আল্লাহর পাকাপোক্ত ওয়াদা। নিসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন তারপর তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন,[৯] যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে প্রতিদান দেয়া যায় এবং যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তারা পান করে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিজেদের সত্য অস্বীকৃতির প্রতিফল হিসেবে।[১০]

তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিশালী ও চন্দ্রকে আলোকময়, এবং তার মনযিলও ঠিকমত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তার সাহায্যে বছর গণনা ও তারিখ হিসেব করতে পারো। আল্লাহ এসব কিছু (খেলাচ্ছলে নয় বরং) উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে পেশ করছেন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্য। অবশ্য দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা (ভুল দেখা ও ভুল আচরণ করা থেকে) আত্মরক্ষা করতে চায়।[১১]

আল্লাহর একমাত্র মালিক ও প্রভু হওয়ার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁর বান্দা ও দাস হয়ে থাকবে, তাঁর মোকাবিলায় স্বেচ্ছাচারী নীতি অবলম্বন করবে না এবং তাঁর ছাড়া আর কারোর মানসিক বা কর্মগত দাসত্ব করবে না। এটি ইবাদাতের দ্বিতীয় অর্থ।

আল্লাহকে একমাত্র শাসনকর্তা বলে মেনে নেবার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁর হুকুমের আনুগত্য করবে ও তাঁর আইন মেনে চলবে। মানুষ নিজেই নিজের শাসক

হবে না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারোর শাসন কর্তৃত্ব স্বীকার করবে না। এটি ইবাদাতের তৃতীয় অর্থ।

৭. অর্থাৎ যখন এ সত্য তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তখন এরপরও কি তোমাদের চোখ খুলবে না এবং তোমরা এমন বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে থাকবে যার ফলে তোমাদের জীবনের সমগ্র দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি সত্যবিরোধী পথে পরিচালিত হয়েছে?

৮. এটি নবীর শিক্ষার দ্বিতীয় মূলনীতি। প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের রব কাজেই তাঁরই ইবাদাত করো। আর দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে, তোমাদের এ দুনিয়া থেকে ফিরে গিয়ে নিজেদের রবের কাছে হিসেব দিতে হবে।

৯. এ বাক্যটির মধ্যে দাবী ও প্রমাণ উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। দাবী হচ্ছে, আল্লাহ পুনর্বার মানুষকে সৃষ্টি করবেন। এর প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে, তিনিই প্রথমবার মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর যে ব্যক্তি একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অবশ্যি শুধুমাত্র পাদরীদের প্রচারিত ধর্ম থেকে দূরে অবস্থান করার লক্ষে স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টির মতে নির্বোধ জনোচিত মতবাদ পোষণ করতে উদ্যোগী কিছু নাস্তিক ছাড়া আর কে এটা অস্বীকার করতে পারে! সে কখনো আল্লাহর পক্ষে এ সৃষ্টির পুনরাবৃত্তিকে অসম্ভব বা দুর্বোধ্য মনে করতে পারে না।

১০. এ প্রয়োজনটির ভিত্তিতেই আল্লাহ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। একই জিনিসের পুনঃসৃজন সম্ভব এবং তাকে দুরধিগম্য মনে করার কোন কারণ নেই, একথা প্রমাণ করার জন্য ওপরে বর্ণিত যুক্তি যথেষ্ট ছিল।

এখন এখানে বলা হচ্ছে, সৃষ্টির এ পুনরাবর্তন বুদ্ধি ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে অপরিহার্য। আর এ অপরিহার্য প্রয়োজন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন পথেই পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহকে নিজের একমাত্র রব হিসেবে মেনে নিয়ে যারা সঠিক বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করবে তারা নিজেদের এ যথার্থ কার্যধারার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করার অধিকার রাখে। অন্যদিকে যারা সত্য অস্বীকার করে তার বিরোধী অবস্থানে জীবন যাপন করবে তারাও নিজেদের এ ভ্রান্ত কার্যধারার কুফল প্রত্যক্ষ করবে। এ প্রয়োজন যদি বর্তমান পার্থিব জীবনে পূর্ণ না হয় (এবং যারা হঠকারী নন তারা প্রত্যেকেই জানেন, এ প্রয়োজন পূর্ণ হচ্ছে না) তাহলে অবশ্যি এটা পূর্ণ করার জন্য পুনরুজ্জীবন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। (আরো বেশী জানার জন্য সূরা আ'রাফ ৩০ টীকা ও সূরা হূদ ১০৫ টীকা দেখুন)।

১১. এটি আখেরাত বিশ্বাসের পক্ষে তৃতীয় যুক্তি। এ বিশ্ব-জাহানের চারদিকে মহান আল্লাহর যেসব কীর্তি দেখা যাচ্ছে, যার বড় বড় নিদর্শন সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাত্রির আবর্তনের আকারে মানুষের সামনে রয়েছে, এগুলো থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন একটা ছোট্ট শিশু এ সৃষ্টি জগতের বিশাল কারখানার স্রষ্টা নয়। সে কোন শিশুর মত নিছক খেলা করার জন্য এসব কিছু তৈরী করেনি আবার খেলা করে মন ভরে যাওয়ার পর এসব কিছু ভেঙে চুরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তাঁর সব কাজে রয়েছে শৃঙ্খলা, বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য ও কলা কৌশল। প্রতিটি অণুপরমাণু সৃষ্টির

পেছনে পাওয়া যায় একটি লক্ষ্যাভিসারী উদ্যোগ। কাজেই তিনি যখন মহাজ্ঞানী এবং তাঁর জ্ঞানের লক্ষণ ও আলামতগুলো তোমাদের সামনে প্রকাশ্যে মওজুদ রয়েছে, তখন তোমরা তাঁর থেকে কেমন করে আশা করতে পারো যে, তিনি মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক অনুভূতি এবং স্বাধীন দায়িত্ব ও এসব কিছু ব্যবহারের ক্ষমতা দান করার পর তার জীবনের কার্যক্রম হিসেব কখনো নেবেন না এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক দায়িত্বের কারণে পুরস্কার ও শাস্তি লাভের যে যোগ্যতা অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়ে যায় তাকে অনর্থক এমনিই ছেড়ে দেবেন?

অনুরূপভাবে এ আয়াতগুলোতে আখেরাত বিশ্বাস পেশ করার সাথে সাথে তার স্বপক্ষে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা সহকারে তিনটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে ঃ

এক ঃ দ্বিতীয় জীবন অর্থাৎ পরকালীন জীবন সম্ভব। কারণ, প্রথম অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের সম্ভাবনা জাজ্বল্যমান ঘটনার আকারে বিরাজমান।

দুই ঃ পরকালীন জীবনের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, বর্তমান জীবনে মানুষ নিজের নৈতিক দায়িত্ব সঠিক বা বেঠিক যেভাবে পালন করে এবং তা থেকে পুরস্কার ও শাস্তিলাভের যে অবশ্যম্ভাবী যোগ্যতা সৃষ্টি হয় তার ভিত্তিতে বুদ্ধি ও ইনসাফ আর একটি জীবনের দাবী করে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নৈতিক কার্যক্রমের উপযুক্ত ফল প্রত্যক্ষ করবে।

তিন ঃ বুদ্ধি ও ইনসাফের দৃষ্টিতে যখন পরকালীন জীবনের প্রয়োজন তখন এ প্রয়োজন অবশ্যি পূর্ণ করা হবে। কারণ, মানুষ ও বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা হচ্ছেন মহাজ্ঞানী। আর মহাজ্ঞানীর কাছে আশা করা যেতে পারে না যে, জ্ঞান ও ইনসাফ যা দাবী করে তিনি তা কার্যকর করবেন না।

গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে, মৃত্যুর পরের জীবনকে যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে হলে, এ তিনটি যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনই সম্ভব এবং এ ক্ষেত্রে এগুলো যথেষ্টও। এ যুক্তি-প্রমাণগুলোর পরে যদি আর কিছু অপূর্ণতা থেকে যায় তাহলে তা হচ্ছে মানুষকে চর্ম চোখে দেখিয়ে দেয়া যে, যে জিনিসটি সম্ভব, যার অস্তিত্বশীল হওয়ার প্রয়োজনও আছে এবং যাকে অস্তিত্বশীল করা আল্লাহর জ্ঞানের দাবীও, তাকে মানুষের চোখের সামনে হাযির করে দিতে হবে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়াবী জীবনে এ শূন্যতা পূর্ণ করা হবে না। কারণ, চোখে দেখে ঈমান আনার কোন অর্থই হয় না। মহান আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নিতে চান। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের উর্ধে উঠে নিছক চিন্তা-ভাবনা ও সঠিক যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে মেনে নেয় কিনা, এটাই এ পরীক্ষা।

এ প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি গভীর মনোযোগের দাবী রাখে। বলা হয়েছে, "আল্লাহ তাঁর নিশানীগুলোকে উন্মুক্ত করে পেশ করছেন তাদের জন্য, যারা জ্ঞানের অধিকারী।" আর "আল্লাহর সৃষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে নিশানী রয়েছে তাদের জন্য যারা ভুল দেখা ও ভুল পথে চলা থেকে বাঁচতে চায়।" এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ অত্যন্ত বিজ্ঞ জনোচিত পদ্ধতিতে জীবনের নিদর্শনাবলীর মধ্যে চতুরদিকে এমন সব চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন যা ঐ নিদর্শনগুলোর পেছনে আত্মগোপন করে থাকা সত্যগুলোকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করছে। কিন্তু এ নিদর্শনগুলোর সাহায্যে নিগূঢ় সত্যে একমাত্র তারাই উপনীত হতে পারে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণ দু'টি আছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُونَ ﴿٧﴾ أُولٰئِكَ مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۚ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوٰىهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٠﴾

এ কথা সত্য, যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে গাফেল, তাদের শেষ আবাস হবে জাহান্নাম এমন সব অসৎকাজের কর্মফল হিসেবে যেগুলো তারা (নিজেদের ভুল আকীদা ও ভুল কার্যধারার কারণে) ক্রমাগতভাবে আহরণ করতো।[১২]

আবার একথাও সত্য, যারা ঈমান আনে (অর্থাৎ যারা এ কিতাবে পেশকৃত সত্যগুলো গ্রহণ করে) এবং সৎকাজ করতে থাকে, তাদেরকে তাদের রব তাদের ঈমানের কারণে সোজা পথে চালাবেন। নিয়ামত ভরা জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে।[১৩] *সেখানে তাদের ধ্বনি হবে "পবিত্র তুমি যে আল্লাহ!" তাদের দোয়া হবে, "শান্তি ও নিরাপত্তা হোক!" এবং তাদের সবকথার শেষ হবে এভাবে, "সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-জাহানের রব আল্লাহর জন্য।"*[১৪]

এক ঃ তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত একগুয়েমী বিদ্বেষ ও স্বার্থ প্রীতি থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞান অর্জন করার এমন সব মাধ্যম ব্যবহার করে যেগুলো আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন।

দুই ঃ তারা ভুল থেকে আত্মরক্ষা ও সঠিক পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা নিজেদের অন্তরে পোষণ করে।

১২. এখানে আবার দাবীর সাথে সাথে ইশারা–ইংগিতে তার যুক্তিও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। দাবী হচ্ছে, পরকালীন জীবনের ধারণা অস্বীকার করার অনিবার্য ও নিশ্চিত ফল জাহান্নাম। এর প্রমাণ হচ্ছে, এ ধারণা অস্বীকার করে অথবা এ ধরনের কোন প্রকার ধারণার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে মানুষ এমন সব অসৎকাজ করে যেগুলোর শাস্তি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এটি একটি জাজ্বল্যমান সত্য। মানুষ হাজার

হাজার বছর থেকে যে দৃষ্টিভংগি পোষণ এবং যে কর্মনীতি অবলম্বন করে আসছে তার অভিজ্ঞতাই এর সাক্ষ বহন করছে। যারা আল্লাহর সামনে নিজেদেরকে দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে না, যারা কখনো নিজেদের সারা জীবনের সমস্ত কাজের শেষে একদিন আল্লাহর কাছে তার হিসেব পেশ করার ভয় করে না, যারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করে যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার ও তার হিসাব নিকাশ এ দুনিয়ার জীবনেই শেষ, যাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ায় মানুষ যে পরিমাণ সমৃদ্ধি, সুখৈশ্বর্য, খ্যাতি ও শক্তিমত্তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে শুধুমাত্র তারই ভিত্তিতে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা বিচার্য এবং যারা নিজেদের বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার কারণে আল্লাহর আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করে না, তাদের সারা জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তারা দুনিয়ায় বাস করে লাগামহীন উটের মত। তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ের চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হয়। পৃথিবীকে জুলুম, নির্যাতন, বিপর্যয়, বিশৃংখলা, ফাসেকী ও অশ্লীল জীবন চর্চায় ভরে দেয়। ফলে জাহান্নামের আযাব ভোগের যোগ্যতা অর্জন করে।

এটি আখেরাত বিশ্বাসের পক্ষে আর এক ধরনের যুক্তি। প্রথম তিনটি যুক্তি ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক। আর এটি হচ্ছে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভিত্তিক। এখানে এটিকে শুধুমাত্র ইশারা ইংগিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের অন্যান্য জায়গায় আমরা একে বিস্তারিত আকারে দেখতে পাই। এ যুক্তিটির সারমর্ম হচ্ছে ঃ মানুষের ব্যক্তিগত মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী এবং মানবিক সমাজ ও গোষ্ঠীগুলোর সামষ্টিক মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হয় না যতক্ষণ না 'আমাকে আল্লাহর সামনে নিজের কাজের জবাব দিতে হবে' এ চেতনা ও বিশ্বাস মানুষের নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিমূলে গভীরভাবে শিকড় গেঁড়ে বসে। এখন চিন্তার বিষয়, এমনটি কেন? কি কারণে এ চেতনা ও বিশ্বাস বিনষ্ট হওয়া বা দুর্বল হওয়ার সাথে সাথেই মানুষের নৈতিক বৃত্তি ও কর্মকাণ্ড অসৎ ও অন্যায়ের পথে ধাবিত হয়? যদি আখেরাত বিশ্বাস বাস্তব ও প্রকৃত সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হতো এবং তার অস্বীকৃতি প্রকৃত সত্যের বিরোধী না হতো, তাহলে তার স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির এ পরিণাম ফল একটি অনিবার্য বাধ্যবাধকতা সহকারে অনবরত আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়তো না। একই জিনিস বিদ্যমান থাকলে সবসময় সঠিক ফলাফল বের হয়ে আসা এবং তার অবর্তমানে হামেশা ভুল ফলাফল দেখা দেয়া চূড়ান্তভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, ঐ জিনিসটি আসলে সঠিক।

এর জবাবে অনেক সময় যুক্তি পেশ করে বলা হয় যে, যারা পরকাল মানে না এবং যাদের নৈতিক দর্শন ও কর্মনীতি একেবারেই নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের ভিত্তিতে তৈরী তাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যারা যথেষ্ট পাক পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী এবং তারা জুলুম, বিপর্যয়, ফাসেকী ও অশ্লীলতার প্রকাশ ঘটান না। বরং নিজেদের লেনদেন ও আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা সৎ এবং মানুষ ও সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা অতি সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত বস্তুবাদী ধর্মহীন দর্শন ও চিন্তা ব্যবস্থা যাচাই পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, উল্লেখিত 'সৎকর্মকারী' নাস্তিকদেরকে তাদের যে সৎকাজের জন্য এত মোবারকবাদ দেয়া হচ্ছে তাদের ঐসব নৈতিক সৎবৃত্তি ও বাস্তব সৎকাজের পেছনে কোন পরিচালিকা শক্তির অস্তিত্ব নেই। কোন ধরনের যুক্তি

প্রদর্শন করে একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, ঐ সমস্ত ধর্মহীন দর্শনে সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, অংগীকার পালন, ইনসাফ, দানশীলতা, ত্যাগ, কুরবানী, সহানুভূতি, আত্মসংযম, চারিত্রিক সততা সত্যানুসন্ধিৎসা ও অধিকার প্রদানের কারণে কোন উদ্দীপক শক্তি সক্রীয় আছে। আল্লাহ ও পরকালকে বাদ দেবার পর নৈতিকবৃত্তির জন্য যদি কোন কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে তাহলে তা গড়ে তোলা যায় একমাত্র উপযোগবাদের (Utilitareanism) অর্থাৎ স্বার্থপরতার ভিত্তিতে। বাদবাকি অন্যান্য সমস্ত নৈতিক দর্শন শুধুমাত্র কাল্পনিক, আনুমানিক ও কেতাবী রচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেগুলো বাস্তবে কার্যকর হবার যোগ্য নয়। আর উপযোগবাদ যে নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি করে তাকে যতই ব্যাপকতা দান করা হোক না কেন তা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। বড় জোর তা এতদূর যেতে পারে যে, মানুষ এমন কাজ করবে যা থেকে তার নিজের সত্তার বা যে সমাজে সে বাস করে তার লাভবান হবার আশা থাকে। এটি এমন একটি জিনিস যা লাভের আশা ও ক্ষতির আশংকার ভিত্তিতে মানুষকে সুযোগ মতো সত্য ও মিথ্যা, বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা, ঈমানদারী ও বেঈমানী, আমানতদারী ও আত্ম-সাৎ,ইনসাফ ও জুলুম ইত্যাকার প্রত্যেকটি সৎকাজ ও তার বিপরীতমুখী মন্দ কাজে লিপ্ত করতে পারে। এ নৈতিক বৃত্তিগুলোর সবচেয়ে ভাল নমুনা হচ্ছে বর্তমান যুগের ইংরেজ জাতি। প্রায়ই এদেরকে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে বলা হয় যে, বস্তুবাদী জীবন দর্শনের অধিকারী এবং পরকালের ধারণায় বিশ্বাসী না হয়েও এ জাতির ব্যক্তিবর্গ সাধারণভাবে অন্যদের তুলনায় বেশী সৎ, সত্যবাদী, আমানতদার, অংগীকার পালনকারী, ন্যায়নিষ্ঠ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু স্বার্থপ্রণোদিত নৈতিকতা ও সততা যে মোটেই টেকসই হয় না, তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট বাস্তব প্রমাণ আমরা এ জাতির চরিত্রেই পাই। সত্যিই যদি ইংরেজদের সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও অংগীকার পালন এ বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতো যে, এ গুণগুলো আদতেই এবং বাস্তবিক পক্ষেই শাশ্বত নৈতিক গুণাবলীর অন্তরভুক্ত, তাহলে এ সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দৃষ্টিভংগী পরস্পরের বিপরীত হয় কেমন করে? একজন ইংরেজ তার ব্যক্তিগত জীবনে এ গুণগুলোতে ভূষিত হবে কিন্তু সমগ্র জাতি মিলে যাদেরকে নিজেদের প্রতিনিধি এবং নিজেদের সামষ্টিক বিষয়াবলীর পরিচালক ও তত্বাবধায়ক মনোনীত করে তারা বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তাদের সাম্রাজ্য ও তার আন্তরজাতিক বিষয়াবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে নগ্নভাবে মিথ্যাচার, অংগীকার ভংগ, জুলুম, বে-ইনসাফী ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেয় এবং তার পরও তারা সমগ্র জাতির আস্থা লাভ করে—এটা কেমন করে সম্ভব হয়? তারা যে মোটেই কোন স্থায়ী ও শাশ্বত নৈতিক গুণাবলীতে বিশ্বাসী নয় বরং স্রেফ পার্থিব লাভ-ক্ষতির প্রেক্ষিতেই তারা একই সময় দু'টি বিপরীতধর্মী নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে থাকে বা করতে পারে, সেটাই কি এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না?

তবুও সত্যই যদি দুনিয়ায় এমন কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব থেকে থাকে, যে আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকার করা সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে কোন কোন সৎকাজ করে ও অসৎকাজ থেকে দূরে থাকে তাহলে আসলে তার এ সৎপ্রবণতা ও সৎকর্মস্পৃহা তার বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ফল নয়। বরং এগুলো তার এমন সব ধর্মীয় প্রভাবের ফল যা অবচেতনভাবে তার অন্তরাত্মার মধ্যে শেকড় গেড়ে রয়েছে। তার এ নৈতিক সম্পদ ধর্মের ভাণ্ডার থেকে চুরি করে আনা হয়েছে এবং সে একে ধর্মহীনতার মোড়কে অবৈধভাবে ব্যবহার করছে। কারণ

সে তার ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদিতার ভাণ্ডারে এ সম্পদটির উৎস নির্দেশ করতে কখনই সক্ষম হবে না।

১৩. এ বাক্যটিকে হালকাভাবে নেবেন না। এর বিষয়বস্তুর ক্রম বিন্যাস গভীর মনোনিবেশের দাবীদার।

পরকালীন জীবনে তারা জান্নাত লাভ করবে কেন? কারণ, তারা পার্থিব জীবনে সত্য পথে চলেছে। প্রত্যেক কাজে, জীবনের প্রতিটি বিভাগে, প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বিষয়ে তারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ পথ অবলম্বন করেছে এবং বাতিলের পথ পরিহার করেছে।

তারা প্রতিটি পদক্ষেপে, জীবনের প্রতি মোড়ে মোড়ে ও প্রতিটি পথের চৌমাথায় তারা ন্যায় ও অন্যায় হতে ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারলো কেমন করে? তারপর এ পার্থক্য অনুযায়ী সঠিক পথের ওপর দৃঢ়তা এবং অন্যায় পথ থেকে দূরে থাকার শক্তি তারা কোথা থেকে পেলো?—এসব তারা লাভ করেছে তাদের রবের পক্ষ থেকে। তিনিই তাত্বিক পথনির্দেশনা দান এবং বাস্তব কাজের ক্ষমতা দান ও সুযোগ সৃষ্টির উৎস।

তাদের রব তাদেরকে পথনির্দেশনা এবং সুযোগ দান করেন কেন?—তাদের ঈমানের কারণে এ সুযোগ দেন।

ওপরে এই যে ফলাফলগুলো বর্ণিত হয়েছে এগুলো কোন্ ঈমান ও বিশ্বাসের ফল? এমন ঈমানের ফল নয় যার অর্থ হয় নিছক বিশ্বাস করা। বরং এমন ঈমানের ফল যা চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের পরিচালক শক্তি ও প্রাণসত্তায় পরিণত হয় এবং যার উদ্বুদ্ধকারী শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কর্ম ও চরিত্রে নেকী ও সৎবৃত্তির প্রকাশ ঘটে। মানুষের পার্থিব ও জৈবিক জীবনেই দেখা যায় তার জীবন ধারণ, শারীরিক সুস্থতা, কর্মক্ষমতা ও জীবনের স্বাদ আহরণ করার জন্য তাকে বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হয়। কিন্তু শুধু খাদ্য খেয়ে নিলেই এসব গুণ ও ফল লাভ করা যায় না। বরং এমনভাবে খেতে হয় যার ফলে তা হজম হয়ে গিয়ে রক্ত সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি শিরা উপ-শিরায় পৌঁছে শরীরের প্রতিটি অংশে এমন শক্তি সঞ্চার করে যার ফলে সে তার অংশের কাজ ঠিকমত করতে পারে। ঠিক একইভাবে নৈতিক জীবনে মানুষের সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করা, সত্যকে দেখা, সত্য পথে চলা এবং সবশেষে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করা সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এমন ধরনের কোন আকীদা-বিশ্বাস এ ফল সৃষ্টি করতে পারে না, যা নিছক মুখে উচ্চারিত হয় অথবা মন ও মস্তিষ্কের কোন অংশে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। বরং যে আকীদা-বিশ্বাস হৃদয়ের মর্মমূলে প্রবেশ করে তার সাথে একাকার হয়ে যায় এবং তারপর চিন্তা পদ্ধতি রুচি-প্রকৃতি ও মেজায-প্রবণতার অঙ্গীভূত হয়ে চরিত্র, কর্মকাণ্ড ও জীবনভংগীতে সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। তাই এ ফল সৃষ্টিতে সক্ষম। যে ব্যক্তি খাদ্য খেয়ে তা যথাযথভাবে হজম করতে সক্ষম হয় তার জন্য যে পুরস্কার রাখা হয়েছে, যে ব্যক্তি আহার করেও অনাহারীর মতো থাকে আল্লাহর জৈব বিধান অনুযায়ী সে কখনো সেই পুরস্কারের অধিকারী হয় না। তাহলে যে ব্যক্তি ঈমান এনেও বেঈমানের মতো জীবন যাপন করে সে আল্লাহর নৈতিক বিধানে ঈমান আনয়নের পর সৎকর্মশীলের মত জীবন যাপনকারী যে পুরস্কার পায়, সে-ই পুরস্কার পাওয়ার আশা করতে পারে?

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

আল্লাহ যদি[১৫] লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার ব্যাপারে অতটাই তাড়াহুড়া করতেন যতটা দুনিয়ার ভালো চাওয়ার ব্যাপারে তারা তাড়াহুড়া করে থাকে, তাহলে তাদের কাজ করার অবকাশ কবেই খতম করে দেয়া হতো (কিন্তু আমার নিয়ম এটা নয়)। তাই যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করার আশা পোষণ করে না তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেই। মানুষের অবস্থা হচ্ছে, যখন সে কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়, তখন সে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আমাকে ডাকে। কিন্তু যখন আমি তার বিপদ হটিয়ে দেই তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে যেন সে কখনো নিজের কোন খারাপ সময়ে আমাকে ডাকেইনি। ঠিক তেমনিভাবে সীমা অতিক্রমকারীদের জন্য তাদের কার্যক্রমকে সুশোভন করে দেয়া হয়েছে।

১৪. এখানে চমকপ্রদ ভংগীতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার পরীক্ষাগৃহ থেকে সফলকাম হয়ে বের হয়ে সুখৈশ্বর্য ও সম্ভোগপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করেই তারা বুভূক্ষের মত ভোগ্য সামগ্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না এবং চারদিক থেকে–

"হূর আনো, শরাব আনো,
গীটার বাজাও বাজাও পিয়ানো"

–এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে না—যদিও জান্নাতের কথা শুনতেই কোন কোন বিকৃত বুদ্ধির অধিকারী লোকের মানসপটে এ ধরনের ছবিই ভেসে ওঠে। আসলে সৎ ঈমানদার ব্যক্তি দুনিয়ায় উন্নত চিন্তা ও উচ্চাংগের নৈতিক বৃত্তি অবলম্বন করা, নিজের আবেগ–অনুভূতিকে সংযত ও সুসজ্জিত করা, নিজের ইচ্ছা–অভিলাশকে পরিশুদ্ধ করা এবং নিজের চরিত্র ও কার্যকলাপকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার মাধ্যমে নিজের মধ্যে যে ধরনের উৎকৃষ্টতম ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবে ও মহত্তম গুণাবলী লালন করবে, দুনিয়ার পরিবেশ থেকে ভিন্নতর জান্নাতের অতি পবিত্র পরিবেশে সেই ব্যক্তিত্ব এবং সেই গুণাবলী

আরো বেশী উজ্জ্বল, প্রখর ও তেজোময় হয়ে ভেসে উঠবে। দুনিয়ায় আল্লাহর যে প্রশংসা ও পবিত্রতার কথা তারা বর্ণনা করতো সেখানে সেটিই হবে তাদের সবচেয়ে প্রিয় কাজ। দুনিয়ায় বাস করার সময় পরস্পরের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনার যে অনুভূতিকে তারা নিজেদের সামাজিক মনোভংগীর প্রাণ বায়ুতে পরিণত করেছিল সেখানকার সমাজ পরিবেশেও তাদের সেই অনুভূতিই সক্রিয় থাকবে।

১৫. ওপরের ভূমিকার পর এবার উপদেশ দেয়া ও বুঝাবার জন্য ভাষণ শুরু করা হচ্ছে। এ ভাষণটি পড়ার আগে এর পটভূমি সম্পর্কিত কিছু কথা সামনে রাখতে হবে।

এক ঃ এ ভাষণটি শুরু হওয়ার মাত্র কিছুকাল আগেই একটি দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন বিপদজনক দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটেছিল। সেই বিপদের আবর্তে পড়ে মক্কাবাসীদের নাভিশ্বাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে কুরাইশ গোত্রের অহংকারী লোকদের উদ্ধত মাথাগুলো অনেক নীচু হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রার্থনা ও আহাজারি করতো। মূর্তি পূজায় ভাটা পড়ে গিয়েছিল। এক লা-শরীক আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বালা-মুসিবত দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার আবেদন জানালো। কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলো, বৃষ্টি শুরু হলো এবং সমৃদ্ধির দিন এসে গেলো তখন আবার এ লোকদের সেই আগের বিদ্রোহাত্মক আচরণ, অসৎকর্ম ও সত্যবিরোধী তৎপরতা শুরু হয়ে গেলো। যাদের হৃদয় আল্লাহর দিকে ফিরতে শুরু করেছিল তারা আবার তাদের আগের ঘোর গাফলতিতে নিমজ্জিত হলো। (দেখুন ঃ আন নহল ১৩ আয়াত, আল মুমিনুন ৭৫-৭৭ আয়াত এবং আদ্ দুখান ১০-১৬ আয়াত)

দুই ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই তাদেরকে সত্য অমান্য করার কারণে ভয় দেখাতেন তখনই তারা জবাবে বলতো ঃ তুমি আল্লাহর যে আযাবের হুমকি দিচ্ছো তা আসছে না কেন? তার আসতে দেরি হচ্ছে কেন?

এরি জবাবে বলা হচ্ছে ঃ মানুষের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহ যতটা দ্রুতগামী হন, তাদের সাজা দেবার ও পাপ কাজ করার দরুন তাদেরকে পাকড়াও করার ব্যাপারে ততটা ত্বরিৎ গতি অবলম্বন করেন না। তোমরা চাও, তোমাদের দোয়া শুনে যেভাবে তিনি দুর্ভিক্ষের বিপদ দ্রুত অপসারণ করেছেন ঠিক তেমনি তোমাদের চ্যালেঞ্জ শুনে এবং তোমাদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা দেখে সংগে সংগেই আযাবও পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু এটা আল্লাহর নিয়ম নয়। মানুষ যতই অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করুক না কেন, এ অপরাধে তাদেরকে পাকড়াও করার আগে তিনি তাদেরকে সংশোধিত হবার যথেষ্ট সুযোগ দেন। একের পর এক সতর্ক বাণী পাঠান এবং রশি ঢিলে করে ছেড়ে দেন। অবশেষে যখন সুবিধা ও অবকাশ শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখনই কর্মফলের নীতি বলবত হয়। এ হচ্ছে আল্লাহর পদ্ধতি। পক্ষান্তরে তোমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছ সেটা হচ্ছে সংকীর্ণমনা মানুষদের পদ্ধতি। অর্থাৎ বিপদ এলে আল্লাহর কথা মনে পড়তে থাকে। তখন হা-হুতাশ ও কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। আবার যেই বিপদমুক্ত স্বস্তির দিন আসে অমনি সবকিছু ভুলে যাও। এ ধরনের অভ্যাস ও নীতির বদৌলতেই বিভিন্ন জাতির জন্য আল্লাহর আযাব অনিবার্য ও অবধারিত হয়ে ওঠে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

হে মানব জাতি! তোমাদের আগের জাতিদেরকে[১৬] (যারা তাদের নিজেদের যুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি—যখন তারা জুলুমের নীতি[১৭] অবলম্বন করলো এবং তাদের রসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিশানী নিয়ে এলেন, কিন্তু তারা আদৌ ঈমান আনলো না। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি। এখন তাদের পরে আমি পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কেমন আচরণ করো তা দেখার জন্য।[১৮]

১৬. মূল আয়াতে "কারূন" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণভাবে আরবীতে এর অর্থ হয় কোন বিশেষ যুগের অধিবাসী বা প্রজন্ম; কিন্তু কুরআন মজীদে যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে মনে হয় 'কারূন' শব্দের মাধ্যমে এমন জাতির কথা বুঝানো হয়েছে যারা নিজেদের যুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল এবং পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ ধরনের জাতির ধ্বংস নিশ্চিতভাবে এ অর্থ বহন করে না যে, শাস্তি হিসেবে তাদের সমগ্র জনশক্তিকেই ধ্বংস করে দেয়া হতো বরং তাদেরকে উন্নতি ও নেতৃত্বের আসন থেকে নামিয়ে দেয়া, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাওয়া, তাদের বৈশিষ্ট বিলুপ্ত হওয়া এবং তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য জাতির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমেও শাস্তি দেয়া হতো। মূলত এসবই ধ্বংসের এক একটি প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭. সাধারণভাবে জুলুম বলতে যা বুঝায় এখানে সেই ধরনের কোন সংকীর্ণ অর্থ ব্যবহার করা হয়নি। বরং আল্লাহর বান্দা ও গোলাম হিসেবে যে সীমারেখা ও বিধি-নিষেধ মেনে চলা মানুষের কর্তব্য, সেই বিধি-নিষেধ ও সীমারেখা লংঘন করে সে যেসব গোনাহ করে এখানে সেগুলোর অর্থেই জুলুম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারার ৪৯ নম্বর টীকা)।

১৮. মনে রাখতে হবে, এখানে সম্বোধন করা হচ্ছে আরববাসীদেরকে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, আগের জাতিগুলোকে তাদের যুগে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত জুলুম ও বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করেছিল এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য যেসব নবী পাঠানো হয়েছিল তাঁদের কথা তারা মানেনি। তাই আমার পরীক্ষায় তারা

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ
نَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ
مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা শুনানো হয় তখন যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তারা বলে, "এটার পরিবর্তে অন্য কোন কুরআন আনো অথবা এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন করো।"[১৯] হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, "নিজের পক্ষ থেকে এর মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা আমার কাজ নয়। আমি তো শুধুমাত্র আমার কাছে যে অহী পাঠানো হয়, তার অনুসারী। যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমার একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা হয়।"[২০]

ব্যর্থ হয়েছে। এবং তাদেরকে ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়ছে। এখন হে আরববাসীরা! তোমাদের পালা এসেছে। তাদের জায়গায় তোমাদের কাজ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। তোমরা এখন পরীক্ষা গৃহে দাঁড়িয়ে আছো। তোমাদের পূর্ববর্তীরা ব্যর্থ হয়ে এখান থেকে বের হয়ে গেছে। তোমরা যদি তাদের মতো একই পরিণামের সম্মুখীন হতে না চাও তাহলে তোমাদের এই যে সুযোগ দেয়া হচ্ছে এ থেকে যথাযথভাবে লাভবান হও। অতীতের জাতিদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং যেসব ভুল তাদের ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়েছিল সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করো না।

১৯. তাদের এ বক্তব্য প্রথমত এ ধারণার ভিত্তিতে উচ্চারিত হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু পেশ করছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় বরং তাঁর নিজের চিন্তার ফসল এবং শুধুমাত্র নিজের কথার গুরুত্ব বাড়াবার জন্য তিনি তাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। দ্বিতীয়ত তারা বলতে চাচ্ছিল, তুমি এসব তাওহীদ, আখেরাত ও নৈতিক বিধি-নিষেধের আলোচনার অবতারণা করছো কেন? যদি জাতির পথ-নির্দেশনা তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এমন জিনিস পেশ করো যার ফলে জাতি লাভবান হয় এবং সে বৈষয়িক উন্নতি লাভ করতে পারে। তবুও যদি তুমি নিজের এ দাওয়াতকে একদম বদলাতে না চাও তাহলে কমপক্ষে এর মধ্যে এতটুকু নমনীয়তা সৃষ্টি করো যার ফলে আমাদের ও তোমার মধ্যে দরকষাকষির ভিত্তিতে সমঝোতা হতে পারে। আমরা তোমার কথা কিছু মেনে নেবো এবং তুমি আমাদের কথা কিছু মেনে নেবে। তোমার তাওহীদের মধ্যে আমাদের শিরকের জন্য কিছু জায়গা দিতে হবে তোমার আল্লাহ প্রীতির মধ্যে আমাদের দুনিয়া প্রীতির সহাবস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার পরকাল

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

আর বলো, যদি এটিই হতো আল্লাহর ইচ্ছা তাহলে আমি এ কুরআন তোমাদের কখনো শুনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরও দিতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করতে পার না?[২১] তারপর যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বানিয়ে তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করে অথবা আল্লাহর যথার্থ আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?[২২] নিসন্দেহে, অপরাধী কোনদিন সফলকাম হতে পারে না।[২৩]

বিশ্বাসের মধ্যে আমাদের এ ধরনের বিশ্বাসের কিছু অবকাশ রাখতে হবে যে, দুনিয়ায় আমরা যা চাই তা করতে থাকবো কিন্তু আখেরাতে কোন না কোনভাবে অবশ্যি আমরা মুক্তি পেয়ে যাবো। তাছাড়া তুমি যে কঠোরতম ও অনমনীয় নৈতিক মূলনীতিগুলোর প্রচার করে থাক, তা আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। এর মধ্যে আমাদের সংকীর্ণ গোত্রস্বার্থ, রসম-রেওয়াজ, ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থ এবং আমাদের প্রবৃত্তির আশা-আকংখার জন্যও কিছুটা অবকাশ থাকা উচিত। আমাদের ও তোমার মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ইসলামের দবীসমূহের একটি ন্যায়সংগত পরিসর স্থিরিকৃত হয়ে যাওয়াটা কি বাঞ্ছনীয় নয়? সেই পরিসরে আমরা আল্লাহর হক আদায় করে দেবো। এরপর আমাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে হবে। আমরা যেভাবে চাইবো বৈষয়িক কাজ কারবার চালিয়ে যেতে থাকবো। কিন্তু তুমি তো সমগ্র জীবন ও সমস্ত কাজ-কারবারকে তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাস এবং শরীয়াতের বিধানের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন করার সর্বনাশা নীতি গ্রহণ করেছো।

২০. এটি হচ্ছে ওপরের দু'টি কথার জবাব। এখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই বরং অহীর মাধ্যমে এটি আমার কাছে এসেছে এবং এর মধ্যে কোন রকম রদ বদলের অধিকারও আমার নেই। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন প্রকার সমঝোতার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে এ সমগ্র দীনকে হুবহু গ্রহণ করতে হবে, নয়তো পুরোপুরি রদ করে দিতে হবে।

২১. কুরআনের বাণীগুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তৈরী করে আল্লাহর বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, এ মর্মে তারা যে অপবাদ রটাচ্ছিল এটি তার একটি দাঁতভাংগা জবাব ও তার প্রতিবাদে একটি অকাট্য যুক্তি। এই সাথে মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিজে এ কিতাবের রচয়িতা নন বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে এটি তাঁর ওপর নাযিল হচ্ছে, তাঁর এ দাবীর সপক্ষেও এটি একটি জোরালো

যুক্তি। অন্য যুক্তি–প্রমাণগুলো তবুওতো তুলনামূলকভাবে দূরবর্তী বিষয় ছিল কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন তো তাদের সামনের জিনিস ছিল। নবুওয়াত লাভের আগে পুরো চল্লিশটি বছর তিনি তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি তাদের শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের চোখের সামনে তাঁর শিশুকাল অতিক্রান্ত হয়। সেখানেই বড় হন। যৌবনে পদার্পণ করেন তারপর প্রৌঢ়ত্বে পৌছেন। থাকা–খাওয়া, ওঠাবসা, লেনদেন, বিয়ে শাদী ইত্যাদি সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তাদের সাথেই ছিল এবং তাঁর জীবনের কোন দিক তাদের কাছে গোপন ছিল না। এমন ধরনের সুপরিচিত ও চোখে দেখা জিনিসের চাইতে ভালো সাক্ষ আর কি হতে পারে?

তাঁর এ জীবনধারার মধ্যে দু'টি বিষয় একেবারেই সুস্পষ্ট ছিল। মক্কার প্রত্যেকটি লোকই তা জানতো।

এক, নবুওয়াত লাভ করার আগে তাঁর জীবনের পুরো চল্লিশটি বছরে তিনি এমন কোন শিক্ষা, সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ লাভ করেননি এবং তা থেকে এমন তথ্যাদি সংগ্রহ করেননি যার ফলে একদিন হঠাৎ নবুওয়াতের দাবী করার সাথে সাথেই তার কন্ঠ থেকে এ তথ্যাবলীর ঝরণাধারা নিঃসৃত হতে আরম্ভ করেছে। কুরআনের এসব সূরায় এখন একের পর এক যেসব বিষয় আলোচিত হচ্ছিল এবং যেসব চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটছিল এর আগে কখনো তাঁকে এ ধরনের সমস্যার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে, এ বিষয়াবলীর ওপর আলোচনা করতে এবং এ ধরনের অভিমত প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এমনকি এ পুরো চল্লিশ বছরের মধ্যে কখনো তাঁর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কোন নিকটতম আত্মীয়ও তাঁর কথাবার্তা ও আচার–আচরণে এমন কোন জিনিস অনুভব করেনি যাকে তিনি হঠাৎ চল্লিশ বছরে পদার্পণ করে যে মহান দাওয়াতের সূচনা করেন তার ভূমিকা বা পূর্বাভাস বলা যেতে পারে। কুরআন যে তার নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত নয় বরং বাইর থেকে তাঁর মধ্যে আগত এটাই ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ জীবনের কোন পর্যায়েও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার জন্য এমন কোন জিনিস পেশ করতে পারে না যার উন্নতি ও বিকাশের সুস্পষ্ট আলামত তার পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোয় পাওয়া যায় না। এ কারণে মক্কার কিছু চতুর লোক যখন নিজেরাই কুরআনকে রসূলের মস্তিষ্কপ্রসূত গণ্য করাকে একেবারেই একটি বাজে ও ভূয়া দোষারোপ বলে উপলব্ধি করলো তখন শেষ পর্যন্ত তারা বলতে শুরু করলো, অন্য কেউ মুহাম্মাদকে একথা শিখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এ দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথাটির চাইতেও বেশী বাজে ও ভূয়া ছিল। কারণ শুধু মক্কায়ই নয়, সারা আরব দেশেও এমন একজন লোক ছিল না যার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলা যেতে পারতো যে, ইনিই এ বাণীর রচয়িতা বা রচয়িতা হতে পারেন। এহেন যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি কোন সমাজে আত্মগোপন করে থাকার মত নয়।

দ্বিতীয় যে কথাটি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে একদম সুস্পষ্ট ছিল সেটি ছিল এই যে, মিথ্যা, প্রতারণা, জালিয়াতী, ধোঁকা, শঠতা, ছলনা এবং এ ধরনের অন্যান্য অসৎগুণাবলীর কোন সমান্যতম গন্ধও তাঁর চরিত্রে পাওয়া যেতো না। গোটা আরব সমাজে এমন এক ব্যক্তিও ছিল না যে একথা বলতে পারতো যে, এ চল্লিশ বছরের সহাবস্থানের সময় তাঁর ব্যাপারে এমন কোন আচরণের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। পক্ষান্তরে তাঁর সাথে যাদেরই যোগাযোগ হয়েছে তারাই তাঁকে একজন অত্যন্ত সাচ্চা, নিষ্কলংক ও বিশ্বস্ত (আমানতদার) ব্যক্তি

হিসেবেই জেনেছে। নবুওয়াত লাভের মাত্র পাঁচ বছর আগের কথা। কাবা পুনর্নির্মাণের সময় কুরাইশদের বিভিন্ন পরিবার হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) সংস্থাপনের প্রশ্নে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে স্থিরিকৃত হয়েছিল, পরদিন সকালে সবার আগে যে ব্যক্তি কাবাঘরে প্রবেশ করবে তাকেই শালিস মানা হবে। পরদিন সেখানে সবার আগে প্রবেশ করেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে দেখেই সবাই সমস্বরে বলে ওঠে : هذا الامين ، رضينا ، هذا محمد "এ সেই সাচ্চা ও সৎ ব্যক্তি। আমরা এর ফায়সালায় রাযী। এতো মুহাম্মাদ।" এভাবে তাঁকে নবী হিসেবে নিযুক্ত করার আগেই আল্লাহ সমগ্র কুরাইশ গোত্র থেকে তাদের ভরা মজলিসে তাঁর "আমীন' হবার সাক্ষী নিয়েছিলেন। এখন যে ব্যক্তি তার সারা জীবন কোন ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও মিথ্যা, প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নেননি তিনি অকস্মাত এতবড় মিথ্যা, জালিয়াতী ও প্রতারণার জাল বিস্তার করে এগিয়ে আসবেন কেন? তিনি নিজের মনে মনে কিছু বাণী রচনা করে নেবেন এবং সর্বাত্মক বলিষ্ঠতা সহকারে চ্যালেঞ্জ দিয়ে সেগুলোকে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করবেন, এ ধরনের কোন সন্দেহ পোষণ করার অবকাশই বা সেখানে কোথায়?

এ কারণে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তাদের এ নিরর্থক দোষারোপের জবাবে তাদেরকে বলো : হে আল্লাহর বান্দারা। নিজেদের বিবেক বুদ্ধিকে কিছু কাজে লাগাও। আমি তো বহিরাগত কোন অপরিচিত আগন্তুক নই। তোমাদের মাঝে জীবনের একটি বিরাট সময় আমি অতিবাহিত করেছি। আমার অতীত জীবনের কার্যাবলী দেখার পর তোমরা কেমন করে আমার কাছ থেকে আশা করতে পারো যে, আমি আল্লাহর হুকুম ও তাঁর শিক্ষা ছাড়াই এ কুরআন তোমাদের সামনে পেশ করতে পারি? (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা কাসাস ১০৯ টীকা)।

২২. অর্থাৎ যদি এ আয়াতগুলো আল্লাহর না হয়ে থাকে এবং আমি নিজে এগুলো রচনা করে আল্লাহর আয়াত বলে পেশ করে থাকি, তাহলে আমার চাইতে বড় জালেম আর কেউ নেই। আর যদি এগুলো সত্যিই আল্লাহর আয়াত হয়ে থাকে এবং তোমরা এগুলো অস্বীকার করে থাকো তাহলে তোমাদের চাইতে বড় জালেম আর কেউ নেই।

২৩. কোন কোন অজ্ঞ লোক "সফলকাম" বলতে দীর্ঘজীবন বা বৈষয়িক সমৃদ্ধি অথবা পার্থিব উন্নতি অর্থ গ্রহণ করেন। তারপর এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান যে, নবুওয়াতের দাবী করার পর যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে, দুনিয়ায় উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে অথবা তার দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে থাকে, তাকে সত্য নবী বলে মেনে নেয়া উচিত। কারণ সে সফলকাম হয়েছে। যদি সে সত্য নবী না হতো তাহলে মিথ্যা দাবী করার সাথে সাথেই তাকে হত্যা করা হতো অথবা অনাহারে মেরে ফেলা হতো এবং দুনিয়ায় তার কথা ছড়াতেই পারতো না। কিন্তু এ ধরনের নির্বুদ্ধিতাসুলভ যুক্তি একমাত্র সেই ব্যক্তিই প্রদর্শন করতে পারে, যে কুরআনী পরিভাষা "সফলকাম"–এর অর্থ জানে না এবং অবকাশ দানের বিধান সম্পর্কেও জ্ঞাত নয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ অপরাধীদের জন্য এ বিধান নির্ধারিত করেছেন। এ সংগে এ বর্ণনার মধ্যে এ বাক্যটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাও বুঝে না।

প্রথমত "অপরাধী সফলকাম হতে পারে না" একথাটি এ আলোচনার ক্ষেত্রে এভাবে বলা হয়নি যে, এটিকে কারোর নবুওয়াতের দাবী যাচাই করার মাপকাঠিতে পরিণত করা হবে এবং সাধারণ জনসমাজ যাচাই পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে, যে নবুওয়াতের দাবীদার "সফলকাম" হচ্ছে তার দাবী মেনে নেয়া হবে এবং যে "সফল কাম" হচ্ছে না। তার দাবী অস্বীকার করা হবে। বরং এখানে একথাটি এ অর্থে বলা হয়েছে যে, "আমি নিশ্চয়তা সহকারে জানি অপরাধিরা সফলকাম হতে পারে না। তাই আমি নিজে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করার অপরাধ করতে পারি না। তবে তোমাদের ব্যাপারে আমি নিশ্চিতভাবে জানি, তোমরা সত্য নবীকে অস্বীকার করার অপরাধ করছো। কাজেই তোমরা সফলকাম হবে না।

তাছাড়া সফলকাম শব্দটিও কুরআনে বৈষয়িক সফলতার সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং এর অর্থ এমন ধরনের চিরন্তন সফলতা যা কোন দিন ব্যর্থতা ও ক্ষতিতে পর্যবসিত হবে না। পার্থিব জীবনের এ প্রাথমিক পর্যায়ে এর মধ্যে সাফল্যের কোন দিক থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। হতে পারে একজন গোমরাহীর আহবায়ক দুনিয়ায় আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করছে। তার জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। তার গোমরাহী দুনিয়ার বুকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু কুরআনের পরিভাষায় এটা সাফল্য নয় বরং দ্ব্যর্থহীন ক্ষতি ও ব্যর্থতা। আবার এও হতে পারে, একজন সত্যের আহবায়ক দুনিয়ায় কঠিন বিপদের মুখোমুখি হচ্ছে। দুঃখ-কষ্টের ভয়াবহতা তার স্নায়ুতন্ত্রকে অসাড় করে দেবার ফলে অথবা জালেমদের নির্যাতনের শিকার হয়ে সে দুনিয়ার বুক থেকে দ্রুত বিদায় নিচ্ছে। এবং তার আহবানে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু কুরআনের ভাষায় এটা ক্ষতি ও ব্যর্থতা নয় বরং এটাই সফলতা।

এ ছাড়া কুরআনে বারবার একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ অপরাধীদেরকে দ্রুত পাকড়াও করেন না। বরং তাদেরকে সামলে নেবার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেন। এ অবকাশের সুযোগকে যদি তারা অবৈধভাবে ব্যবহার করে আরো বেশী অপকর্ম করতে থাকে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের রশি ঢিলে করে দেয়া হয় এবং অনেক সময় তাদের ওপর অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হয়। এর ফলে তাদের অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় অসৎবৃত্তি বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়। এভাবে নিজেদের অসৎগুণাবলীর কারণে প্রকৃতপক্ষে তাদের যে ধরনের শাস্তি পাওয়া উচিত নিজেদের কাজের ভিত্তিতে তারা ঠিক তেমনি শাস্তির উপযুক্ত হয়। কাজেই কোন মিথ্যা দাবীদারের রশি দীর্ঘ হতে এবং তার ওপর পার্থিব সাফল্যের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকলে তার এ অবস্থাকে তার সত্য ও সঠিক পথাশ্রয়ী হবার প্রমাণ মনে করা মারাত্মক ভুল হবে। কাজেই আল্লাহর অবকাশ ও ক্রমান্বয়ে ঢিল দেবার নীতি যেমন সমস্ত অপরাধীদের জন্য সাধারণভাবে কার্যকর থাকে তেমনি কার্যকর থাকে মিথ্যা দাবীদারদের জন্যও। এ নীতি ও আইন থেকে তাদের ব্যতিক্রম ঘটার কোন প্রমাণ নেই। তারপর শয়তানকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যে অবকাশ দিয়েছেন সেখানেও এ ব্যতিক্রমের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। সেখানে একথা বলা হয়নি যে, তোমার অন্য সমস্ত জালিয়াতীকে অবাধে চলার সুযোগ দেয়া হবে কিন্তু যদি তুমি নিজের পক্ষ থেকে কোন নবী দাঁড় করিয়ে দাও তাহলে এ ধরনের জালিয়াতীকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۸﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿۲۰﴾

এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করছে তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, "তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছো যার অস্তিত্বের কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং যমিনেও না।"[২৪] তারা যে শিরক্ করে তা থেকে তিনি পাক-পবিত্র এবং তার উর্ধে।

শুরুতে সমস্ত মানুষ ছিল একই জাতি। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও মত-পথ তৈরী করে নেয়।[২৫] আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে আগেভাগেই একটি কথা স্থিরীকৃত না হতো তাহলো যে বিষয়ে তারা পরস্পর মতবিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে যেতো।[২৬]

আর এই যে তারা বলে যে, এ নবীর প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন?[২৭] এর জবাবে তুমি তাদেরকে বলে দাও, "গায়েবের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করবো।"[২৮]

কোন ব্যক্তি আমাদের এ বক্তব্যের জওয়াবে সূরা আল হাক্কার ৪৪ থেকে ৪৭ পর্যন্ত আয়াত ক'টি পেশ করতে পারেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۝ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۝

"যদি মুহাম্মাদ নিজে কোন মনগড়া কথা আমার নামে বলতো তাহলে আমি তার হাত ধরে ফেলতাম এবং তার হৃদপিণ্ডের রগ কেটে দিতাম।"

কিন্তু এ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তিকে যথার্থই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী নিযুক্ত করা হয়েছে সে যদি মিথ্যা কথা বানিয়ে অহী হিসেবে পেশ করে তাহলে সংগে সংগেই তাকে পাকড়াও করা হবে। এ থেকে যে স্বকথিত নবীকে পাকড়াও করা হচ্ছে না সে নিশ্চয়ই সাচ্চা নবী, এ সিদ্ধান্ত টানা একটি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর অবকাশ দান ও ঢিল দেয়ার আইনের ব্যাপারে এ আয়াত থেকে যে ব্যতিক্রম প্রমাণ হচ্ছে তা কেবল সাচ্চা নবীর জন্য। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারও এ ব্যতিক্রমের আওতাভুক্ত—এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগই এখানে নেই। সবাই জানে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য সরকার যে আইন তৈরী করেছে তা কেবল তাদের ওপরই প্রযোজ্য হবে যারা যথার্থই সরকারী কর্মচারী। আর যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে পেশ করে তাদের ওপর সরকারী কর্মচারী আইন কার্যকর হবে না। বরং ফৌজদারী আইন অনুযায়ী সাধারণ বদমায়েশ ও অপরাধীদের সাথে যে ব্যবহার করা হয় তাদের সাথেও সেই একই ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়াও সূরা আল হাক্কার এ আয়াতে যা কিছু বলা হয়েছে সেখানেও নবী যাচাই করার কোন মানদণ্ড বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। সেখানে এ উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হয়নি যে, কোন অদৃশ্য হাত এসে যদি অকস্মাত নবুওয়াতের দাবীদারের হৃদপিণ্ডের রগ কেটে দেয় তাহলে মনে করবে সে মিথ্যা নবী অন্যথায় তাকে সাচ্চা বলে মেনে নেবে। নবীর সাচ্চা বা মিথ্যা হবার ব্যাপারটি যদি তার চরিত্র, কর্মকাণ্ড এবং তার উপস্থাপিত দাওয়াতের মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব না হয় তবেই এ ধরনের অযৌক্তিক মানদণ্ড উপস্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

২৪. কোন জিনিসের আল্লাহর জ্ঞানের অন্তরভুক্ত না হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেটির আদতে কোন অস্তিত্বই নেই। কারণ, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সবই আল্লাহর জ্ঞানের অন্তরভুক্ত। কাজেই আল্লাহ তো জানেন না আকাশে ও পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন সুপারিশকারী আছে, এটি আসলে সুপারিশকারীদের অস্তিত্বহীনতার ব্যাপারে একটি কৌতুকপ্রদ বর্ণনা পদ্ধতি। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে যখন কোন সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহর জানা নেই এখন তোমরা কোন্ সুপারিশকারীদের কথা বলছো?

২৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল–বাকারার ২৩০ এবং সূরা আল আনআমের ২৪ টীকা।

২৬. অর্থাৎ মহান আল্লাহ যদি পূর্বাহ্নেই ফায়সালা না করে নিতেন যে, প্রকৃত সত্যকে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না করে তাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক ও স্বতস্ফূর্ত অনুভূতিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন এবং যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ভুল পথে যেতে চাইবে তাকে সে পথে যাবার ও চলার সুযোগ দেয়া হবে, তাহলে প্রকৃত সত্যকে আজই প্রকাশ ও উন্মুক্ত করে দিয়ে সমস্ত মতবিরোধের অবসান ঘটানো যেতে পারতো।

একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এখানে একথাটি বলা হয়েছে। সাধারণভাবে আজো লোকেরা এ বিভ্রান্তিজনিত জটিল সমস্যায় ভুগছে। কুরআন নাযিল হবার সময়ও এ সমস্যাটি তাদের সামনে ছিল। সমস্যাটি হচ্ছে, দুনিয়ায় বহু ধর্ম রয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মের

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

লোকদের অবস্থা হচ্ছে, বিপদের পরে যখন আমি তাদের রহমতের স্বাদ ভোগ করতে দেই তখনই তারা আমার নিদর্শনের ব্যাপারে ধড়িবাজী শুরু করে দেয়।[২৯] *তাদেরকে বলো, "আল্লাহ তাঁর চালাকিতে তোমাদের চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন। তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের সমস্ত চালাকি লিখে রাখছে।"*[৩০] *তিনিই তোমাদের জলে–স্থলে চলাচলের ব্যবস্থা করেন। কাজেই যখন তোমরা নৌকায় চড়ে অনুকূল বাতাসে আনন্দে সফর করতে থাকো, তারপর অকস্মাত বিরুদ্ধ বাতাস প্রবল হয়ে ওঠে, চারদিক থেকে ঢেউয়ের আঘাত লাগতে থাকে এবং আরোহীরা মনে করতে থাকে তারা তরংগ বেষ্টিত হয়ে গেছে তখন সবাই নিজের আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁর কাছে দোয়া করতে থাকে এবং বলতে থাকে, "যদি তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো তাহলে আমরা শোকরগুজার বান্দা হয়ে যাবো।"*[৩১]

লোকেরা তাদের নিজেদের ধর্মকে সত্য মনে করে। এ অবস্থায় এগুলোর মধ্যে কোন্ ধর্মটি সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা তা কেমন করে যাচাই করা যাবে? এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এ ধর্ম বিরোধ ও মতপার্থক্য আসলে পরবর্তীকালের সৃষ্টি। শুরুতে সমগ্র মানবগোষ্ঠী একই ধর্মের আওতাভুক্ত ছিল। সেটিই ছিল সত্য ধর্ম। তারপর এ সত্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করে লোকেরা বিভিন্ন আকীদা–বিশ্বাস ও ধর্ম গড়ে যেতে থাকে। এখন যদি ধর্ম–বৈষম্য ও ধর্ম–বিরোধ দূর করার জন্য তোমাদের মতে বুদ্ধি ও চেতনার সঠিক ব্যবহারের পরিবর্তে শুধুমাত্র আল্লাহর নিজেকে সামনে এসে সত্যকে উন্মুক্ত ও আবরণমুক্ত করে তুলে ধরতে হয়, তাহলে বর্তমান পার্থিব জীবনে তা সম্ভব নয়। দুনিয়ার এ জীবনটাতো

পরীক্ষার জন্য। এখানে সত্যকে না দেখে বুদ্ধি ও বিবেচনার সাহায্যে তাকে চিনে নেয়ার পরীক্ষা হয়ে থাকে।

২৭. অর্থাৎ এ ব্যাপারে নিদর্শন যে, তিনি যথার্থই সত্য নবী এবং যা কিছু তিনি পেশ করছেন তা পুরোপুরি ঠিক। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, নিদর্শন পেশ করার দাবী তারা এ জন্য করেনি যে, তারা সাচ্চা দিলে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করতে এবং তার দাবী অনুযায়ী নিজেদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক জীবন তথা নিজেদের সমগ্র জীবন ঢেলে সাজাতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নবীর সমর্থনে এ পর্যন্ত তারা এমন কোন নিদর্শন দেখেনি যা দেখে তাঁর নবুওয়াতের প্রতি তাদের বিশ্বাস জন্মাতে পারে। কেবলমাত্র এ জন্যই তারা হাত পা গুটিয়ে বসেছিল। আসলে নিশানীর এ দাবী শুধুমাত্র ঈমান না আনার জন্য একটি বাহানা হিসেবে পেশ করা হচ্ছিল। তাদেরকে যাই কিছু দেখানো হতো তা দেখার পরও তারা একথাই বলতো, আমাদের কোন নিশানীই দেখানো হয়নি। কারণ তারা ঈমান আনতে চাচ্ছিল না। দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক কাঠামো অবলম্বন করে প্রবৃত্তির খায়েশ ও পছন্দ অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা কাজ করার এবং যে জিনিসের মধ্যে স্বাদ বা লাভ অনুভব করে তার পেছনে দৌড়াবার যে স্বাধীনতা তাদের ছিল তা পরিত্যাগ করে তারা এমন কোন অদৃশ্য সত্য (তাওহীদ ও আখেরাত) মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যা মেনে নেবার পর তাদের সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও স্বতন্ত্র নৈতিক বিধানের বাঁধনে বেঁধে ফেলতে হতো।

২৮. আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তা আমি পেশ করে দিয়েছি। আর যা তিনি নাযিল করেননি তা আমার ও তোমাদের জন্য "অদৃশ্য" এর ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইখতিয়ার নেই। তিনি চাইলে তা নাযিল করতে পারেন আবার চাইলে নাও করতে পারেন। এখন আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেননি তা আগে তিনি নাযিল করুন—একথার ওপর যদি তোমাদের ঈমান আনার বিষয়টি আটকে থাকে তাহলে তোমরা তার অপেক্ষায় বসে থাকো। আমিও দেখবো, তোমাদের এ জিদ পুরো করা হয় কিনা।

২৯. ১১-১২ আয়াতে যে দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে এখানে আবার তারই প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর মানে, তোমরা কোন্ মুখে নিদর্শন চাইছো? এ কিছুদিন আগে তোমরা একটি দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছিলে। তাতে তোমরা নিজেদের মাবুদদের থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলে। তোমরা এ মাবুদদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেদের সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছিলে। এদের সম্পর্কে তোমরা বলে বেড়াতে ঃ "অমুক বেদী-মূলে অর্ঘ পেশ করা মাত্রই ফল পাওয়া যায়" এবং "অমুক দরগায় সিন্নি দিলে নির্ঘাত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।" এবার তোমরা দেখে নিয়েছো, এসব তথাকথিত উপাস্য ও মাবুদদের হাতে কিছুই নেই। একমাত্র আল্লাহই সমস্ত ক্ষমতার মালিক। এ জন্যই তো তোমরা সর্বশেষে একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছেন তার সত্যতার প্রতি তোমাদের মনে বিশ্বাস জন্মাতো, এ নিদর্শনটিই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না? কিন্তু এ নিদর্শন দেখে তোমরা কি করেছো? যখনই দুর্ভিক্ষের অবসান হয়েছে এবং আল্লাহর রহমতের বারি সিঞ্চনে তোমাদের বিপদ দূরীভূত হয়েছে তখনই তোমরা এ বিপদ আসার ও দূরীভূত হবার হাজারটা ব্যাখ্যা (চালাকি) করতে শুরু করেছো। এভাবে তোমরা

فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ
اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ
اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ
وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰۤى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ
اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا
كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারাই সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের এ বিদ্রোহ উলটা তোমাদের বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছে। দুনিয়ার কয়েকদিনের আরাম আয়েশ (ভোগ করে নাও), তারপর আমার দিকেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তোমরা কি কাজে লিপ্ত ছিলে তা তখন তোমাদের আমি জানিয়ে দেবো। দুনিয়ার এ জীবন (যার নেশায় মাতাল হয়ে তোমরা আমার নিশানীগুলোর প্রতি উদাশীন হয়ে যাচ্ছো) এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন আকাশ থেকে আমি পানি বর্ষণ করলাম, তার ফলে যমীনের উৎপাদন, যা মানুষ ও জীব–জন্তু খায়, ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে গেল। তারপর ঠিক এমন সময় যখন যমীন তার ভরা বসন্তে পৌছে গেল এবং ক্ষেতগুলো শস্যশ্যামল হয়ে উঠলো। আর তার মালিকরা মনে করলো এবার তারা এগুলো ভোগ করতে সক্ষম হবে, এমন সময় অকস্মাত রাতে বা দিনে আমার হুকুম এসে গেলো। আমি তাকে এমনভাবে ধ্বংস করলাম যেন কাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবে আমি বিশদভাবে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করে থাকি তাদের জন্য যারা চিন্তা–ভাবনা করে।

তাওহীদকে মেনে নেয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং নিজেদের শিরকের ওপর অবিচল থাকতে চাও। এখন যারা নিজেদের বিবেককে এভাবে নষ্ট করে দিয়েছে তাদেরকে কোন্ ধরনের নিদর্শন দেখানো হবে এবং তা দেখানোর ফায়দা বা কি হবে?

৩০. আল্লাহর চালাকি মানে হচ্ছে, যদি তোমরা সত্যকে না মেনে নাও এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের মনোভাবের পরিবর্তন না করো তাহলে তিনি তোমাদের এ বিদ্রোহাত্মক

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾

(তোমরা এ অস্থায়ী জীবনের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হচ্ছো) আর আল্লাহ তোমাদের শান্তির ভুবনের দিকে আহবান জানাচ্ছেন।[৩২] (হেদায়াত তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত) যাকে তিনি চান সোজা পথ দেখান। যারা কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো বেশী।[৩৩] কলংক কালিমা বা লাঞ্ছনা তাদের চেহারাকে আবৃত করবে না। তারা জান্নাতের হকদার, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর যারা খারাপ কাজ করেছে, তারা তাদের খারাপ কাজ অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে।[৩৪] লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। আল্লাহর হাত থেকে তাদেরকে বাঁচাবার কেউ থাকবে না। তাদের চেহারা যেন আঁধার রাতের কালো আবরণে আচ্ছাদিত হবে।[৩৫] তারা দোজখের হকদার, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

নীতি অবলম্বন করে চলার সুযোগ করে দেবেন। তোমরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের রিযিক ও অনুগ্রহ দান করতে থাকবেন। এর ফলে তোমাদের জীবন সামগ্রী এভাবেই তোমাদের মোহান্ধ করে রাখবে। এ মোহান্ধতার মধ্যে তোমরা যা কিছু করবে আল্লাহর ফেরেশতারা নীরবে বসে বসে তা লিখে নিতে থাকবেন। এভাবে এক সময় অকস্মাত মৃত্যুর পয়গাম এসে যাবে। তখন নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব দেবার জন্য তোমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।

৩১. প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রয়েছে তাওহীদের সত্যতার নিশানী। যতদিন উপায়-উপকরণ অনুকূল থাকে ততদিন মানুষ আল্লাহকে ভুলে পার্থিব জীবন নিয়ে অহংকারে মত্ত হয়ে থাকে। আর উপায় উপকরণ প্রতিকূল হয়ে গেলে এবং এ সংগে যেসব সহায়ের ভিত্তিতে সে পৃথিবীতে বেঁচেছিল সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেলে তারপর কট্টর মুশরিক ও নাস্তিকের মনেও এ সাক্ষ ধ্বনিত হতে থাকে যে, কার্যকারণের এ সমগ্র জগতের ওপর কোন আল্লাহর কর্তৃত্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তিনি একক আল্লাহ এবং তিনি শক্তিশালী ও বিজয়ী (আনআম ২৯ টীকা দেখুন)।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

যেদিন আমি তাদের সবাইকে এক সাথে (আমার আদালতে) একত্র করবো তারপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে বলবো, থেমে যাও তোমারাও এবং তোমাদের তৈরী করা শরীকরাও। তারপর আমি তাদের মাঝখান থেকে অপরিচিতির আবরণ সরিয়ে নেবো।[৩৬] তখন তারা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে, "তোমরা তো আমাদের ইবাদাত করতে না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ যথেষ্ট, (তোমরা আমাদের ইবাদাত করতে থাকলেও) আমরা তোমাদের এ ইবাদাত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।"[৩৭] সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের স্বাদ নেবে। সবাইকে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তারা যে সমস্ত মিথ্যা তৈরী করে রেখেছিল তা সব উধাও হয়ে যাবে।

৩২. অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবন যাপন করার এমন পদ্ধতির দিকে তোমাদের আহবান জানানো, যা আখেরাতের জীবনে তোমাদের দারুস সালাম বা শান্তির ভবনের অধিকারী করে। দারুস সালাম বলতে জান্নাত বুঝানো হয়েছে এবং এর মানে হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তার ভবন বা গৃহ। এমন জায়গাকে দারুস সালাম বলা হয়েছে যেখানে কোন বিপদ, ক্ষতি, দুঃখ ও কষ্ট নেই।

৩৩. তারা কেবল তাদের নেকী অনুযায়ীই প্রতিদান পাবে না বরং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে পুরস্কৃতও করবেন।

৩৪. অর্থাৎ নেককারদের মোকাবিলায় বদকারদের সাথে যে ব্যবহার করা হবে তা হচ্ছে এই যে, তারা যে পরিমাণ খারাপ কাজ করেছে তাদেরকে সেই পরিমাণ শাস্তি দেয়া হবে। অপরাধের চাইতে একটু সামান্য পরিমাণ বেশী শাস্তিও তাদেরকে দেয়া হবে না। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা নামল ১০৯ (ক) টীকা)।

৩৫. অর্থাৎ পাকড়াও হবার এবং উদ্ধার পাওয়ার সকল আশা তিরোহিত হবার পর অপরাধীদের চেহারার ওপর যে অন্ধকার ছেয়ে যায়।

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ
مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ
حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

৪ রুকূ'

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, "কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দেয়? এই শুনার ও দেখার শক্তি কার কর্তৃত্বে আছে? কে প্রাণহীন থেকে সজীবকে এবং সজীব থেকে প্রাণহীনকে বের করে? কে চালাচ্ছে এই বিশ্ব–ব্যবস্থাপনা? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বলো, তবুও কি তোমরা (সত্যের বিরোধী পথে চলার ব্যাপারে) সতর্ক হচ্ছো না? তাহলে তো এ আল্লাহই তোমাদের আসল রব।[৩৮] কাজেই সত্যের পরে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি বাকি আছে? সুতরাং তোমরা কোন্‌দিকে চালিত হচ্ছো?[৩৯] (হে নবী! দেখো) এভাবে নাফরমানীর পথ অবলম্বনকারীদের ওপর তোমার রবের কথা সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।[৪০]

৩৬. মূল আয়াতে বলা হয়েছে فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ কোন কোন তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন ঃ আমরা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করবো, যাতে কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা পরস্পরকে মর্যাদা না দেয়। কিন্তু এ অর্থ প্রচলিত আরবী বাকরীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আরবী বাকরীতি অনুযায়ী এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবো অথবা তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেবো। এ অর্থ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আমরা এ বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছি যে, "তাদের মধ্য থেকে আমি অপরিচিতির পরদা সরিয়ে দেবো।" অর্থাৎ মুশরিকরা ও তাদের উপাস্যরা সামনাসামনি অবস্থান করবে এবং উভয় দলের পরিচিতি উভয়ের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। মুশরিকরা জানবে, এদেরকেই আমরা দুনিয়ায় মাবুদ বানিয়ে রেখেছিলাম। অন্যদিকে তাদের মাবুদরাও জানবে এরাই তাদেরকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছিল।

৩৭. অর্থাৎ এমন সব ফেরেশতা যাদেরকে দুনিয়ায় দেবদেবী বানিয়ে পূজা করা হয়েছে এবং এমন সব জিন, রূহ, পূর্ববর্তী মনীষী, পূর্ব পুরুষ, নবী, অলী, শহীদ ইত্যাদি যাদেরকে আল্লাহর গুণাবলীতে অংশীদার করে এমন অধিকারসমূহ দান করা হয়েছে যেগুলো

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ٚ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের তৈরী করা শরীকদের মধ্যে কেউ আছে কি যে সৃষ্টির সূচনা করে আবার তার পুনরাবৃত্তিও করে?—বলো, একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করে এবং তার পুনরাবৃত্তিও ঘটান,[৪১] কাজেই তোমরা কোন্ উল্টো পথে চলে যাচ্ছো?[৪২]

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের তৈরী করা শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে?[৪৩] বলো, একমাত্র আল্লাহই সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তাহলে বলো, যিনি সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তিনি আনুগত্য লাভের বেশী হকদার না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না—সে বেশী হকদার? তোমাদের হয়েছে কি? কেমন উল্টো সিদ্ধান্ত করে বসছো?

আসলে তাদের বেশীরভাগ লোকই নিছক আন্দাজ-অনুমানের পেছনে চলছে।[৪৪] অথচ আন্দাজ-অনুমান দ্বারা সত্যের প্রয়োজন কিছুমাত্র মেটে না। তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন।

ছিল আল্লাহর অধিকার। তারা সেখানে নিজেদের পূজারীদেরকে পরিষ্কার বলে দেবে, তোমরা যে আমাদের পূজা করতে তা তো আমরা জানতামই না। তোমাদের কোন দোয়া, আকুতি, আবেদন, নিবেদন, ফরিয়াদ, নযরানা, মানত, শিরনী, প্রশংসা, স্তবস্তুতি, জপতপ এবং কোন সিজদা, বেদী চুম্বন ও দরগাহ প্রদক্ষিণ আমাদের কাছে পৌঁছেনি।

৩৮. অর্থাৎ যদি এসবই আল্লাহর কাজ হয়ে থাকে, যেমন তোমরা নিজেরাও স্বীকার করে থাকো, তাহলে তো প্রামাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত মালিক, প্রতিপালক, প্রভু এবং তোমাদের বন্দেগী ও ইবাদাতের হকদার। কাজেই অন্যেরা, যাদের এসব কাজে কোন অংশ নেই তারা কেমন করে রবের দায়িত্বে শরীক হয়ে গেলো।

৩৯. মনে রাখতে হবে, এখানে সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে একথা বলা হচ্ছে না যে, তোমরা কোন্ দিকে চলে যাচ্ছো? বরং বলা হচ্ছে, "তোমরা কোন্ দিকে চালিত হচ্ছো?" এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এমন কিছু বিভ্রান্তকারী ব্যক্তি বা দল আছে যারা লোকদেরকে সঠিক দিক থেকে টেনে নিয়ে ভুল দিকে ফিরিয়ে দেয়। তাই মানুষকে আবেদন জানানো হচ্ছে, তোমরা অন্ধ হয়ে ভুল পথপ্রদর্শনকারীদের পেছনে ছুটে যাচ্ছো কেন? নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করে চিন্তা করছো না কেন যে, প্রকৃত সত্য যখন এই, তখন তোমাদেরকে কোন্ দিকে চালিত করা হচ্ছে? এরূপ ক্ষেত্রে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় লোকদেরকে এ ধরনের প্রশ্ন করার রীতি অনুসৃত হয়েছে। এসব জায়গায় বিভ্রান্তকারীদের নাম না নিয়ে তাদেরকে উহ্য বা পর্দান্তরালে রাখা হয়েছে, যাতে তাদের ভক্ত-অনুরক্তরা ঠাণ্ডা মাথায় নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং কোন ব্যক্তি একথা বলে তাদেরকে উত্তেজিত করার এবং তাদের চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভারসাম্য বিনষ্ট করার সুযোগ না পায় যে, দেখো তোমাদের মুরব্বী ও নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করা হচ্ছে এবং তাদেরকে আঘাত দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে প্রচার কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এ ব্যাপারে সজাগ থাকা উচিত।

৪০. অর্থাৎ এমনি ধরনের সব স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ও সহজবোধ্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে বক্তব্য বুঝানো হয় কিন্তু যারা মানবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছে তারা একগুঁয়েমীর বশবর্তী হয়ে কোন প্রকারেই মেনে নিচ্ছে না।

৪১. সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে মুশরিকরাও স্বীকার করতো যে, এটা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তাঁর সাথে যাদেরকে তারা শরীক করে তাদের কারো এ কাজে কোন অংশ নেই। আর সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ প্রথমে যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর পক্ষেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু যে প্রথমবারই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি সে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারে কেমন করে? এটি যদিও একটি অকাট্য যুক্তিসংগত কথা এবং মুশরিকদের মন ও ভেতর থেকে এর সত্যতার সাক্ষ দিতো তবুও তারা শুধুমাত্র এ কারণে একথা স্বীকার করতে ইতস্তত করতো যে, এটা মেনে নিলে পরকাল অস্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণেই পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাবে তো আল্লাহ বললেন যে, তারা নিজেরাই বলবে যে, এটা আল্লাহর কাজ। কিন্তু এখানে এর পরিবর্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হচ্ছে, তুমি জোরালো কণ্ঠে বলে দাও প্রথমবারের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি সবই একমাত্র আল্লাহর কাজ।

৪২. অর্থাৎ যখন তোমাদের জীবনের সূচনার প্রান্তভাগ আল্লাহর হাতে এবং শেষের প্রান্ত ভাগও তাঁরই হাতে। তখন নিজেদের কল্যাণকামী হয়ে একবার ভেবে দেখো, তোমাদের কিভাবে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, এ দুই প্রান্তের মাঝখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য জন তোমাদের বন্দেগী ও নযরানা লাভের অধিকার লাভ করেছে?

৪৩. এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। একটু বিস্তারিতভাবে এটিকে বুঝে নিতে হবে। দুনিয়ায় মানুষের প্রয়োজন শুধুমাত্র তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও জীবন যাপনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করা এবং বিপদ-আপদ ও ক্ষতি থেকে সংরক্ষিত থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবন যাপন করার সঠিক পদ্ধতি জানাও তার একটি প্রয়োজন (এবং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন)। তার আরো জানতে হবে, নিজের ব্যক্তিগত সত্তার

সাথে, নিজের শক্তি, সামর্থ, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার সাথে, পৃথিবীতে যে উপায়–উপকরণ ও সাজ–সরঞ্জাম তার কর্তৃত্বাধীনে আছে তার সাথে, যে অসংখ্য মানুষের সাথে বিভিন্নভাবে তাকে জড়িত হতে হয় তাদের সাথে এবং সামগ্রিকভাবে যে বিশ্ব ব্যবস্থার আওতাধীনে তাকে কাজ করতে হয় তার সাথে তার কি ব্যবহার করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। এটা জানা এ জন্য প্রয়োজন যেন তার জীবন সামগ্রিকভাবে সফলকাম হয় এবং তার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম বিভিন্ন ভুল পথে নিয়োজিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। এ সঠিক পদ্ধতির নাম হক বা সত্য আর যে পথনির্দেশনা মানুষকে এ পদ্ধতির দিকে নিয়ে যায় সেটিই 'হকের হেদায়াত' বা 'সত্যের পথনির্দেশনা।' কুরআন সমস্ত মুশরিককে এবং নবীর শিক্ষা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এমন সকল লোককে জিজ্ঞেস করে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের বন্দেগী করো তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যার মাধ্যমে তোমরা 'সত্যের পথনির্দেশনা' লাভ করতে পার? অবশ্যি সবাই জানে, এর জবাব 'না' ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের বন্দেগী করে তারা দু'টি বড় বড় ভাগে বিভক্ত।

এক ঃ দেব–দেবী, জীবিত ও মৃত মানুষ, যাদের পূজা করা হয়। তারা অলৌকিক পদ্ধতিতে মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করবে এবং তাকে বিপদ–আপদ থেকে রক্ষা করবে–এ উদ্দেশ্যেই মানুষ তাদের দিকে রুজু হয়। আর সত্যের পথনির্দেশনার ব্যাপারে বলা যায়, এ জিনিসটা কখনো ঐসব দেব–দেবী ইত্যাদির পক্ষ থেকে আসেওনি, মুশরিকরাও কখনো এ জন্য তাদের কাছে ধর্ণা দেয়নি এবং কোন মুশরিক একথা বলেও না যে, তার দেবতারা তাকে নৈতিকতা, সামাজিক জীবন–যাপন পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক বিধান, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন–আদালত ইত্যাদির মূলনীতি শেখায়।

দুই ঃ এমন ধরনের মানুষ যাদের রচিত নীতিমালা ও আইনের আনুগত্য করা হয়। এ দিক দিয়ে তারা যে নেতা এবং পথপ্রদর্শক, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তারা কি সত্যপন্থী নেতা বা নেতা হতে পারে? মানুষের জীবন যাপনের সঠিক মূলনীতি রচনা করার জন্য যেসব তত্ব জানা প্রয়োজন তাদের কেউ কি সেসব সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখে? মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো যে বিস্তীর্ণ পরিসরে ছড়িয়ে আছে, তাদের কারো দৃষ্টি কি তার সবটার ওপর পৌছে যায়? তাদের কেউ কি এমন সব দুর্বলতা, স্বার্থ প্রীতি, একদেশদর্শিতা, গোষ্ঠীপ্রীতি, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আশা–আকাংখা, লোভ–লালসা ও ঝোঁক প্রবণতা থেকে মুক্ত যা মানুষের সমাজ জীবনের জন্য ন্যায়নিষ্ঠ আইন প্রণয়নের পথে বাধা হয়ে থাকে? জবাব যদি না বাচক হয় এবং এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোন সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এ প্রশ্নগুলোর হাঁ বাচক জবাব দিতে পারবেন না তাহলে এরা কি সত্য পথনির্দেশনার উৎস হতে পারে?

এ কারণে কুরআন এ প্রশ্ন করে, হে লোকেরা! তোমাদের এ ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক প্রভুদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তোমাদের সত্য সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করতে পারে? ওপরের প্রশ্নগুলোর সাথে মিলে এ শেষ প্রশ্নটি দীন ও ধর্মের সমগ্র বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়। মানুষের সমস্ত প্রয়োজন দুই ধরনের, এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে, তার একজন প্রতিপালক হবে, একজন আশ্রয়দাতা হবে, একজন প্রার্থনা শ্রবণকারী ও অভাব পূরণকারী হবে। এ কার্যকারণের জগতের অস্থায়ী ও অস্থিতিশীল সহায়গুলোর মধ্যে

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۗ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ۗ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ۗ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤٠﴾

আর এ কুরআন আল্লাহর অহী ও শিক্ষা ছাড়া রচনা করা যায় না। বরং এ হচ্ছে যা কিছু আগে এসেছিল তার সত্যায়ন এবং আল কিতাবের বিশদ বিবরণ।[৪৫] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি বিশ্ব–জাহানের অধিকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে।

তারা কি একথা বলে যে, পয়গম্বর নিজেই এটি রচনা করেছে? বলো, "তোমাদের এ দোষারোপের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে এরই মতো একটি সূরা রচনা করে আনো এবং এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে যাকে ডাকতে পারো সাহায্যের জন্য ডেকে নাও।"[৪৬] আসল ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি এদের জ্ঞানের আওতায় আসেনি এবং যার পরিণামও এদের সামনে নেই তাকে এরা (অনর্থক আন্দাজে) মিথ্যা বলে।[৪৭] এমনিভাবে এদের আগের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। কাজেই দেখো জালেমদের পরিণাম কী হয়েছে! তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ঈমান আনবে এবং কিছু লোক ঈমান আনবে না। আর তোমার রব এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালভাবেই জানেন।[৪৮]

অবস্থান করে সে তার স্থায়ী সহায় অবলম্বন করতে পারবে। বস্তুত ওপরের প্রশ্নগুলো এ ফায়সালা করে দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারবে না। আর এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে এই যে, এমন একজন পথপদর্শক থাকতে হবে যিনি দুনিয়ায় বসবাস করার সঠিক নীতি নির্ধারণ করে দেবেন এবং যার দেয়া জীবন বিধানের আনুগত্য পরিপূর্ণ আস্থার সাথে করা যেতে পারে। এই শেষ প্রশ্নটি এ ব্যাপারটিরও মীমাংসা করে দিয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই সেই পথপ্রদর্শক হতে পারেন। এরপরে একমাত্র জিদ

ও হঠকারিতা ছাড়া মানুষের মুশরিকী ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) তামাদ্দুনিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির সাথে লেপটে থাকার আর কোন কারণ থাকে না।

৪৪. অর্থাৎ যারা বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তন করেছে, দর্শন রচনা করেছে এবং জীবন বিধান তৈরী করেছে, তারাও এসব কিছু জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় বরং আন্দাজ–অনুমানের ভিত্তিতে করেছে। আর যারা এসব ধর্মীয় ও দীনী নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছে তারাও জেনেবুঝে নয় বরং নিছক অনুমানের ভিত্তিতে তাদের পেছনে চলেছে। কারণ তারা মনে করে, এত বড় বড় লোকেরা যখন একথা বলেন এবং আমাদের বাপ–দাদারা এসব মেনে আসছেন আবার এ সংগে দুনিয়ার বিপুল সংখ্যক লোক এগুলো মেনে নিয়ে এ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই এই লোকেরা ঠিক কথাই বলে থাকবেন।

৪৫. "যা কিছু আগে এসে গিয়েছিল তার সত্যায়ণ"—অর্থাৎ শুরু থেকে নবীদের মাধ্যমে মানুষকে যে মৌলিক শিক্ষা দান করা হতে থাকে এ কুরআন তা থেকে সরে গিয়ে কোন নতুন জিনিস পেশ করছে না। বরং তার সত্যতা প্রমাণ করছে এবং তাকে পাকাপোক্ত করছে। যদি এটা কোন নতুন ধর্মপ্রবর্তকের মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী ক্ষমতার ফসল হতো, তাহলে অবশ্যি এর মধ্যে পুরাতন সত্যগুলোর সাথে কিছু নিজের অভিনব বক্তব্য মিশিয়ে দিয়ে এর একটা অভিনব ও বিশিষ্ট চরিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যেতো।

"আল কিতাবের বিশদ বিবরণ"—অর্থাৎ সমস্ত আসমানী কিতাবের সারমর্ম যে মৌলিক শিক্ষাবলীর সমষ্টি, সেগুলো এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যুক্তি–প্রমাণ সহকারে উপদেশ দান ও বুঝাবার ভংগীতে, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং বাস্তব অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৬. সাধারণভাবে লোকেরা এ চ্যালেঞ্জটিকে নিছক কুরআনের ভাষাশৈলী অলংকার ও সাহিত্য সুষমার দিক দিয়ে ছিল বলে মনে করে। কুরআনের অলৌকিকতার ওপর যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে তার ফলে এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কুরআন যে, তার অনন্য ও অতুলনীয় হবার দাবীর ভিত্তি নিছক নিজের শাব্দিক সৌন্দর্য সুষমার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেনি, এ ধরনের সীমিত ব্যাপার থেকে কুরআনের মর্যাদা অনেক উর্ধে। নিসন্দেহে ভাষাশৈলীর দিক দিয়েও কুরআন নজিরবিহীন। কিন্তু মূলত যে জিনিসটির ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, কোন মানবিক মেধা ও প্রতিভা এহেন কিতাব রচনা করতে পারে না, সেটি হচ্ছে তার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা। এর মধ্যে অলৌকিকতার যেসব দিক রয়েছে এবং যেসব কারণে বলা যায় যে, এটি নিসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা কিতাব এবং কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের কিতাব রচনা করা অসম্ভব, তা এ কুরআনেরই বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের বর্ণনা ইতিপূর্বে যেখানেই এসেছে সেখানে আমরা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এসেছি এবং পরবর্তিতেও করে যেতে থাকবো। তাই কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে এর আলোচনা করা হলো না। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আত–তূর টীকা ২৬, ২৭)।

৪৭. কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার দু'টি ভিত্তি হতে পারতো। গবেষণা করে তথ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যেতো যে, এটি বানোয়াট ও নকল। অথবা এতে যে

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

৫ রুকূ'

যদি তারা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তুমি বলে দাও, "আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যা কিছু করছো তার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।"[৪৯]

তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমার কথা শোনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শুনাবে, তারা কিছু না বুঝলেও?[৫০] তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমাকে দেখে। কিন্তু তুমি কি অন্ধদের পথ দেখাবে, তারা কিছু না দেখতে পেলেও?[৫১] আসলে আল্লাহ মানুষের প্রতি জুলুম করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে।[৫২]

সত্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং যে খবর দেয়া হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণিত হলে তার ভিত্তিতে এ মিথ্যা সাব্যস্তকরণকে যুক্তিসঙ্গত মনে করা যেতো। কিন্তু মিথ্যা সাব্যস্ত করার এ দু'টি কারণের মধ্য থেকে কোন একটি কারণও এখানে বর্তমান নেই। কোন ব্যক্তি একথা বলতে পারে না যে, এ কিতাবটি কেউ নিজে তৈরী করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে, একথা সে তথ্য–জ্ঞানের ভিত্তিতে জানে। কেউ অদৃশ্যের পরদা উন্মোচন করে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখেও নেয়নি যে, সত্যিই সেখানে বহুসংখ্যক খোদা রয়েছে এবং এ কিতাবটিতে অনর্থক শুধুমাত্র একজন ইলাহর কথা শুনানো হচ্ছে। অথবা আসলে আল্লাহ, ফেরেশতা, অহী ইত্যাদির কোন সত্যতাই নেই এবং এ কিতাবে অযথা এসব গালগল্প বানিয়ে নেয়া হয়েছে। কেউ মরে গিয়েও দেখে নেয়নি যে, এ কিতাবে বর্ণিত পরকালীন জীবন এবং তার হিসাব নিকাশ ও শাস্তি–পুরস্কারের সমস্ত কাহিনীই মিথ্যা। কিন্তু এ সত্ত্বেও নিছক সন্দেহ ও ধারণার ভিত্তিতে এমনভাবে একে মিথ্যা বলা হচ্ছে যে, তাতে মনে হয় যেন এটি যে নকল ও মিথ্যা তা তাত্ত্বিকভাবেই চূড়ান্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে।

৪৮. যারা ঈমান আনে না তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আল্লাহ এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে খুব ভাল করেই জানেন।" অর্থাৎ নবীর কথা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না বলে সদিচ্ছা সহকারেই আমরা তা মেনে নিতে পারছি না। এরূপ অজুহাত দিয়ে তারা দুনিয়াবাসীর মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু মনের গোপন কথা যিনি জানেন সেই আল্লাহ তাদের প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন, সে কিভাবে নিজের হৃদয় ও মস্তিষ্কের দরজায় তালা এঁটে দিয়েছে, নিজেই নিজেকে গাফলতির সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে, নিজের বিবেকের কণ্ঠরোধ করেছে, নিজের অন্তরে সত্যের সাক্ষকে দমিয়ে দিয়েছে এবং নিজের মস্তিষ্ক থেকে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। সে শুনেও শোনেনি। বুঝেও না বুঝার ভান করেছে। সত্যের মোকাবিলায় নিজের অন্ধ বিদ্বেষকে, নিজের পার্থিব স্বার্থকে নিজের বাতিলের সাথে সংঘর্ষমুখর স্বার্থকে এবং নিজের নফসানী খাহেশ ও আগ্রহকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই সে "নিষ্পাপ ভ্রষ্টাচারী" নয় বরং প্রকৃত অর্থে বিপর্যয়কারী।

৪৯. অর্থাৎ অযথা বিরোধ ও কূটতর্ক করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি আমি মিথ্যা আরোপ করে থাকি তাহলে আমার কাজের জন্য আমি দায়ী হবো। এর কোন দায়ভার তোমাদের ওপর পড়বে না। আর যদি তোমরা সত্য কথাকে মিথ্যা বলে থাকো তাহলে এর মাধ্যমে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং এর দ্বারা তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করছো।

৫০. শ্রবণ কয়েক রকমের হতে পারে। পশুরা যেমন আওয়াজ শোনে তেমনি এক ধরনের শ্রবণ আছে। আবার আর এক ধরনের শ্রবণ হয়, যার মধ্যে অর্থের দিকে নজর থাকে এবং এমনি ধরনের একটা প্রবণতা দেখা দেয় যে, যুক্তিসংগত কথা হলে মেনে নেয়া হবে। যারা কোন প্রকার বদ্ধ ধারণা বা অন্ধ বিদ্বেষে আক্রান্ত থাকে এবং যারা আগে থেকেই ফায়সালা করে বসে থাকে যে, নিজের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা–বিশ্বাস ও পদ্ধতিসমূহের বিরুদ্ধে এবং নিজের প্রবৃত্তির আশা–আকাংখা ও আগ্রহ বিরোধী কথা যত যুক্তিসংগতই হোক না কেন মেনে নেবো না, তারা সবকিছু শুনেও আসলে কিছুই শোনে না। তেমনিভাবে যারা দুনিয়ায় পশুদের মতো উদাসীন জীবন যাপন করে, চারদিকে বিচরণ করা ছাড়া আর কিছুতেই যাদের আগ্রহ নেই অথবা যারা প্রবৃত্তির স্বাদ–আনন্দের পেছনে এমন পাগলের মতো দৌঁড়ায় যে, তারা নিজেরা যা কিছু করছে তার ন্যায় বা অন্যায় হবার কথা চিন্তা করে না তারা শুনেও শোনে না। এ ধরনের লোকদের কান বধির হয় না কিন্তু মন বধির হয়।

৫১. ওপরের বাক্যাংশে যে কথা বলা হয়েছে এখানেও সেই একই কথা বলা হয়েছে। চোখের দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকলে কোন লাভ নেই, চোখ দিয়ে তো পশুরাও দেখে। আসল জিনিস হচ্ছে মনের দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকা। এ জিনিসটি যদি কারোর অর্জিত না হয়ে থাকে তাহলে সে সবকিছু দেখেও কিছুই দেখে না।

এ আয়াত দু'টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তিনি যাদের সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ উচ্চারণ করা হচ্ছে। আর এ নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য নিছক নিন্দাবাদ নয় বরং বিদ্রূপবানে বিদ্ধ করে তাদের সুপ্ত মনুষত্বকে জাগিয়ে তোলা এবং চোখ ও কানের মাধ্যমে তাদের মনের ভেতরে প্রবেশ করার পথ খুলে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এভাবে যুক্তিসঙ্গত কথা ও সমবেদনাপূর্ণ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

(আজ তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে মত্ত হয়ে আছে) আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে একত্র করবেন সেদিন (এ দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে এমন ঠেকবে) যেন মনে হবে তারা পরস্পরের মধ্যে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে নিছক একদণ্ডের জন্য অবস্থান করেছিল।[৫৩] (সে সময় নিশ্চিতভাবে জানা যাবে) প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[৫৪] এবং তারা মোটেই সঠিক পথে ছিল না। তাদেরকে যেসব খারাপ পরিণামের ভয় দেখাচ্ছি সেগুলোর কোন অংশ যদি তোমার জীবদ্দশায় দেখিয়ে দেই অথবা এর আগেই তোমাকে উঠিয়ে নেই, সর্বাবস্থায় তাদের আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে এবং তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তার সাক্ষী।

প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল রয়েছে।[৫৫] যখন কোন উম্মতের কাছে তাদের রসূল এসে যায় তখন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে তাদের বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়া হয় এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হয় না।[৫৬]

উপদেশ সেখানে পৌঁছতে পারবে। এ বর্ণনা পদ্ধতিটি কিছুটা এমনি ধরনের যেমন কোন সৎলোক অসৎলোকদের মাঝে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সহকারে বাস করতে থাকে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দরদসহকারে তারা যে পতনশীল অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে সে সম্পর্কে তাদের মনে অনুভূতি জাগাতে থাকে। তাদের জীবন যাপন প্রণালীতে কি কি গলদ আছে এবং সঠিক জীবন যাপন প্রণালী কি তা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ও যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাঁর পূত–পবিত্র জীবন থেকে কেউ শিক্ষা নিচ্ছে না এবং তার এ শুভাকাংখামূলক উপদেশকেও কেউ গ্রাহ্য করছে না। এ অবস্থায় যখন সে তাদেরকে বুঝাবার কাজে ব্যস্ত রয়েছে এবং তারা তার কথাগুলোর প্রতি কর্ণপাত করছে না ঠিক এমন সময় তার কোন বন্ধু এসে তাকে বলে, আরে ভাই এ তুমি কি করছো? তুমি এমন লোকদের শুনাচ্ছো যারা কানে শুনে না এবং এমন লোকদের পথ দেখাচ্ছো যারা চোখে দেখে না। এদের মনের কানে তালা লেগেছে এবং এদের হৃদয়ের

চোখ কানা হয়ে গেছে। এ সৎলোককে তার সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখা তার বন্ধুর একথা বলার উদ্দেশ্য নয় বরং তার উদ্দেশ্য হয়, হয়তো এ বিদ্রূপ ও তিরস্কারের ফলে অচেতন লোকদের কিছুটা চেতনা ফিরে আসবে।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ তো তাদের কানও দিয়েছেন এবং মনও দিয়েছেন। হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখার ও বুঝার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন কোন জিনিস তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাদের দিতে কার্পণ্য করেননি। কিন্তু লোকেরা প্রবৃত্তির দাসত্ব ও দুনিয়ার প্রেমে মত্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের চোখ কানা করে নিয়েছে, কানে তালা লাগিয়েছে এবং অন্তরকে বিকৃত করে ফেলেছে। ফলে তার মধ্যে ভাল-মন্দের পার্থক্য, ভুল-নির্ভুলের জ্ঞান এবং বিবেকের সজীবতার কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

৫৩. অর্থাৎ যখন একদিকে তাদের সামনে থাকবে আখেরাতের অনন্ত জীবন এবং অন্যদিকে তারা পেছন ফিরে নিজেদের পৃথিবীর জীবনের দিকে তাকাবে তখন তাদের ভবিষ্যতের তুলনায় নিজেদের এ অতীত বড়ই সামান্য ও নগণ্য মনে হবে। সে সময় তারা একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তারা নিজেদের পূর্ববর্তী জীবনের সামান্য স্বাদ ও লাভের বিনিময়ে নিজেদের এ চিরন্তন ভবিষ্যত নষ্ট করে কত বড় বোকামি করেছে!

৫৪. অর্থাৎ একদিন আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে, একথাকে মিথ্যা বলেছে।

৫৫. এ "উম্মত" শব্দটি এখানে শুধুমাত্র সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং একজন রসূলের আগমনের পর তাঁর দাওয়াত যেসব লোকের কাছে পৌঁছে তারা সবাই তাঁর উম্মতভুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া রসূলকে তাদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় উপস্থিত থাকতে হবে এটা এ জন্য অপরিহার্য নয়। বরং রসূলের পরেও যতদিন পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা অবিকৃত থাকবে এবং তিনি মূলত কিসের তালীম দিতেন এ বিষয়টা জানা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যতদিন সম্ভব হবে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তাঁরই উম্মত গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সামনের দিকে যে বিধানের আলোচনা আসছে তা তাদের ওপর কার্যকর হবে। এ দৃষ্টিতে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁর উম্মতভুক্ত। যতদিন কুরআন তার নির্ভুল ও নির্ভেজাল অবস্থায় প্রকাশিত হতে থাকবে ততদিন এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। এ কারণে আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, "প্রত্যেক জাতির (বা সম্প্রদায়ের) মধ্যে একজন রসূল রয়েছে" বরং বলা হয়েছে, "প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল রয়েছে।"

৫৬. এর অর্থ হচ্ছে, রসূলের দাওয়াত কোন মানব গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর ধরে নিতে হবে যে, সেই গোষ্ঠীর হেদায়াতের জন্য আল্লাহর যা কিছু করণীয় ছিল, তা করা হয়ে গেছে। এরপর কেবল ফায়সালা করাই বাকি থেকে যায়। অতিরিক্ত কোন যুক্তি বা সাক্ষ-প্রমাণের অবকাশ থাকে না। আর চূড়ান্ত ইনসাফ সহকারে এ ফায়সালা করা হয়ে থাকে। যারা রসূলের কথা মেনে নেয় এবং নিজেদের নীতি ও মনোভাব পরিবর্তন করে তারা আল্লাহর রহমত লাভের অধিকারী হয়। আর যারা তাঁর কথা মেনে নেয় না তারা শাস্তি লাভের যোগ্য হয়। তাদেরকে এ শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় দেয়া যেতে পারে বা এক জায়গায়।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾

তারা বলে, যদি তোমার এ হুমকি সত্য হয় তাহলে এটা কবে কার্যকরী হবে? বলো, "নিজের লাভ–ক্ষতিও আমার ইখতিয়ারে নেই। সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।[৫৭] প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, এ সময় পূর্ণ হয়ে গেলে তারা মুহূর্তকালও সামনে পেছনে করতে পারবে না।[৫৮] তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করেছো যে, যদি আল্লাহর আযাব অকস্মাত রাতে বা দিনে এসে যায় (তাহলে তোমরা কি করতে পারো)? এটা এমন কি জিনিস যে জন্য অপরাধীরা তাড়াহুড়া করতে চায়? সেটা যখন তোমাদের ওপর এসে পড়বে তখন কি তোমরা ঈমান আনবে? এখন বাঁচতে চাও? অথচ তোমরাইতো তাগাদা দিচ্ছিলে যে, ওটা শিগ্‌গির এসে পড়ুক। তারপর জালেমদেরকে বলা হবে, এখন অনন্ত আযাবের স্বাদ আস্বাদন করো, তোমরা যা কিছু উপার্জন করতে তার শাস্তি ছাড়া তোমাদের আর কি বিনিময় দেয়া যেতে পারে?

তারপর তারা জিজ্ঞেস করে যে, তুমি যা বলছো তা কি যথার্থই সত্য? বলো, "আমার রবের কসম, এটা যথার্থই সত্য এবং এর প্রকাশ হবার পথে বাধা দেবার মতো শক্তি তোমাদের নেই।"

৫৭. অর্থাৎ আমি কবে একথা বলেছিলাম যে, আমিই এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করবো এবং অমান্যকারীদেরকে আমিই শাস্তি দেবো? কাজেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হুমকি কবে কার্যকরী করা হবে, একথা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? হুমকি তো আল্লাহ দিয়েছেন।

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾
أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي
الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

৬ রুকূ’

আল্লাহর নাফরমানী করেছে এমন প্রতিটি ব্যক্তির কাছে যদি সারা দুনিয়ার ধন–দৌলত থাকতো তাহলে সেই আযাব থেকে বাঁচার বিনিময়ে সে তা দিতে উদ্যত হতো। যখন তারা এ আযাব দেখবে তখন তারা মনে মনে পস্তাতে থাকবে।[৫৯] কিন্তু তাদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে ফায়সালা করা হবে, তাদের প্রতি কোন জুলুম হবে না। শোনো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। শুনে রাখো, আল্লাহর অংগীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু দেন এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে নেয় তার জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত।

তিনিই তাঁর ফায়সালা বাস্তবায়িত করবেন। কখন ফায়সালা করবেন এবং কিভাবে তা তোমাদের সামনে আনবেন তা সব তাঁরই ইচ্ছাধীন।

৫৮. এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাড়াহুড়া করেন না। যখনই রসূলের দাওয়াত কোন ব্যক্তি বা দলের কাছে পৌঁছে যায়, তখনই যারা ঈমান আনে কেবল তারাই রহমতের হকদার হবে। এবং যারা তা মানতে অস্বীকার করবে অথবা মেনে নিতে ইতস্তত করবে তাদেরকে সংগে সংগে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এটা আল্লাহর রীতি নয়। বরং আল্লাহর রীতি হচ্ছে, নিজের বাণী পৌঁছিয়ে দেবার পর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত মর্যাদা অনুযায়ী এবং প্রত্যেক দল ও জাতিকে তার সামগ্রিক মর্যাদা অনুসারে চিন্তা–ভাবনা ও বোঝাপড়া করার জন্য যথেষ্ট সময় দেন। এ অবকাশকাল অনেক সময় শত শত বছর ধরে চলতে থাকে। এ ব্যাপারে কার কতটা অবকাশ পওয়া উচিত তা আল্লাহই ভাল জানেন।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۶۰﴾

হে নবী! বলো, "এ জিনিসটি যে, তিনি পাঠিয়েছেন এটি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর মেহেরবানী। এ জন্য তো লোকদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা কিছু জমা করছে সে সবের চেয়ে এটি অনেক ভাল।" হে নবী! তাদেরকে বলো, "তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করেছো যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক[৬০] অবতীর্ণ করেছিলেন তার মধ্য থেকে তোমরা নিজেরাই কোনটাকে হারাম ও কোনটাকে হালাল করে নিয়েছো?"[৬১] তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন? নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?[৬২] যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে তারা কি মনে করে, কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে? আল্লাহ তো লোকদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকরগুজারী করে না।[৬৩]

তারপর পুরোপুরি ইনসাফের ভিত্তিতে দেয়া এ অবকাশ যখন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দল তার বিদ্রোহাত্মক নীতি পরিবর্তন করতে চায় না তখন এরি ভিত্তিতে তার ওপর আল্লাহ তাঁর ফায়সালা কার্যকর করেন। এ ফায়সালার সময়টি আল্লাহর নির্ধারিত সময় থেকে এক মুহূর্ত আগেও আসতে পারে না এবং সময় এসে যাবার পর মুহূর্তকালের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়।

৫৯. সারা জীবন তারা যে জিনিসটিকে মিথ্যা বলতে থাকে, যাকে মিথ্যা মনে করে সারাটা জীবন ভুল কাজে ব্যয় করে এবং যার সংবাদদানকারী পয়গম্বরদেরকে বিভিন্নভাবে দোষারোপ করতে থাকে, সেই জিনিসটি যখন তাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে গুড়িয়ে দিয়ে অকস্মাৎ সামনে এসে দাঁড়াবে তখন তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। এটিই যেহেতু যথার্থ সত্য ছিল তাই তারা দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তার পরিণাম এখন কি হওয়া উচিত তা তাদের বিবেকই তাদেরকে জানিয়ে দেবে। নিজের কৃতকর্মের হাত থেকে বাঁচার কোন পথ থাকে না। মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। লজ্জায় ও আক্ষেপে অন্তর ভিতরে ভিতরেই দমে যাবে। আন্দাজ ও অনুমানের ব্যবসায়ে যে ব্যক্তি তার সমস্ত পুঁজি ঢেলে দিয়েছে এবং

কোন শুভাকাংখীর কথা মেনে নেয়নি সে দেউলিয়া হয়ে যাবার পর তার নিজের ছাড়া আর কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে?

৬০. রিযিক বলতে আমাদের ভাষায় শুধুমাত্র পানাহারের জিনিসপত্র বুঝায়। এ কারণে লোকেরা মনে করে ধর্মীয় সংস্কার ও রসম রেওয়াজের ভিত্তিতে খাদ্য সামগ্রীর ক্ষুদ্রতর পরিসরে লোকেরা যেসব আইন কানুন প্রণয়ন করে রেখেছে এখানে শুধুমাত্র তারই সমালোচনা করা হয়েছে। এ বিভ্রান্তিতে শুধুমাত্র অজ্ঞ–অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষরাই ভুগছে না, শিক্ষিত সমাজ ও আলেমরাও এর শিকার হয়েছেন। অথচ আরবী ভাষায় রিযিক শব্দটি নিছক খাদ্যের অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং রকমারি দান, অনুদানও এর আওতাভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই তার রিযিক। এমন কি সন্তান–সন্ততিও রিযিক। আসমাউর রিজাল তথা রাবীদের জীবনী গ্রন্থসমূহে রিযুক, রুযাইক ও রিযুকুল্লাহ নামে অসংখ্য রাবী পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আল্লাহ বখশ, খোদা বখ্‌শ নামগুলো প্রায় এই একই অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি বহুল প্রচলিত দোয়ার ভাষা হলো ঃ

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

"হে আল্লাহ! সত্যকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দাও এবং আমাদের তার অনুসরণ করে চলার সুযোগ দাও।"

প্রচলিত আরবী প্রবাদে বলা হয়, " رُزِقَ عِلْمًا " অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে তাত্ত্বিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর পেটে একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি শিশুর রিযিক এবং তার আয়ু ও কর্ম লিখে দেন। এখানে রিযিক মানে শুধু খাদ্য নয়, যা ভূমিষ্ঠ হবার পরে এ শিশু লাভ করবে। বরং এ দুনিয়ায় তাকে যা কিছু দেয়া হবে সবই রিযিকের অন্তরভুক্ত। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ অর্থাৎ "যা কিছু আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।" কাজেই রিযিককে নিছক খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং পানাহারের জিনিসের ব্যাপারে মানুষ নিজেই নিজের ওপর যেসব বিধি–নিষেধ ও স্বাধীনতা আরোপ করেছে আল্লাহ কেবল তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন, একথা মনে করা মারাত্মক ভুল। এটা কোন সামান্য ভুল নয়। এর কারণে আল্লাহর দীনের একটি বিরাট মৌলিক ও নীতিগত শিক্ষা মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে। এ ভুলের ফলশ্রুতিতেই তো আজ পানাহারের জিনিসের মধ্যে হারাম ও হালাল এবং জায়েয ও নাজায়েযের ব্যাপারটিকে একটি দীনী বিষয় মনে করা হয় কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যাপকতর বিষয়াবলীতে যদি এ নীতি স্থির করে নেয়া হয় যে, মানুষ নিজেই নিজের সীমা নির্দিষ্ট করে নেয়ার অধিকার রাখে এবং এ কারণে আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত হয়ে আইন প্রণয়ন করা হতে থাকে তাহলে সাধারণ লোক তো দূরের কথা দীনী উলামা, শরীয়াতের মুফতীবৃন্দ এবং কুরআনের মুফাসসির ও হাদীসের শায়খগণের পর্যন্ত এ অনুভূতি হয় না যে, পানাহারের সামগ্রীর ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়াতের প্রভাবমুক্ত হয়ে জায়েয ও নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করার মতো এটিও দীনের সাথে সমান সংঘর্ষশীল।

৬১. অর্থাৎ তোমরা যে এটা কতবড় মারাত্মক বিদ্রোহাত্মক অপরাধ করছো তার কোন অনুভূতিই তোমাদের নেই। রিযিকের মালিক আল্লাহ। তোমরা নিজেরাও আল্লাহর অধীন। এ অবস্থায় আল্লাহর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ এবং তা ব্যবহার ও ভোগ করার জন্য তার মধ্যে বিধি–নিষেধ আরোপ করার অধিকার তোমরা কোথা থেকে পেলে? কোন চাকর যদি দাবী করে প্রভুর সম্পত্তি ব্যবহার করার এবং তার ওপর যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তার নিজেরই বিধি–নিষেধ আরোপ করার অধিকার আছে এবং এ ব্যাপারে প্রভুর কিছু বলার আদতে কোন প্রয়োজনই নেই, তাহলে তার ব্যাপারে তোমরা কি বলবে? তোমাদের নিজেদের কর্মচারী যদি তোমাদের গৃহ এবং গৃহের যাবতীয় জিনিসপত্র ব্যবহার করার ও কাজে লাগাবার ব্যাপারে এ ধরনের স্বাধীনতা ও ক্ষমতার দাবী করে তাহলে তোমরা তার সাথে কেমন ব্যবহার করবে? আর যে চাকর আদতে এ কথাই মানে না যে, সে কারোর চাকর, কেউ তার প্রভু এবং তার হাতে যে সম্পদ আছে তা অন্য কারোর মালিকানাধীন, তার ব্যাপারটাই আলাদা। এখানে এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকের কথা আলোচনা করা হচ্ছে না। এখানে এমন ধরনের চাকরের কথা আলোচিত হচ্ছে, যে নিজে একথা মানে যে, সে কারোর চাকর এবং এই সাথে এ কথাও মানে যে, সে যার চাকর সে–ই সমস্ত সম্পদের মালিক। তারপর বলে, এ সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকার আমি নিজে নিজেই লাভ করেছি এবং এ জন্য প্রভুকে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই।

৬২. অর্থাৎ তোমাদের এ মর্যাদা কেবলমাত্র তখনই সঠিক হতো যখন প্রভু নিজেই তোমাদের অধিকার দান করতেন এবং বলে দিতেন, আমার সম্পদ তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করো এবং নিজেদের কাজ ও ব্যবহার করার সীমারেখা, আইন–কানুন ও নীতি–নিয়ম সবকিছু তৈরী করার যাবতীয় অধিকার তোমাদের দিয়ে দিলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রভু তোমাদের এ অধিকার ও ক্ষমতা যে দিয়েছেন এ মর্মে তোমাদের কাছে সত্যিই প্রভুর দেয়া কোন প্রমাণ পত্র আছে কি? নাকি কোন প্রমাণপত্র ছাড়াই তোমরা এ দাবী করছো যে, তিনি তোমাদের সমস্ত অধিকার দান করেছেন? যদি প্রথমটি সত্য হয় তাহলে মেহেরবানী করে সেই প্রমাণপত্রটি দেখাও। আর দ্বিতীয়টি সত্য হলে একথা পরিষ্কার যে, তোমরা বিদ্রোহের সাথে সাথে মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষারোপের অপরাধও করছো।

৬৩. অর্থাৎ এটা তো প্রভুর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর ভৃত্যকে নিজেই বলে দিচ্ছেন, আমার গৃহে, আমার সম্পদে এবং স্বয়ং আমার ব্যাপারে কোন্ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করলে তুমি আমার সন্তুষ্টি, পুরস্কার ও উন্নতি হাসিল করতে সক্ষম হবে এবং কোন্ কর্মনীতি অবলম্বন করলে অনিবার্যভাবে আমার ক্রোধ, শাস্তি ও অবনতির সম্মুখীন হবে। কিন্তু অনেক নির্বোধ ভৃত্য এ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অর্থাৎ তাদের মতে যেন এমনটি হওয়া উচিত ছিল যে, প্রভু তাদেরকে নিজের গৃহে এনে স্বাধীন ছেড়ে দিতেন এবং সব সম্পদ তাদের কর্তৃত্বাধীন করে দেবার পর কোন্ ভৃত্য কি করে তা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে থাকতেন। তারপর যখনই কেউ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে—যা কোন ভৃত্য বা চাকরের জানা নেই—কোন কাজ করতো তখনই তাকে তিনি শাস্তি দিয়ে দিতেন। অথচ প্রভু যদি তার চাকরদেরকে এমন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করতেন তাহলে তাদের এক জনেরও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হতো না।

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾ اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾

৭ রুকূ’

হে নবী! তুমি যে অবস্থায়ই থাকো এবং কুরআন থেকে যা কিছুই শুনাতে থাকো। আর হে লোকেরা, তোমরাও যা কিছু করো সে সবের মধ্যে আমি তোমাদের দেখতে থাকি। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে কোন অণুপরিমাণ বস্তুও এমন নেই, এবং তার চেয়ে ছোট বা বড় কোন জিনিসও নেই, যা তোমাদের রবের দৃষ্টির অগোচরে আছে এবং যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই।[৬৪] *শোনো, যারা আল্লাহর বন্ধু, ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের কোন ভয় ও মর্মযাতনার অবকাশ নেই। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য শুধু সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথার পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য। হে নবী! এরা তোমাকে যেসব কথা বলছে তা যেন তোমাকে মর্মাহত না করে। সমস্ত মর্যাদা আল্লাহর হাতে এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।*

৬৪. নবীকে সান্ত্বনা দেয়া এবং তাঁর বিরোধীদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই এখানে এ কথার উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে নবীকে বলা হচ্ছে, সত্যের বাণী লোকদের কাছে প্রচার এবং আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য তুমি যেভাবে জানপ্রাণ দিয়ে এবং সবর ও সহিষ্ণুতা সহকারে কাজ করে যাচ্ছো তার প্রতি আমি নজর রাখছি। এমন নয় যে, এ বিপদসংকুল কাজে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে অসহায় ছেড়ে দিয়েছি। যা

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

*জেনে রেখো, আকাশের অধিবাসী হোক বা পৃথিবীর, সবাই আল্লাহর মালিকানাধীন। আর যারা আলাহকে বাদ দিয়ে (নিজেদের মনগড়া) কিছু শরীকদের ডাকছে তারা নিছক আন্দাজ ও ধারণার অনুগামী এবং তারা শুধু অনুমানই করে। তিনিই তোমাদের জন্য রাত তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং দিনকে উজ্জ্বল করেছেন। এর মধ্যে শিক্ষা আছে এমন লোকদের জন্য যারা (খোলা কানে নবীর দাওয়াত) শোনে।*৬৫

কিছু তুমি করছো তাও আমি দেখছি এবং যে আচরণ তোমার সাথে করা হচ্ছে সে সম্বন্ধেও আমি বেখবর নই। অন্যদিকে নবীর বিরোধীদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, একজন সত্যের আহবায়ক ও মানব হিতৈষীর সংস্কারধর্মী প্রচেষ্টার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তোমরা একথা মনে করে নিয়ো না যে, তোমাদের এসব কাজ কারবার দেখার মতো কেউ নেই এবং কখনো তোমাদেরকে এহেন কাজের জন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না। জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করছো সবই আল্লাহর রেকর্ডে সংরক্ষিত হচ্ছে।

৬৫. এখানে আসলে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বক্তব্যকে অত্যন্ত সংক্ষেপে কয়েক কথায় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়ায় যারা অহী ও ইলহামের সাহায্যে সরাসরি প্রকৃত সত্যের সন্ধান পায় না, তাদের ধর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে দার্শনিক সুলভ তত্ত্বানুসন্ধান। এর উদ্দেশ্য হলো, এ বিশ্ব-জাহানে বাহ্যত আমরা যা কিছু দেখছি ও অনুভব করছি তার পেছনে কোন সত্য লুকিয়ে আছে কিনা এবং থাকলে তা কি—এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। কোন ব্যক্তি চাই সে নাস্তিক্যবাদ অবলম্বন করুক বা শিরক অথবা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হোক। তার পক্ষে অবশ্যি কোন না কোন ধরনের দার্শনিক চিন্তা-গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের আশ্রয় না নিয়ে ধর্ম সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আর নবীগণ যে ধর্ম পেশ করেছেন তা কেবল এভাবেই যাচাই করা যেতে পারে। অর্থাৎ দার্শনিক সুলভ চিন্তা–ভাবনার মাধ্যমে মানুষকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা অর্জন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যে, নবী তাকে বিশ্ব–জাহানের বিভিন্ন নিদর্শনের পেছনে যে গভীর তত্ব ও সত্য লুকিয়ে থাকার সন্ধান দিচ্ছেন তার বিবেক মন তার প্রতি সায় দেয় কি না। এ অনুসন্ধানের সঠিক বা বেঠিক হওয়ার বিষয়টি পুরাপুরি নির্ভর করে অনুসন্ধান পদ্ধতির ওপর। এ পদ্ধতি ভুল হলে ভুল অভিমত গড়ে

উঠবে এবং সঠিক হলে সঠিক অভিমত গড়ে উঠবে। এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, দুনিয়ায় বিভিন্ন দল এ অনুসন্ধানের জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

মুশরিকরা নির্জলা সংশয়, কল্পনা ও অনুমানের ওপর নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত গড়ে তুলেছে।

ইশরাকী সাধক ও যোগীরা যদিও মুরাকাবা তথা ধ্যানযোগের ভড়ং সৃষ্টি করেছেন এবং দাবী করেছেন যে, তারা বহিরাঙ্গের পেছনে উঁকি দিয়ে অভ্যন্তরের চেহারা দেখে নিয়েছেন কিন্তু আসলে তারা নিজেদের এ অনুসন্ধানের ভিত রেখেছেন আন্দাজ–অনুমানের ওপর। তারা আসলে নিজেদের আন্দাজ–অনুমানের বিষয় নিয়েই ধ্যান করেন। আর তারা এই যে বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা আসলে এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, অনুমানের ভিত্তিতে যে ধারণাটা তারা দাঁড় করিয়েছিলেন তারি ওপর তাদের চিন্তা–ভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। তারপর তার ওপর মস্তিষ্কের চাপ সৃষ্টি করেছেন, ফলে সেই একই ধারণাকে নিজেদের সামনে চলমান দেখতে পেয়েছেন।

দার্শনিকগণ যুক্তির সাহায্যে গৃহীত সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত রূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আসলে তা আন্দাজ–অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ আন্দাজ–অনুমান ভিত্তিক যুক্তি যে একেবারেই খোঁড়া যুক্তি, সে কথা উপলব্ধি করে তারা তর্কশাস্ত্র সম্মত যুক্তি প্রদান ও কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তিক যষ্ঠির ওপর ভর দিয়ে তাকে চালাবার চেষ্টা করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন যুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।

বিজ্ঞানীগণ যদিও বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য তাত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তবুও অতিপ্রাকৃতের সীমানায় পা ফেলার সাথে সাথেই তারাও তাত্বিক পদ্ধতি পরিহার করে আন্দাজ–অনুমান ও ধারণা–কল্পনার পেছনে চলেছেন।

আবার এ দলগুলোর আন্দাজ–অনুমান সংকীর্ণ দল প্রীতি, অন্ধ বিদ্বেষ ও স্বার্থ–প্রীতি রোগেও আক্রান্ত হয়েছে। ফলে তারা অন্যের কথা না শোনার জিদ ধরে বসেছে এবং নিজেদের প্রিয় পথের ওপর হাত–পা গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

কুরআন এ ধরনের অনুসন্ধান পদ্ধতিকে আগাগোড়াই ভুল গণ্য করে। কুরআন বলে, তোমাদের পথভ্রষ্টতার আসল কারণ হচ্ছে এই যে, তোমরা সত্যানুসন্ধানের ভিত্তি রাখো আন্দাজ–অনুমান ও ধারণা–কল্পনার ওপর। আবার অন্ধ দল–প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ–বিদ্বেষের শিকার হয়ে অন্যের যুক্তিসংগত কথাও শুনতে রাজী হও না। এ দ্বিবিধ ভুলের কারণে তোমাদের পক্ষে সত্যের সন্ধান লাভ অসম্ভব তো ছিলই, এমন কি নবীগণ যে দীন পেশ করেছেন তাকে যাচাই পর্যালোচনা করে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব হয়ে গেছে।

এর মোকাবিলায় কুরআন দার্শনিক অনুসন্ধান গবেষণার জন্য যে সঠিক তাত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথের সন্ধান দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যারা দাবী করছে, আমরা ধারণা–কল্পনা, আন্দাজ–অনুমান ও ধ্যান–তপস্যার মাধ্যমে নয় বরং যথার্থ "নিশ্চিত জ্ঞানের" ভিত্তিতে তোমাদের সামনে প্রকৃত সত্যের বর্ণনা দিচ্ছি। প্রথমে তাদের বর্ণনা সকল প্রকার সংকীর্ণ, দল–প্রীতি ও স্বার্থ–বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনো। তারপর বিশ্ব–জাহানে যেসব নিদর্শন (কুরআনের পরিভাষায় "আয়াত"সমূহ) তোমাদের

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

লোকেরা বলে, আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন।[৬৬] সুবহানাল্লাহ—তিনি মহান-পবিত্র।[৬৭] তিনি তো অভাবমুক্ত। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন।[৬৮] একথার সপক্ষে তোমাদের কাছে কি প্রমাণ আছে? তোমরা কি আল্লাহর সপক্ষে এমন সব কথা বলো যা তোমাদের জানা নেই? হে মুহাম্মাদ! বলো, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনো সফলকাম হতে পারে না। দুনিয়ার দু'দিনের জীবন ভোগ করে নাও, তারপর আমার দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন তারা যে কুফরী করছে তার প্রতিফল স্বরূপ তাদেরকে কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।

দৃষ্টিগোচর ও অভিজ্ঞতালব্ধ হয় সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো, সেগুলোর সাক্ষ সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করো এবং অনুসন্ধান করতে থাকো যে, এ বাহ্যিক অবয়বের পেছনে যে সত্যের প্রতি এরা অংগুলি নির্দেশ করছেন তার প্রতি ইংগিতকারী আলামত তোমরা ঐ বাহ্যিক অবয়বেই পাচ্ছো কিনা? যদি এ ধরনের আলামত দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাদের ইংগিতও সুস্পষ্ট হয় তাহলে যাদের বর্ণনা নিদর্শনসমূহের সাক্ষ্য অনুযায়ী পাওয়া যাচ্ছে তাদেরকে অযথা মিথ্যুক বলার আর কোন কারণ নেই। এ দর্শন পদ্ধতিই ইসলামের ভিত্তি। দুঃখের বিষয় এ পদ্ধতি পরিত্যাগ করে মুসলিম দার্শনিকগণও প্লেটো ও এরিষ্টটলের পদাংক অনুসরণ করছেন।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে শুধুমাত্র এ পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়াই হয়নি বরং বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনসমূহ পেশ করে তার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এবং প্রকৃত সত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছার যথারীতি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এভাবে চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধান করার এ পদ্ধতি মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হবে। এখানে এ আয়াতেও উদাহরণ স্বরূপ শুধুমাত্র দু'টি নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাত ও দিন। আসলে সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুশৃংখল পরিবর্তনের কারণে রাত-দিনের ওলটপালট ও বিপ্লব সাধিত হয়। এটি একজন বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপক এবং সমগ্র বিশ্ব-জগতের ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্বশালী শাসকের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট আলামত। এর মধ্যে

সুস্পষ্ট কুশলতা, নৈপুণ্য, বিজ্ঞতা ও উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতাও দেখা যায়। কারণ দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর অসংখ্য প্রয়োজন ও অভাব পূরণ এ দিন–রাতের আবর্তনের সাথে যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে প্রভুত্ব, কৃপাশীলতা ও প্রতিপালনের সুস্পষ্ট আলামতও পাওয়া যায়। কারণ এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যিনি পৃথিবীর বুকে এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজেই তাদের স্থিতি ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও সরবরাহ করেন। এ থেকে এও জানা যায় যে, এ বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপক মাত্র একজন, তিনি কোন ক্রীড়ামোদী বা তামাসাপ্রিয় নন, খেলাচ্ছলে এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেননি এবং সেভাবে একে চালাচ্ছেনও না বরং তিনি প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞানময় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে তিনি কাজ করছেন। এ থেকে এও জানা যায় যে, অনুগ্রহকারী ও পালনকারী হিসেবে তিনিই ইবাদাত লাভের হকদার এবং দিন–রাতের আবর্তনের অধীন কোন সত্তাই রব ও প্রভু নয় বরং রবের অধীনস্থ দাস। এইসব নিদর্শনগত সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের মোকাবিলায় মুশরিকরা আন্দাজ–অনুমান ও ধারণা–কল্পনার ভিত্তিতে যে ধর্ম উদ্ভাবন করেছে তা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

৬৬. ওপরের আয়াতগুলোতে মানুষের জাহেলী ধ্যান–ধারণা ও মূর্খতার সমালোচনা করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, তোমরা নিজেদের ধর্মের ভিত রাখো প্রত্যয় মিশ্রিত জ্ঞানের পরিবর্তে আন্দাজ ও অনুমানের ওপর। তারপর যে ধর্মের অনুসারী হয়ে তোমরা এগিয়ে যাও তার পেছনে কোন যুক্তি–প্রমাণ আছে কি না, কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ মর্মে অনুসন্ধান করার কোন চেষ্টাই করো না। এখন এ প্রসংগে খৃষ্টান ও অন্যান্য কতিপয় ধর্মাবলম্বীদের এ অজ্ঞতার সমালোচনা এ বলে করা হয়েছে যে, তারা নিছক আন্দাজ–অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে নিয়েছে।

৬৭. সুবহানাল্লাহ শব্দটি কখনো বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য বলা হয় আবার কখনো এর আসল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ "আল্লাহ সকল দোষ–ত্রুটি মুক্ত।" এখানে এ শব্দটি থেকে এ উভয় অর্থই প্রকাশ হচ্ছে। লোকেরা যে কথা বলছে তার ওপর একদিকে বিস্ময় প্রকাশ করাও যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি অন্যদিকে এ মর্মে তাদের জবাব দেয়াও উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তো ত্রুটিমুক্ত, কাজেই তাঁর সন্তান আছে একথা বলা কেমন করে সঠিক হতে পারে।

৬৮. এখানে তাদের এ বক্তব্যের প্রতিবাদে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত। দুই, তাঁর কোন অভাব নেই, তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন। তিন, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই তাঁর মালিকানাধীন সামান্য একটু ব্যাখ্যা করলে এ সংক্ষিপ্ত জবাবটি সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে ঃ

পুত্র দুই রকমের হতে পারে। ঔরসজাত অথবা পালিত। তারা যদি কাউকে ঔরসজাত অর্থে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে তাহলে এর মানে হবে যে, তারা আল্লাহকে এমন এক জীবের মত মনে করে, যে স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে মরণশীল এবং যার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য তার কোন স্বজাতি থাকতে হবে আবার এ স্বজাতি থেকে তার একজন স্ত্রী হতে হবে এবং তাদের দু'জনের যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে তার সন্তান উৎপন্ন হবে। এ সন্তান তার প্রজাতীয় সত্তা এবং তার কাজ টিকিয়ে রাখবে। এ ছাড়া তার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা হতে পারে না। আর যদি তারা কাউকে দত্তক অর্থে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে তাহলে এর দু'টি অর্থ হবে। এক, তারা আল্লাহকে এমন এক মানুষের মতো মনে করে, যে নিসন্তান হবার কারণে নিজের উত্তরাধিকারী করার এবং

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم
مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ
وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ
وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৮ রুকূ'

তাদেরকে নূহের কথা শুনাও।[৬৯] সেই সময়ের কথা যখন সে তার কওমকে বলেছিল, "হে আমার কওমের লোকেরা! যদি তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান ও বসবাস এবং আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদের গাফলতি থেকে জাগিয়ে তোলা তোমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করি, তোমরা নিজেদের তৈরী করা শরীকদের সংগে নিয়ে একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত করে নাও এবং তোমাদের সামনে যে পরিকল্পনা আছে সে সম্পর্কে খুব ভালোভাবে চিন্তা করে নাও, যাতে তার কোন একটি দিকও তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে না থেকে যায়। তারপর আমার বিরুদ্ধে তাকে সক্রিয় করো এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিয়ো না।[৭০] তোমরা আমার নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো (এতে আমার কি ক্ষতি করেছো), আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনি। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছে। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে (কেউ স্বীকার করুক বা না করুক) আমি যেন মুসলিম হিসাবে থাকি।" তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, ফলে আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় ছিল সবাইকে রক্ষা করেছি এবং তাদেরকেই পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি। কাজেই যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল (এবং তারপরও তারা মেনে নেয়নি) তাদের পরিণাম কি হয়েছে দেখো।

সন্তানহীনতার দরুন তার যে ক্ষতি হচ্ছে নামমাত্র হলেও তার কিছুটা প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রজাতির কোন একজনকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে। দুই, তারা মনে করে আল্লাহও মানবিক আবেগের অধিকারী। এ কারণে নিজের অসংখ্য বান্দাদের মধ্য থেকে কোন একজনের প্রতি তার স্নেহ ভালোবাসা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তাকে নিজের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

এ তিনটি অবস্থার যে কোনটিই সঠিক হোক না কেন, সর্বাবস্থায়ই এ বিশ্বাসের মৌল তত্ত্বের মধ্যে আল্লাহর প্রতি আরোপিত হবে বহু দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও অভাব। এ কারণে প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছে তোমরা আল্লাহর ওপর যেসব দোষ, ত্রুটি ও দুর্বলতা আরোপ করছো সেসব থেকে তিনি মুক্ত। দ্বিতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, তিনি এমন ধরনের অভাব থেকেও মুক্ত যার কারণে মরণশীল মানুষদের সন্তানের দত্তক নেবার প্রয়োজন হয়। তৃতীয় বাক্যাংশে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে ও আকাশে সবাই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর দাস। তাদের কারোর সাথে আল্লাহর এমন কোন বিশেষ বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই যার ফলে সবাইকে বাদ দিয়ে তিনি তাকেই নিজের পুত্র বা একমাত্র পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। বান্দার গুণের কারণে অবশ্যি আল্লাহ একজনের তুলনায় আর একজনকে বেশী ভালোবাসেন। কিন্তু এ ভালবাসার অর্থ এ নয় যে, কোন বান্দাকে বন্দেগী পর্যায় থেকে উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অংশীদার করার পর্যায়ে উন্নীত করবেন। বড়জোর এ ভালোবাসার দাবী ততটুকুই হতে পারে যা এর আগের একটি আয়াতে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে তাদের কোন ভয় ও মর্মযাতনা নেই। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের জন্য আছে শুধু সুসংবাদ।"

৬৯. এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তাতে এ লোকদেরকে ন্যায়সংগত যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশের মাধ্যমে তাদের আকীদা-বিশ্বাস এবং চিন্তা ও পদ্ধতিতে কি কি ভুল-ভ্রান্তি আছে এবং সেগুলো ভুল কেন আর এর মোকাবিলায় সঠিক পথ কি এবং তা সঠিক কেন, একথা বুঝানো হয়েছিল। এই সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট উপদেশের জবাবে তারা যে কর্মনীতি অবলম্বন করছিল আলোচ্য রুকূ'তে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। দশ বারো বছর ধরে তারা এ নীতি অবলম্বন করে আসছিল যে, এ যুক্তিসংগত সমালোচনা ও সঠিক পথপ্রদর্শনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নিজেদের ভুল পথ অবলম্বনের ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা না করে উল্টো যে ব্যক্তি নিজের কোন স্বার্থে নয় বরং তাদের ভালোর জন্য একথাগুলো পেশ করছিলেন তার প্রাণনাশে উদ্যোগী হয়। তারা যুক্তির জবাব পাথরের সাহায্যে এবং নসীহতের জবাব গালির সাহায্যে দিয়ে চলছিল। নিজেদের লোকালয়ে এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব তাদের কাছে ভয়ানক বিরক্তিকর বরং অসহ্যকর হয়ে উঠেছিল যিনি মিথ্যাকে মিথ্যা বলেন এবং সঠিক কথা বলার চেষ্টা করেন। তাদের দাবী ছিল, আমাদের এ অন্ধদের সমাজে যদি কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি থেকে থাকে তবে সে আমাদের চোখ খুলে দেবার পরিবর্তে তার নিজের চোখও বন্ধ করে রাখুক। নয়তো আমরা জোর করে তার চোখ কানা করে দেবো, যাতে আমাদের দেশে দৃষ্টিশক্তি নামক কোন জিনিস না থাকে। তারা এই যে কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল এ সম্পর্কে আরো কিছু বলার পরিবর্তে আল্লাহ তাঁর নবীকে হুকুম দিচ্ছেন, তাদেরকে নূহের ঘটনা শুনিয়ে দাও, এ ঘটনা থেকেই তারা তোমার ও তাদের মধ্যকার ব্যাপারটির জবাব পেয়ে যাবে।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا
لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۷۴﴾
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا
فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۷۵﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۷۶﴾ قَالَ مُوْسٰۤى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا
جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿۷۷﴾

তারপর নূহের পর আমি বিভিন্ন পয়গম্বরকে তাদের কওমের কাছে পাঠাই এবং তারা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে আসে। কিন্তু যে জিনিসকে তারা আগেই মিথ্যা বলেছিল তাকে আর মেনে নিতে প্রস্তুত হলো না। এভাবে আমি সীমা অতিক্রমকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই।[৭১]

তারপর[৭২] *মূসা ও হারুনকে আমি তাদের পরে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সরদারদের কাছে পাঠাই। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত হয়*[৭৩] *এবং তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। পরে যখন আমার কাছ থেকে সত্য তাদের সামনে আসে, তারা বলে দেয়, এ তো সুস্পষ্ট যাদু।*[৭৪] *মূসা বললো, "সত্য যখন তোমাদের সামনে এলো তখন তোমরা তার সম্পর্কে এমন (কথা) বলছো? এ কি যাদু? অথচ যাদুকর সফলকাম হয় না।"*[৭৫]

৭০. এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। বলা হচ্ছে, আমি নিজের কাজ থেকে বিরত হবো না। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যা করতে চাও করো। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি। (তুলনামূলক পাঠের জন্য দেখুন সূরা হূদের ৫৫ আয়াত)।

৭১. সীমা অতিক্রমকারী লোক তাদেরকে বলে যারা একবার ভুল করার পর আবাব নিজের কথার বক্রতা, একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার কারণে নিজের ভুলের ওপর অবিচল থাকে এবং যে কথা মেনে নিতে একবার অস্বীকার করেছে তাকে আর কোন প্রকার উপদেশ, অনুরোধ–উপরোধ ও কোন উন্নত থেকে উন্নত পর্যায়ের যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মেনে নিতে চায় না। এ ধরনের লোকদের ওপর শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এমন লানত পড়ে যে, তাদের আর কোনদিন সঠিক পথে চলার সুযোগ হয় না।

৭২. এ প্রসংগে সূরা আ'রাফের ১৩ থেকে ২১ রুকূ'র মধ্যে মূসা ও ফেরাউনের সংঘাতের ব্যাপারে আমি যে টীকাগুলো দিয়েছি সেগুলো পড়ে দেখা যেতে পারে। সেখানে যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছি এখানে আর সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হবে না।

৭৩. অর্থাৎ সে নিজের বিপুল বৈভব, রাজক্ষমতা ও শান-শওকতের নেশায় মত্ত হয়ে নিজেই নিজেকে ভৃত্যের আসন থেকে ওপরে তুলে নিয়েছে এবং আনুগত্যের শির নত করার পরিবর্তে গর্বোন্নত হয়েছে।

৭৪. অর্থাৎ হযরত মূসার বাণী শুনে তারা সেই একই কথা বলেছিল যা মক্কার কাফেররা বলেছিল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে। কাফেররা বলেছিল, "এ ব্যক্তি তো পাক্কা যাদুকর।" (দেখুন এ সূরা ইউনুসের দ্বিতীয় আয়াত)।

এখানে প্রাসংগিক আলোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখলে একথা স্পষ্টই ধরা পড়ে যে, আসলে হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর পরে সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী পর্যায়ক্রমে যে দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন হযরত মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম সেই একই দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সূরার শুরু থেকে একই বিষয়বস্তু চলে আসছে। এ বিষয়বস্তুটি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে নিজের রব ও ইলাহ হিসেবে মেনে নাও। এই সংগে একথা স্বীকার করে নাও যে, এ জীবনের পরে আর একটি জীবন আসছে, সেখানে তোমাদের আল্লাহর সামনে হাযির হতে এবং নিজেদের কাজের হিসাব দিতে হবে। তারপর যারা নবীর এ দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করছিল তাদেরকে বুঝানো হচ্ছে, শুধুমাত্র তোমাদের কল্যাণ নয় বরং সমগ্র বিশ্ব মানবতার কল্যাণ চিরকাল একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এসেছে। সে বিষয়টি হচ্ছে, তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের আহবানে সাড়া দেয়া। প্রতি যুগে আল্লাহর নবীগণ এ আহবানই জানিয়েছেন। তাঁরা এ আহবানে সাড়া দিয়ে নিজের সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে এরই ভিত্তিতে কায়েম করার তাগিদ করেছেন। যারা এ কাজ করেছে একমাত্র তারাই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছে। আর যে জাতি একে অস্বীকার করেছে তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে। এটিই এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। এ প্রেক্ষাপটে যখন ঐতিহাসিক নজীর হিসেবে অন্যান্য নবীদের প্রসংগ আলোচিত হয়েছে তখন অনিবার্যভাবে এর অর্থ হয়েছে এই যে, এ সূরায় যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে সেটিই ছিল সকল নবীর দাওয়াত এবং এ দাওয়াত নিয়েই হযরত মূসা ও হারুনও ফেরাউন ও তার কওমের সরদারদের কাছে গিয়েছিলেন। কোন কোন লোক যেমন মনে করে থাকেন, হযরত মূসা ও হারুনের দায়িত্ব ছিল একটি বিশেষ জাতিকে অন্যান্য জাতির গোলামী থেকে মুক্ত করা। যদি এটিই সত্য হতো তাহলে এ প্রেক্ষাপটে এ ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক নজীর হিসেবে পেশ করা একেবারেই বেমানান হতো। নিসন্দেহে বনী ইসরাঈলকে (একটি মুসলিম কওম) একটি কাফের কওমের আধিপত্য (যদি তারা নিজেদের কুফরীর ওপর অটল থাকে) মুক্ত করা এঁদের দু'জনের মিশনের একটি অংশ ছিল। কিন্তু এটি ছিল তাঁদের নবুওয়াতের একটি আনুসংগিক উদ্দেশ্য, মূল উদ্দেশ্য ছিল না। আসল উদ্দেশ্য তা-ই ছিল যা কুরআনের দৃষ্টিতে সকল নবীর নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল এবং সূরা নাযিআতে যে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে বলে দেয়া হয়েছে ঃ

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۷۸﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿۷۹﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿۸۰﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۸۲﴾

তারা জবাবে বললো, "তুমি কি যে পথে আমরা আমাদের বাপ–দাদাদের পেয়েছি সে পথ থেকে আমাদের ফিরিয়ে দিতে এবং যাতে যমীনে তোমাদের দু'জনের প্রাধান্য কায়েম হয়ে যায় সে জন্য এসেছো?[৭৬] তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।" আর ফেরাউন (নিজের লোকদের) বললো, "সকল দক্ষ ও অভিজ্ঞ যাদুকরকে আমার কাছে হাযির করো।"—যখন যাদুকররা এসে গেলো, মূসা তাদেরকে বললো, "যা কিছু তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো।" তারপর যখন তারা নিজেদের ভোজবাজি নিক্ষেপ করলো, মূসা বললো, "তোমরা এই যা কিছু নিক্ষেপ করেছো এগুলো যাদু।[৭৭] আল্লাহ এখনই একে ব্যর্থ করে দেবেন। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকে আল্লাহ সার্থক হতে দেন না। আর অপরাধীদের কাছে যতই বিরক্তিকর হোক না কেন আল্লাহ তাঁর ফরমানের সাহায্যে সত্যকে সত্য করেই দেখিয়ে দেন।"

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ٥ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ٥ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى –

"ফেরাউনের কাছে যাও, কারণ সে গোলামীর সীমা অতিক্রম করে গেছে এবং তাকে বলো, তুমি কি নিজেকে শুধরে নেবার জন্য তৈরী আছো? আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাবো, তুমি কি তাঁকে ভয় করবে?"

কিন্তু যেহেতু ফেরাউন ও তার রাজ্যের প্রধানগণ এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসাকে নিজের মুসলিম কওমকে তার অধীনতার নাগপাশ থেকে বের করে আনতে হয়েছিল। তাই তাঁর মিশনের এ অংশটিই ইতিহাসে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং

কুরআনেও একে ঠিক ইতিহাসে যেভাবে আছে তেমনিভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআনের বিস্তারিত বিবরণগুলোকে তার মৌলিক বক্তব্য থেকে আলাদা করে দেখার মতো ভুল করে না বরং সেগুলোকে সমগ্র বক্তব্যের অধীনেই দেখে থাকে, সে কখনো একটি জাতির দাসত্ব মুক্তিকে কোন নবীর নবুওয়াতের আসল উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর সত্য দ্বীনের দাওয়াতকে নিছক তার আনুসংগিক উদ্দেশ্য মনে করার মত বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হতে পারে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা ত্বা–হা ৪৪ থেকে ৫২ আয়াত, যুখরুফ ৪৬ থেকে ৫৬ আয়াত এবং মুয্যাম্মিল ১৫ থেকে ১৬ আয়াত)।

৭৫. এর মানে হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তার ফলে তোমরা নির্দ্বিধায় তাকে যাদু গণ্য করেছো। কিন্তু মূর্খের দল, তোমরা একটুও ভেবে দেখলে না, যাদুকররা কোন্ ধরনের চরিত্রের অধিকারী হয় এবং তারা কি উদ্দেশ্যে যাদু করে। একজন যাদুকর কি কখনো কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই এবং কোন চিন্তা–ভাবনা না করেই বেধড়ক একজন স্বৈরাচারী শাসকের দরবারে আসে, তাকে তার ভ্রষ্টতার জন্য ধমক দেয় ও তিরস্কার করে এবং তার প্রতি আল্লাহর আনুগত্য করার ও আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করার আহবান জানায়? তোমাদের কাছে কোন যাদুকর এলে প্রথমে রাজ সমক্ষে নিজের তেলেসমাতি দেখাবার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য দরবারের পারিষদবর্গের খোশামোদ করতে থাকতো। তারপর দরবারে প্রবেশ করার সৌভাগ্য হলে সাধারণ তোষামোদকারীদের থেকেও বেশী নির্লজ্জতার সাথে অভিবাদন পেশ করতো, চীৎকার করে করে রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করতো, তাঁর সৌভাগ্যের জন্য দোয়া করতো এবং বড়ই কাতর কাকুতি মিনতি সহকারে নিবেদন করতো, হে রাজন! আপনার একজন উৎসর্গীত প্রাণ সেবাদাসের কৃতিত্ব কিছুটা দর্শন করুন। আর তার যাদু দেখে নেবার পর সে পুরস্কার লাভের আশায় নিজের হাত পাততো। এ সমগ্র বিষয়বস্তুটি শুধু একটি মাত্র বাক্যের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে, যাদুকর কোন কল্যাণ প্রাপ্ত লোক হয় না।

৭৬. বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করা যদি হযরত মূসা (আ) ও হারুনের (আ) মূল দাবী হতো তাহলে ফেরাউন ও তার দরবারের লোকদের এ ধরনের আশংকা করার কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এ দুই মহান ব্যক্তির দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লে সারা মিসরের লোকদের ধর্ম বদলে যাবে এবং দেশে তাদের পরিবর্তে এদের দু'জনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। হযরত মূসা (আ) মিসরবাসীকে আল্লাহর বন্দেগীর প্রতি যে আহবান জানাচ্ছিলেন এটিই তো ছিল তাদের আশংকার কারণ। এর ফলে যে মুশরিকী ব্যবস্থার ওপর ফেরাউনের বাদশাহী, তার সরদারদের নেতৃত্ব এবং ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আ'রাফের ৬৬ এবং সূরা মুমিনের ৪৩ টীকা)।

৭৭. অর্থাৎ আমি যা দেখিয়েছি তা যাদু ছিল না বরং তোমরা এই যা দেখাচ্ছো এ হচ্ছে যাদু।

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾

৯ রুকূ'

(তারপর দেখো) মূসাকে তার কওমের কতিপয় নওজোয়ান[৭৮] ছাড়া কেউ মেনে নেয়নি,[৭৯] ফেরাউনের ভয়ে এবং তাদের নিজেদেরই কওমের নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। (তাদের আশংকা ছিল) ফেরাউন তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে। আর প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ফেরাউন দুনিয়ায় পরাক্রমশালী ছিল এবং সে এমন লোকদের অন্তরভূক্ত ছিল যারা কোন সীমানা মানে না।[৮০]

মূসা তার কওমকে বললো, "হে লোকেরা! যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে থাকো তাহলে তাঁর ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলিম—আত্মসমর্পণকারী হও।[৮১] তারা জবাব দিল, "আমরা আল্লাহরই ওপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালেমদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না[৮২] এবং তোমার রহমতের সাহায্যে কাফেরদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।"

আর আমি মূসা ও তার ভাইকে ইশারা করলাম এই বলে যে, "মিসরে নিজের কওমের জন্য কতিপয় গৃহের সংস্থান করো, নিজেদের ঐ গৃহগুলোকে কিব্লায় পরিণত করো এবং নামায কায়েম করো।[৮৪] আর ঈমানদারদেরকে সুখবর দাও।[৮৫]

৭৮. কুরআনের মূল বাক্যে ذُرِّيَّةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে সন্তান–সন্ততি। আমি এর অনুবাদ করেছি নওজোয়ান। কিন্তু এ বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে কুরআন মজীদ যে কথা

বর্ণনা করতে চায় তা হচ্ছে এই যে, এ বিভীষিকাময় দিনগুলোতে গুটিকয় ছেলেমেয়েই তো সত্যের সাথে সহযোগিতা করার এবং সত্যের পতাকাবাহীকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নেয়ার দুঃসাহস করেছিল। কিন্তু মা–মাপ ও জাতির বয়স্ক লোকেরা এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি। তারা তখন বৈষয়িক স্বার্থ পূজা, সুবিধাবাদিতা ও নিরাপদ জীবন যাপনের চিন্তায় এত বেশী বিভোর ছিল যে, এমন কোন সত্যের সাথে সহযোগিতা করতে তারা উদ্যোগী হয়নি যার পথ তারা দেখছিল বিপদসংকুল। বরং তারা উল্টো নওজোয়ানদের পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছিল। তাদেরকে বলছিল, তোমরা মূসার ধারে কাছেও যেয়ো না, অন্যথায় তোমরা নিজেরা ফেরাউনের রোষাগ্নিতে পড়বে এবং আমাদের জন্যও বিপদ ডেকে আনবে।

কুরআনের একথা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করে পেশ করার কারণ হচ্ছে এই যে, মক্কার জনবসতিতেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সহযোগিতা করার জন্য যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারাও জাতির বয়স্ক ও বয়োবৃদ্ধ লোক ছিলেন না বরং তারাও সবাই ছিলেন বয়সে নবীন। আলী ইবনে আবী তালেব (রা), জাফর তাইয়ার (রা), যুবাইর (রা), তালহা (রা), সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা), মুসআব ইবনে উমাইর (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতো লোকদের বয়স ইসলাম গ্রহণের সময় ২০ বছরের কম ছিল। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), বিলাল (রা) ও সোহাইবের (রা) বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ছিল। আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) যায়েদ ইবনে হারেসাহ (রা), উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) ও উমর ফারুকের (রা) বয়স ছিল ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এদের সবার থেকে বেশী বয়সের ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা)। তাঁর বয়স ঈমান আনার সময় ৩৮ বছরর বেশী ছিল না। প্রাথমিক মুসলমানদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন সাহাবীর নাম আমরা পাই যাঁর বয়স ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বেশী। তিনি ছিলেন হযরত উবাইদাহ ইবনে হারেস মুত্তালাবী (রা)। আর সম্ভবত সাহাবীগণের সমগ্র দলের মধ্যে একমাত্র হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমবয়সী।

৭৯. মূল ইবারতে فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰى শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এতে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন, হয়তো বনী ইসরাঈলের সবাই কাফের ছিল এবং শুরুতে তাদের মধ্য থেকে মাত্র গুটিকয় লোক ঈমান এনেছিল। কিন্তু "ঈমান' শব্দের পরে যখন "লাম" ব্যবহৃত হয় তখন সাধারণত এর অর্থ হয় আনুগত্য ও তাঁবেদারী করা। অর্থাৎ কারোর কথা মেনে নেয়া এবং তার কথায় ওঠাবসা করা। কাজেই মূলত এ শব্দগুলোর ভাবগত অর্থ হচ্ছে, গুটিকয় নওজোয়ানকে বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত বনী ইসরাঈল জাতির কেউই হযরত মূসাকে নিজের নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করতে এবং ইসলামী দাওয়াতের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়নি। তারপর পরবর্তী বাক্যাংশ একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাদের এ কার্যধারার আসল কারণ এ ছিল না যে, হযরত মূসার সত্যবাদী ও তাঁর দাওয়াত সত্য হবার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন সন্দেহ ছিল বরং এর কারণ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা এবং বিশেষ করে তাদের প্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হযরত মূসার সহযোগী হয়ে ফেরাউনের নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হবার ঝুঁকি নিতে রাজী ছিল না। যদিও তারা বংশধারা ও ধর্মীয় উভয় দিক দিয়ে হযরত

ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ আলাইহিমুস সালামের উম্মত ছিল এবং এ দিক দিয়ে তারা সবাই মুসলমান ছিল। কিন্তু দীর্ঘকালীন নৈতিক অবক্ষয় এবং পরাধীনতার ফলে সৃষ্ট কাপুরুষতা তাদের মধ্যে কুফরী ও গোমরাহীর শাসনের বিরুদ্ধে ঈমান ও হেদায়াতের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে নিজেরা এগিয়ে আসার অথবা যে এগিয়ে এসেছে তাকে সাহায্য করার মত মনোবল অবশিষ্ট রাখেনি।

হযরত মূসা ও ফেরাউনের এ সংঘাতে সাধারণ বনী ইসরাঈলদের ভূমিকা কি ছিল? একথা বাইবেলের নিম্নোক্ত অংশ থেকে আমরা জানতে পারি।

"পরে ফেরাউনের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় তাহারা মূসার ও হারুনের সাক্ষাত পাইল। তাঁহারা পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহারা তাঁহাদিগকে কহিল, সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিচার করুন ঃ কেননা, তোমরা ফেরাউনের দৃষ্টিতে ও তাহার দাসগণের দৃষ্টিতে আমাদিগকে দুর্গন্ধ স্বরূপ করিয়া আমাদের প্রাণনাশার্থে তাহাদের হস্তে খড়গ দিয়াছ।" (যাত্রা পুস্তক ৫ ঃ ২০-২১)

তালমুদে লেখা হয়েছে, বনী ইসরাঈল মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামকে বলতো ঃ

"আমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি নেকড়ে বাঘ একটি ছাগলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং রাখাল এসে নেকড়ের মুখ থেকে ছাগলটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো। তাদের উভয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ছাগলটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। ঠিক এভাবেই তোমার ও ফেরাউনের টানাহেঁচড়ায় আমাদের দফা রফা হয়েই যাবে।"

সূরা আরাফে একথাগুলোর দিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ বনী ইসরাঈল হযরত মূসাকে বললো ঃ

أُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا (ايت : ١٢٩)

"তুমি আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, তুমি আসার পরেও নিপীড়নের শিকার হচ্ছি।"

৮০. মূল ইবারতে مسرفين শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, সীমা অতিক্রমকারী। কিন্তু এ শাব্দিক অনুবাদের সাহায্যে তার আসল প্রাণবস্তু সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। "মুসরিফীন" শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে, এমন সব লোক যারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে কোন নিকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করে না। যারা কোন প্রকার জুলুম, নৈতিকতা বিগর্হিত কাজ এবং যে কোন ধরনের পাশবিকতা ও বর্বরতায় লিপ্ত হতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। যারা নিজেদের লালসা ও প্রবৃত্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। তারা এমন কোন সীমানাই মানে না যেখানে তাদের থেমে যেতে হবে।

৮১. এ ধরনের কথা কখনো কোন কাফের জাতিকে সম্বোধন করে বলা যেতে পারে না। হযরত মূসার এ বক্তব্য পরিষ্কার ঘোষণা করছে যে, সমগ্র বনী ইসরাঈল জাতিই তখন মুসলমান ছিল এবং হযরত মূসা তাদেরকে এ উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, তোমরা যদি সত্যিই মুসলমান হয়ে থাকো যেমন তোমরা দাবী করে থাকো তাহলে ফেরাউনের শক্তি দেখে ভয় করো না বরং আল্লাহর শক্তির ওপর আস্থা রাখো।

৮২. যেসব নওজোয়ান মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন এটা ছিল তাদের জবাব। এখানে قَالُوا (তারা বললো) শব্দের মধ্যে 'তারা' সর্বনামটি জাতির বা কওমের সাথে যুক্ত না হয়ে ذُرِّيَّةٌ বা সন্তান সন্ততি তথা নওজোয়ানদের সাথে যুক্ত হয়েছে যেমন পরবর্তী বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে।

৮৩. "আমাদেরকে জালেম লোকদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না"—উক্ত সাচ্চা ঈমানদার নওজোয়ানদের এ দোয়া বড়ই ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবোধক। গোমরাহির সর্বব্যাপী প্রাধান্য ও আধিপত্যের মধ্যে যখন কিছু লোক সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য কোমর বেঁধে লাগে তখন তারা বিভিন্ন ধরনের জালেমের মুখোমুখি হয়। একদিকে থাকে বাতিলের আসল ধারক ও বাহক। তারা পূর্ণশক্তিতে এ সত্যের আহবায়কদের বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করতে চায়। দ্বিতীয় দিকে থাকে তথাকথিত সত্যপন্থীদের একটি বেশ বড়সড় দল। তারা সত্যকে মেনে চলার দাবী করে কিন্তু মিথ্যার পরাক্রান্ত শাসন ও দোর্দণ্ড প্রতাপের মোকাবিলায় সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামকে অনাবশ্যক বা নির্বুদ্ধিতা মনে করে। সত্যের সাথে তারা যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাকে কোন না কোন প্রকারে সঠিক ও বৈধ প্রমাণ করার জন্য তারা চরম প্রচেষ্টা চালায়। এ সংগে উল্টা তাদেরকে মিথ্যার ধারক গণ্য করে নিজেদের বিবেকের মর্মমূলে জমে ওঠা ক্লেশ ও জ্বালা মেটায়। সত্যপন্থীদের সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতের ফলে তাদের মনের গভীরে, সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে এ ক্লেশ জমে ওঠে। তৃতীয় দিকে থাকে সাধারণ জন মানুষ। তারা নিরপেক্ষভাবে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে। যার পাল্লা ভারী হয়—সে সত্য হোক বা মিথ্যা—তাদের ভোট শেষ পর্যন্ত তারই পাল্লায় পড়ে। এমতাবস্থায় এ সত্যের আহবায়কদের প্রতিটি ব্যর্থতা বিপদ–আপদ, ভুল–ভ্রান্তি, দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি বাতিল পন্থী বা নিরপেক্ষ বিভিন্ন দলের জন্য বিভিন্নভাবে উৎপীড়ন ও উত্যক্ত করণের সুযোগ ও উপলক্ষ হয়ে দেখা দেয়। তাদেরকে বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করে দেয়া হলে অথবা তারা যদি পরাজিত হয়ে যায় তাহলে প্রথম দলটি বলে, আমরাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। যে নির্বোধরা পরাজিত হয়ে গেছে তারা সত্যপন্থী ছিল না। দ্বিতীয় দলটি বলে, দেখলে তো৷ আমরা না বলেছিলাম, এসব বড় বড় শক্তির সাথে বিবাদ ও সংঘর্ষের ফল নিছক কয়েকটি মূল্যবান প্রাণের বিনাশ ছাড়া আর কিছুই হবে না। শরীয়াত কবেইবা নিজেদেরকে এ ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করার দায়–দায়িত্ব আমাদের ওপর চাপিয়েছিল? সমকালীন ফেরাউনেরা তথা স্বৈরাচারী শাসকেরা যেসব ধ্যান–ধারণা পোষণ ও কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল তার মাধ্যমেই তো দীনের সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় দাবীগুলো পূরণ হচ্ছিল। তৃতীয় দলটি তার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়, যে বিজয়ী হয়েছে সে–ই সত্য। এভাবে যদি সে তার দাওয়াতের কাজে কোন প্রকার ভুল করে বসে অথবা বিপদ ও সংকটকালে কোন সাহায্য–সহায়তা না পাওয়ার কারণে দুর্বলতা দেখায় কিংবা তার বা তার কোন সদস্যের কোন নৈতিক ত্রুটির প্রকাশ ঘটে তাহলে বহু লোকের জন্য মিথ্যার পক্ষাবলম্বনের হাজারো বাহানা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর তারপর এ দাওয়াতের ব্যর্থতার পর সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সত্যের দাওয়াতের উত্থানের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কাজেই মূসা আলাইহিস সালামের সাথীরা যে দোয়া করেছিলেন তা ছিল বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ দোয়া। তারা দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি এমন অনুগ্রহ বর্ষণ করো যাতে আমরা জালেমদের জন্য ফিৎনায় তথা উৎপীড়নের অসহায় শিকারে পরিণত না হই।" অর্থাৎ আমাদের ভুল–ভ্রান্তি, দোষ–ত্রুটি ও

وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰۤى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ
دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

মূসা দোয়া করলো, "হে আমাদের রব! তুমি ফেরাউন ও তার সরদারদেরকে দুনিয়ার জীবনের শোভা-সৌন্দর্য[৮৭] ও ধন-সম্পদ[৮৮] দান করেছো। হে আমাদের রব! একি এ জন্য যে, তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে বিপথে সরিয়ে দেবে? হে আমাদের রব! এদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং এদের অন্তরে এমনভাবে মোহর মেরে দাও যাতে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত যেন এরা ঈমান না আনে।"[৮৯] আল্লাহ জবাবে বললেন, "তোমাদের দু'জনের দোয়া কবুল করা হলো। তোমরা দু'জন অবিচল থাকো এবং মূর্খদের পথ কখনো অনুসরণ করো না।"[৯০]

দুর্বলতা থেকে রক্ষা করো এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে দুনিয়ায় ফলদায়ক করো, যাতে আমাদের অস্তিত্ব তোমার সৃষ্টির জন্য কল্যাণপ্রদ হয়, জালেমদের দুরাচারের কারণ না হয়।

৮৪. এ আয়াতটির অর্থের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছে। এর শব্দাবলী এবং যে পরিবেশে এ শব্দাবলী উচ্চারিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করে আমি একথা বুঝেছি যে, সম্ভবত মিসরে সরকারের কঠোর নীতি ও নির্যাতন এবং বনী ইসরাঈলের নিজের দুর্বল ঈমানের কারণে ইসরাঈলী ও মিসরীয় মুসলমানদের মধ্যে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা খতম হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে তাদের ঐক্যগ্রন্থী ছিন্নভিন্ন এবং তাদের দীনী প্রাণসত্তার মৃত্যু ঘটেছিল। এ জন্য এ ব্যবস্থাটিকে নতুন করে কায়েম করার জন্য হযরত মূসাকে হুকুম দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, জামায়াতবদ্ধভাবে নামায পড়ার জন্য মিসরে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করো অথবা গৃহের ব্যবস্থা করে নাও। কারণ একটি বিকৃত ও বিক্ষিপ্ত মুসলিম জাতির দীনী প্রাণসত্তার পুনরুজ্জীবন এবং তার ইতস্তত ছড়ানো শক্তিকে নতুন করে একত্র করার উদ্দেশ্যে ইসলামী পদ্ধতিতে যে কোন প্রচেষ্টাই চালানো হবে তার প্রথম পদক্ষেপেই অনিবার্যভাবে জামায়াতের সাথে নামায কায়েম করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ গৃহগুলোকে কিব্‌লাহ গণ্য করার যে অর্থ আমি বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, এ গৃহগুলোকে সমগ্র জাতির জন্য কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অধিকারী এবং তাদের কেন্দ্রীয় সম্মিলন স্থলে পরিণত করতে হবে। আর এরপরই "নামায কায়েম করো" কথাগুলো বলার মানে হচ্ছে এই যে, পৃথক পৃথকভাবে যার যার জায়গায় নামায পড়ে নেয়ার পরিবর্তে লোকদের এ নির্ধারিত স্থানগুলোয় জমায়েত হয়ে নামায পড়তে হবে। কারণ কুরআনের পরিভাষায়

যাকে "ইকামাতে সালাত" বলা হয় জামায়াতের সাথে নামায পড়া অনিবার্যভাবে তার অন্তরভুক্ত রয়েছে।

৮৫. অর্থাৎ বর্তমানে ঈমানদারদের ওপর যে হতাশা, ভীতি-বিহ্বলতা ও নিস্তেজ-নিস্পৃহ ভাব ছেয়ে আছে তা দূর করে দাও। তাদেরকে আশান্বিত করো। তাদেরকে উৎসাহিত ও উদ্যমশীল করো। 'সুখবর দাও' বাক্যাটির মধ্যে এসব অর্থ রয়েছে।

৮৬. ওপরের আয়াতগুলো হযরত মূসার দাওয়াতের প্রথম যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে। এ দোয়াটি হচ্ছে মিসরে অবস্থানকালের একেবারে শেষ সময়ের। মাঝখানে কয়েক বছরের দীর্ঘ ব্যবধান। এ সময়কার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নেই। তবে কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ মাঝখানের যুগেরও বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৮৭. অর্থাৎ আড়ম্বর, শান-শওকত ও সাংস্কৃতিক জীবনের এমন চিত্তাকর্ষক চাকচিক্য, যার কারণে দুনিয়ার মানুষ তাদের ও তাদের রীতি-নীতির মোহে মত্ত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের পর্যায়ে পৌঁছার আকাঙ্খা করতে থাকে।

৮৮. অর্থাৎ উপায়-উপকরণ, যেগুলোর প্রাচুর্যের কারণে নিজেদের কলা-কৌশলসমূহ কার্যকর করা তাদের জন্য সহজসাধ্য ছিল এবং যেগুলোর অভাবে সত্যপন্থীরা নিজেদের যাবতীয় কর্মসূচী কার্যকর করতে অক্ষম ছিল।

৮৯. যেমন একটু আগেই আমি বলেছি, এ দোয়াটি হযরত মূসা (আ) করেছিলেন তাঁর মিসরে অবস্থানের একেবারে শেষ সময়ে। এটি তিনি এমন সময় করেছিলেন যখন একের পর এক সকল নিদর্শন দেখে নেবার এবং দীনের সাক্ষ প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবার পরও ফেরাউন ও তার রাজসভাসদরা সত্যের বিরোধিতায় চরম হঠকারিতার সাথে অবিচল ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে পয়গম্বর যে বদদোয়া করেন তা কুফরীর ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে হঠকারিতার ভূমিকা অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহর নিজের ফায়সালারই অনুরূপ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদেরকে আর ঈমান আনার সুযোগ দেয়া হয় না।

৯০. যারা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত নয় এবং আল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্য ও মানব কল্যাণ নীতি বুঝে না, তারা মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যের দুর্বলতা, সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টাকারীদের অনবরত ব্যর্থতা এবং বাতিল মতাদর্শের নেতৃবৃন্দের বাহ্যিক আড়ম্বর, ঐশ্বর্য ও তাদের পার্থিব সাফল্য দেখে ধারণা করতে থাকে, হয়তো মহান আল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীদেরকে এ দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্বশীল দেখতে চান। তারা মনে করে, হয়তো আল্লাহ স্বয়ং মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে সমর্থন করতে চান না, তারপর এ মূর্খের দল শেষ পর্যন্ত নিজেদের বিভ্রান্তিকর অনুমানের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম আসলে অর্থহীন এবং এ অবস্থায় কুফরী ও ফাসেকী শাসনের আওতায় দীনের পথে চলার যে সামান্যতম অনুমতিটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এ আয়াতে মহান আল্লাহ হযরত মূসা ও তাঁর অনুসারীদেরকে এ ভ্রান্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদ করেছেন। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সবরের সাথে নিজেদের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করে যাও। সাধারণত মূর্খ ও অজ্ঞরা এ ধরনের অবস্থায় যে বিভ্রান্তির শিকার হয় তোমরাও যেন তেমনি বিভ্রান্ত না হও।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۭ حَتّٰٓي اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ اٰۗلْــٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝

আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করে নিয়ে গেলাম। তারপর ফেরাউন ও তার সেনাদল জুলুম–নির্যাতন ও সীমালংঘন করার উদ্দেশ্যে তাদের পেছনে চললো। অবশেষে যখন ফেরাউন ডুবতে থাকলো তখন বলে উঠলো, "আমি মেনে নিলাম, বনী ইসরাঈল যার ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আমিও আনুগত্যের শির নতকারীদের অন্তরভুক্ত।[৯১] *(জবাব দেয়া হলো) "এখন ঈমান আনছো! অথচ এর আগে পর্যন্ত তুমি নাফরমানী চালিয়ে এসেছো এবং তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন ছিলে। এখন তো আমি কেবল তোমার লাশটাকেই রক্ষা করবো যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন হয়ে থাকো।*[৯২] *যদিও অনেক মানুষ এমন আছে যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে উদাসীন।"*[৯৩]

৯১. বাইবেলে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। তবে তালমূদে বলা হয়েছে, ডুবে যাওয়ার সময় ফেরাউন বলেছিল ঃ "আমি তোমার ওপর ঈমান আনছি। হে প্রভু! তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

৯২. সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম সাগর তীরে যেখানে ফেরাউনের লাশ সাগরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল আজো সে জায়গাটি অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমান সময়ে এ জায়গাটির নাম জাবালে ফেরাউন বা ফেরাউন পর্বত। এরি কাছাকাছি আছে একটি গরম পানির ঝরণা। স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছে হাম্মামে ফেরাউন। এর অবস্থান স্থল হচ্ছে আবু যানীমার কয়েক মাইল ওপরে উত্তরের দিকে। স্থানীয় লোকেরা এ জায়গাটি চিহ্নিত করে বলে, ফেরাউনের লাশ এখানে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

এ ডুবন্ত ব্যক্তি যদি মিনফাতাহ ফেরাউন হয়ে থাকে, যাকে আধুনিক গবেষণায় মূসার আমলের ফেরাউন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাহলে এর লাশ এখনো কায়রোর যাদু ঘরে রয়েছে। ১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটিন এলিট স্মিথ তার মমির ওপর থেকে যখন পট্টি খুলেছিলেন তখন তার লাশের ওপর লবনের একটি স্তর জমাটবাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এটি লবণাক্ত পানিতে তার ডুবে যাওয়ার একটি সুস্পষ্ট আলামত ছিল।

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۭ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

১০ রুকু'

বনী ইসরাঈলকে আমি খুব ভালো আবাসভূমি দিয়েছি[৯৪] এবং অতি উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ তাদেরকে দান করেছি। তারপর যখন তাদের কাছে জ্ঞান এসে গেলো, তখনই তারা পরস্পরে মতভেদ করলো[৯৫] নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই জিনিসের ফায়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত ছিল।

এখন যদি তোমার সেই হিদায়াতের ব্যাপারে সামান্যও সন্দেহ থেকে থাকে যা আমি তোমার ওপর নাযিল করেছি তাহলে যারা আগে থেকেই কিতাব পড়ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও। প্রকৃতপক্ষে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ কিতাব মহাসত্য হয়েই এসেছে। কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো না এবং যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের মধ্যেও শামিল হয়ো না, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।[৯৬]

৯৩. অর্থাৎ আমি তো শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক নিদর্শনসমূহ দেখিয়েই যেতে থাকবো, যদিও বেশীর ভাগ লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বড় বড় শিক্ষণীয় নিদর্শন দেখেও তাদের চোখ খোলে না।

৯৪. অর্থাৎ মিসর থেকে বের হবার পর ফিলিস্তিন।

৯৫. এর অর্থ হচ্ছে, পরবর্তী পর্যায়ে তারা নিজেদের দীনের মধ্যে যে দলাদলি শুরু করে এবং নতুন নতুন মাযহাব তথা ধর্মীয় চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটায় তার কারণ এ ছিল না যে, তারা প্রকৃত সত্য জানতো না এবং এ না জানার কারণে তারা বাধ্য হয়ে এমনটি করে। বরং আসলে এসব কিছুই ছিল তাদের দুর্বৃত্তসুলভ চরিত্রের ফসল। আল্লাহর পক্ষ থেকে

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ
حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا
إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

আসলে যাদের ব্যাপারে তোমার রবের কথা সত্য সাব্যস্ত হয়েছে[৯৭] তাদের সামনে যতই নিদর্শন এসে যাক না কেন তারা কখনই ঈমান আনবে না যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব চাক্ষুস দেখে নেবে। এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি যে, একটি জনবসতি চাক্ষুস আযাব দেখে ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার জন্য সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে? ইউনুসের কওম ছাড়া[৯৮] (এর কোন নজির নেই) তারা যখন ঈমান এনেছিল তখন অবশ্যি আমি তাদের ওপর থেকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনার আযাব হটিয়ে দিয়েছিলাম[৯৯] এবং তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম।[১০০] যদি তোমার রবের ইচ্ছা হতো (যে, যমীনে সবাই হবে মুমিন ও অনুগত) তাহলে সারা দুনিয়াবাসী ঈমান আনতো।[১০১] তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য লোকদের ওপর জবরদস্তি করবে?[১০২] আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউই ঈমান আনতে পারে না।[১০৩] আর আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না তাদের ওপর কলুষতা চাপিয়ে দেন।[১০৪]

তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছিল ঃ এ হচ্ছে সত্য দীন, এ হচ্ছে তার মূলনীতি, এগুলো—এর দাবী ও চাহিদা, এগুলো হচ্ছে কুফর ও ইসলামের পার্থক্য সীমা, একে বলে আনুগত্য। আর এর নাম হচ্ছে গোনাহ, এসব জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং এসব নিয়মনীতির ভিত্তিতে দুনিয়ায় তোমার জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু এ সুস্পষ্ট হেদায়াত সত্ত্বেও তারা একটি দীনকে অসংখ্য দীনে পরিণত করে এবং আল্লাহর দেয়া বুনিয়াদগুলো বাদ দিয়ে অন্য বুনিয়াদের ওপর নিজেদের ধর্মীয় ফেরকার প্রাসাদ নির্মাণ করে।

৯৬. বাহ্যত এ সম্বোধনটা করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু আসলে যারা তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল তাদেরকে শুনানোই মূল

উদ্দেশ্য। এ সংগে আহলি কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের সাধারণ মানুষ যথার্থই আসমানী কিতাবের জ্ঞানের সাথে মোটেই পরিচিত ছিল না। তাদের জন্য এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন আওয়াজ। কিন্তু আহলি কিতাবদের আলেমদের মধ্যে যারা ধর্মভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ মননশীলতার অধিকারী ছিলেন তারা একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিতে পারতেন যে, কুরআন যে জিনিসটির দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে পূর্ববর্তী যুগের সকল নবী তারই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন।

৯৭. সে কথাটি হচ্ছে এই যে, যারা নিজেরাই সত্যের অন্বেষী হয় না এবং যারা নিজেদের মনের দুয়ারে জিদ, হঠকারিতা, অন্ধগোষ্ঠী প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ-বিদ্বেষের তালা ঝুলিয়ে রাখে আর যারা দুনিয়া প্রেমে বিভোর হয়ে পরিণামের কথা চিন্তাই করে না তারাই ঈমান লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

৯৮. ইউনুস আলাইহিস সালাম (যাঁকে বাইবেলে যোনা নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাঁর সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ৮৬০ থেকে ৭৮৪ সালের মাঝামাঝি সময় বলা হয়ে থাকে) যদিও বনী ইসরাঈলী নবী ছিলেন তবুও তাঁকে আসিরিয়াবাসীদের হেদায়াতের জন্য ইরাকে পাঠানো হয়েছিল। এ কারণে আসিরীয়দেরকে এখানে ইউনুসের কওম বলা হয়েছে। সে সময় এ কওমের কেন্দ্র ছিল ইতিহাস খ্যাত নিনোভা নগরী। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। দাজলা নদীর পূর্ব তীরে আজকের মুসেল শহরের ঠিক বিপরীত দিকে এ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ এলাকায় ইউনুস নবী নামে একটি স্থান আজো বর্তমান রয়েছে। এ জাতির রাজধানী নগরী নিনোভা প্রায় ৬০ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত ছিল। এ থেকে এদের জাতীয় উন্নতির বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে।

৯৯. কুরআনে এ ঘটনার দিকে তিন জায়গায় শুধুমাত্র ইংগিত করা হয়েছে। কোন বিস্তারিত বিবরণ সেখানে দেয়া হয়নি। (দেখুন আম্বিয়া ৮৭-৮৮ আয়াত, আস্ সাফ্ফাত ১৩৯-১৪৮ আয়াত ও আল কলম ৪৮-৫০ আয়াত) তাই "আযাবের ফায়সালা হয়ে যাবার পর কারোর ঈমান আনা তার জন্য উপকারী হয় না।" আল্লাহ তার এ আইন থেকে হযরত ইউনুসের কওমকে কোন্ কোন্ কারণে নিষ্কৃতি দেন তা নিশ্চয়তার সাথে বলা সম্ভব নয়। বাইবেলে "যোনা ভাববাদীর পুস্তক" নাম দিয়ে যে সংক্ষিপ্ত সহীফা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে কিছু বিবরণ পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে তা নির্ভরযোগ্য নয়। প্রথমত তা আসমানী সহীফা নয় এবং ইউনুস আলাইহিস সালামের লেখাও নয়। বরং তাঁর তিরোধানের চার পাঁচশো বছর পর কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ইউনুসের ইতিহাস হিসেবে লিখে এটিকে পবিত্র গ্রন্থসমূহের অন্তরভুক্ত করেন। দ্বিতীয়ত এর মধ্যে কতক একেবারেই আজেবাজে কথাও পাওয়া যায়। এগুলো মেনে নেবার মত নয়। তবুও কুরআনের ইশারা ও ইউনুসের সহীফার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে কুরআনের তাফসীরকারগণ যে কথা বলেছেন তাই সঠিক বলে মনে হয়। তারা বলেছেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যেহেতু আযাবের ঘোষণা দেবার পর আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই নিজের আবাসস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন তাই আযাবের লক্ষণ দেখে যখন আসিরীয়রা তওবা করলো এবং গোনাহের জন্য ক্ষমা চাইলো তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কুরআন মজীদে আল্লাহর বিধানের যে মৌল নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে তার একটি স্বতন্ত্র ধারা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ কোন

জাতিকে ততক্ষণ আযাব দেন না যতক্ষণ না পূর্ণাঙ্গ দলীল–প্রমাণ সহকারে সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলেন। কাজেই নবী যখন সংশ্লিষ্ট জাতির জন্য নির্ধারিত অবকাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উপদেশ বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারেননি এবং আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজ দায়িত্বে হিজরাত করে চলে গেছেন তখন আল্লাহর সুবিচার নীতি এ জাতিকে আযাব দেয়া সমীচীন মনে করেনি। কারণ তার কাছে পূর্ণাঙ্গ দলীল–প্রমাণ সহকারে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার আইনগত শর্তাবলী পূর্ণ হতে পারেনি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আস্ সাফ্ফাত–এর ব্যাখ্যা ৮৫ টীকা)।

১০০. ঈমান আনার পর এ জাতিটির আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হলো। পরে তারা আবার চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে ভুল পথে পা বাড়ানো শুরু করলো। নাহোম নবী (খৃষ্টপূর্ব ৭২০–৬৯৮) এ সময় তাদেরকে সতর্ক করলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। তারপর সফনীয় নবীও (খৃষ্টপূর্ব ৬৪০–৬০৯) তাদেরকে শেষবারের মত সতর্ক করলেন। তাও কার্যকর হলো না। শেষ পর্যন্ত ৬১২ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে আল্লাহ তাদের ওপর মিডিয়াবাসীদের আগ্রাসন সংঘটিত করালেন। মিডিয়ার বাদশাহ ব্যাবিলনবাসীদের সহায়তায় আসিরিয়া এলাকা আক্রমণ করলেন। আসিরীয় সেনাদল পরাজিত হয়ে রাজধানী নিনোভায় অন্তরীণ হলো। কিছুকাল পর্যন্ত তারা জোরেশোরে মোকাবিলা করলো। তারপর দাজলায় এলো বন্যা। এ বন্যায় নগর প্রাচীর ধ্বসে পড়লো। সংগে সংগে আক্রমণকারীরা নগরে প্রবেশ করলো এবং পুরো শহর জ্বালিয়ে ভস্ম করলো। আশপাশের এলাকারও একই দশা হলো। আসিরীয়ার বাদশাও নিজের মহলে আগুন লাগিয়ে তাতে পুড়ে মরলো। আর এ সাথে আসিরীয় রাজত্ব ও সভ্যতারও ইতি ঘটলো চিরকালের জন্য। আধুনিক কালে এ এলাকায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খননের যে প্রচেষ্টা চলেছে, তাতে এখানে অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেছে।

১০১. অর্থাৎ আল্লাহ যদি চাইতেন যে, এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র তাঁর আদেশ পালনকারী অনুগতরাই বাস করবে এবং কুফরী ও নাফরমানীর কোন অস্তিত্বই থাকবে না তাহলে তাঁর জন্য সারা দুনিয়াবাসীকে মুমিন ও অনুগত বানানো কঠিন ছিল না এবং নিজের একটি মাত্র সৃজনী ইংগিতের মাধ্যমে তাদের অন্তর ঈমান ও আনুগত্যে ভরে তোলাও তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু মানব জাতিকে সৃষ্টি করার পেছনে তাঁর যে প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্য কাজ করছে এ প্রাকৃতিক বল প্রয়োগে তা বিনষ্ট হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ নিজেই ঈমান আনা বা না আনা এবং আনুগত্য করা বা না করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীন রাখতে চান।

১০২. এর অর্থ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে জোর করে মুমিন বানাতে চাচ্ছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এমনটি করতে বাধা দিচ্ছিলেন। আসলে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আমরা যে বর্ণনা পদ্ধতি পাই এ বাক্যেও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখি, সম্বোধন করা হয়েছে বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিন্তু আসলে নবীকে সম্বোধন করে যে কথা বলা হয় তা লোকদেরকে শুনানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানে যা কিছু বলতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হে লোকেরা! যুক্তি–প্রমাণের সাহায্যে হেদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার এবং সঠিক পথ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেবার যে দায়িত্ব ছিল তা আমার নবী পুরাপুরি পালন করেছেন। এখন যদি তোমরা নিজেরাই সঠিক পথে চলতে না চাও

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

তাদেরকে বলো, "পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে চোখ মেলে দেখো।" আর যারা ঈমান আনতেই চায় না তাদের জন্য নিদর্শন ও উপদেশ–তিরস্কার কীইবা উপকারে আসতে পারে।[১০৫] এখন তারা এছাড়া আর কিসের প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের আগে চলে যাওয়া লোকেরা যে দুঃসময় দেখেছে তারাও তাই দেখবে? তাদেরকে বলো, "ঠিক আছে, অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।" তারপর (যখন এমন সময় আসে তখন) আমি নিজের রসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষা করি। এটিই আমার রীতি। মুমিনদের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।

এবং তোমাদের সঠিক পথে চলা যদি এর ওপর নির্ভরশীল হয় যে, কেউ তোমাদের ধরে বেঁধে সঠিক পথে চালাবে, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত, নবীকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এভাবে জবরদস্তি ঈমান আনা যদি আল্লাহর অভিপ্রেত হতো তাহলে এ জন্য নবী পাঠাবার কি প্রয়োজন ছিল? এ কাজ তো তিনি নিজেই যখন ইচ্ছা করতে পারতেন।

১০৩. অর্থাৎ সমস্ত নিয়ামত যেমন আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানাধীন এবং আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন নেয়ামতও নিজে লাভ করতে বা অন্যকে দান করতে পারে না ঠিক তেমনিভাবে এ ঈমানের নিয়ামতও আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানাধীন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ঈমানদার হওয়া এবং তার সত্য–সঠিক পথের সন্ধান লাভ করাও আল্লাহর অনুমতির ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন ব্যক্তি এ নিয়ামতটি নিজে লাভ করতে পারে না এবং কোন মানুষ ইচ্ছা করলে কাউকে এ নিয়ামতটি দান করতেও পারে না। কাজেই নবী যদি লোকদেরকে মুমিন বানাবার জন্য একান্ত আন্তরিকভাবে কামনাও করেন তাহলেও তাঁর জন্য আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য সুযোগ দানেরও প্রয়োজন হয়।

১০৪. এখানে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর অনুমতি ও তাঁর সুযোগ দান অন্ধভাবে বিচার–বিবেচনা ছাড়াই সম্পন্ন হয় না। কোন রকম মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া এবং কোন প্রকার যুক্তিসংগত নিয়ম–কানুন ছাড়াই যেভাবে ইচ্ছা এবং যাকে ইচ্ছা এ নিয়ামতটি লাভ করার সুযোগ দেয়াও হয় না এবং যাকে ইচ্ছা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিতও করা হয় না। বরং এর একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ নিয়ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানে নিজের

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১১ রুকূ'

হে নবী! বলে দাও,[১০৬] "হে লোকেরা! যদি তোমরা এখনো পর্যন্ত আমার দীনের ব্যাপারে কোন সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে শুনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের বন্দেগী করো আমি তাদের বন্দেগী করি না বরং আমি কেবলমাত্র এমন আল্লাহর বন্দেগী করি যার করতলে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু।[১০৭] আমাকে মুমিনদের অন্তরভুক্ত হবার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে। আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ঠিকভাবে এ দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো[১০৮] এবং কখ্খনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।[১০৯] আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোন সত্তাকে ডেকো না, যে তোমার না কোন উপকার করতে না ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি এমনটি করো তাহলে জালেমদের দলভুক্ত হবে।

বুদ্ধিবৃত্তিকে নির্দ্বিধায় যথাযথভাবে ব্যবহার করে তার জন্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যে পৌঁছে যাবার কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ তার নিজের প্রচেষ্টা ও চাহিদার অনুপাতে সরবরাহ করে দেয়া হয় এবং তাকেই সঠিক জ্ঞান লাভ করার ও ঈমান আনার সুযোগ দান করা হয়। আর যারা সত্যসন্ধই নয় এবং নিজেদের বুদ্ধিকে অন্ধগোষ্ঠী প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ-বিদ্বেষের ফাঁদে আটকে রাখে অথবা আদৌ তাকে সত্যের সন্ধানে ব্যবহারই করে না তাদের জন্য আল্লাহর নিয়তির ভাণ্ডারে মূর্খতা, অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টি ও ত্রুটিপূর্ণ কর্মের আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা নিজেদেরকে এ ধরনের আবর্জনা ও অপবিত্রতার যোগ্য করে এবং এটিই হয়ে যায় তাদের নিয়তির লিখন।

১০৫. ঈমান আনার জন্য তারা যে দাবীটিকে শর্ত হিসেবে পেশ করতো এটি হচ্ছে তার শেষ ও চূড়ান্ত জবাব। তাদের এ দাবীটি ছিল, আমাদের এমন কোন নিদর্শন দেখাও যার ফলে তোমার নবুওয়াতকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারি। এর জবাবে বলা হচ্ছে, যদি তোমাদের মধ্যে সত্যের আকাংখা এবং সত্য গ্রহণ করার আগ্রহ থাকে তাহলে পৃথিবী ও আকাশের চারদিকে যে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এগুলো মুহাম্মাদের

বাণীর সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের নিশ্চিন্ত করার জন্য শুধু যথেষ্ট নয় বরং তার চাইতেও বেশী। শুধুমাত্র চোখ খুলে সেগুলো দেখার প্রয়োজন। কিন্তু যদি এ চাহিদা ও আগ্রহই তোমাদের মধ্যে না থাকে, তাহলে অন্য কোন নিদর্শন, তা যতই অলৌকিক, অটল ও চিরন্তন রীতি ভংগকারী এবং বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চর্য হোক না কেন, তোমাদেরকে ঈমানের নিয়ামত দান করতে পারে না। প্রত্যেকটি মু'জিযা দেখে তোমরা ফেরাউন ও তার কওমের সরদারদের মতই বলবে, এ তো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। এ রোগে যারা আক্রান্ত হয় তাদের চোখ কেবলমাত্র তখনই খুলে থাকে যখন ক্রোধ, রোষবহ্নি ও গযব তার বিভীষিকাময় কঠোরতা সহকারে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠিক এমনিভাবে ডুবে যাবার সময় ফেরাউনের চোখ খুলেছিল। কিন্তু একেবারে পাকড়াও করার সময় শেষ মুহূর্তে যে তওবা করা হয় তার কোন দাম নেই।

১০৬. যে বক্তব্য দিয়ে ভাষণ শুরু করা হয়েছিল এখন আবার তারই মাধ্যমে ভাষণ শেষ করা হচ্ছে। তুলনামূলক পাঠের জন্য প্রথম রুকূ'র আলোচনার ওপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিন।

১০৭. মূল আয়াতে يَتَوَفّٰكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে "যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন।" কিন্তু এ শাব্দিক অনুবাদ থেকে আসল মর্মবাণীর প্রকাশ হয় না। এ উক্তির মর্মবাণী হচ্ছে এই যে, "তোমাদের প্রাণ যে সত্তার করতলগত, যিনি তোমাদের ওপর এমনই পূর্ণাঙ্গ শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী যে, যতক্ষণ তিনি ইচ্ছা করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জীবনী শক্তি লাভ করতে পারো এবং তাঁর ইশারা হবার সাথে সাথেই তোমাদের নিজেদের প্রাণ সেই প্রাণ স্রষ্টার হাতে সোপর্দ করে দিতে হয়, আমি কেবলমাত্র সেই সত্তারই উপাসনা, বন্দেগী ও দাসত্ব এবং আনুগত্য করার ও হুকুম মেনে চলার কথা বলি। এখানে আরো একটি কথা বুঝে নিতে হবে। মক্কার মুশরিকরা একথা মানতো এবং আজো সকল শ্রেণীর মুশরিকরা একথা স্বীকার করে যে, মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইখতিয়ারাধীন। এর ওপর অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। এমনকি এ মুশরিকরা যেসব মনীষীকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতায় শরীক করে তাদের কেউই যে তাদের মৃত্যুর সময় পিছিয়ে দিতে পারেনি, তাদের ব্যাপারে একথাও তারা স্বীকার করে। কাজেই বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্য থেকে অন্য কোন গুণের কথা বর্ণনা করার পরিবর্তে এ বিশেষ গুণটি যে, "যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন" এখানে বর্ণনা করার জন্য এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়েছে যে, নিজের দৃষ্টিভংগী বর্ণনা করার সাথে সাথে তার সঠিক হওয়ার যুক্তিও এর মাধ্যমে এসে যাবে। অর্থাৎ সবাইকে বাদ দিয়ে আমি একমাত্র তাঁর বন্দেগী করি এ জন্য যে, জীবন ও মৃত্যুর ওপর একমাত্র তাঁরই কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তাঁর ছাড়া অন্যের বন্দেগী করবোই বা কেন, তারা তো অন্য কারোর জীবন-মৃত্যু তো দূরের কথা খোদ তাদের নিজেদেরই জীবন-মৃত্যুর ওপর কোন কর্তৃত্ব রাখে না। তাছাড়া আলংকারিক মাধুর্যকেও এখানে এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে যে, "তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন" না বলে বলা হয়েছে, "তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন।" এভাবে একটি বাক্যের সাহায্যে মূল বক্তব্য বিষয়, বক্তব্যের স্বপক্ষের যুক্তি এবং বক্তব্যের প্রতি আহবান তিনটিই সম্পন্ন করা হয়েছে। যদি বলা হতো, "আমি এমন সত্তার বন্দেগী করি যিনি আমাকে মৃত্যু দান

করবেন" তাহলে এর অর্থ কেবল এতটুকুই হতো যে, "আমার তাঁর বন্দেগী করা উচিত।" তবে এখন যে কথা বলা হয়েছে যে, "আমি এমন এক সত্তার বন্দেগী করি যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন",—এর অর্থ হবে, শুধু আমারই নয় তোমাদেরও তাঁর বন্দেগী করা উচিত আর তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করে ভুল করে যাচ্ছো।

১০৮. এ দাবী কত জোরালো, তা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। বক্তব্য এভাবেও বলা যেতো, "তুমি এ দীন অবলম্বন করো" অথবা "এ দীনের পথে চলো" কিংবা "এ দীনের অনুগত ও অনুসারী হয়ে যাও।" কিন্তু মহান আল্লাহ এ বর্ণনাভংগীকে ঢিলেঢালা সাব্যস্ত করেছেন। এ দীন যেমন অবিচল ও তেজোদ্দীপ্ত আনুগত্য চায় এ দুর্বল শব্দসমূহের সাহায্যে তা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাই নিজের দাবী তিনি নিম্নোক্ত শব্দাবলীর মাধ্যমে পেশ করেছেন ঃ

اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

এখানে اقم وجهك এর শাব্দিক মানে হচ্ছে, "নিজের চেহারাকে স্থির করে দাও।" এর অর্থ, তুমি একই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো। নড়াচড়া করো না এবং এদিক ওদিক ফিরো না। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুড়ে যেয়ো না। একেবারে নাক বরাবর সোজা পথে দৃষ্টি রেখে চলো, যেপথ তোমাকে দেখানো হয়েছে। এটি বড়ই শক্ত বাঁধন ছিল। কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি। এর ওপর আরো একটু বাড়তি বাঁধন দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে حنيفا অর্থাৎ সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র একদিকে মুখ করে থাকো। কাজেই দাবী হচ্ছে, এ দীন, আল্লাহর বন্দেগীর এ পদ্ধতি এবং জীবন যাপন প্রণালীর ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের উপাসনা-আরাধনা, ইবাদাত-বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য করতে ও হুকুম মেনে চলতে হবে। এমন একনিষ্ঠভাবে করতে হবে যে, অন্য কোন পদ্ধতির দিকে সামান্যতম ঝুঁকে পড়াও যাবে না। যেসব পথ তুমি ইতিপূর্বে পরিত্যাগ করে এসেছো এ পথে এসে সেই ভুল পথগুলোর সাথে সামান্যতম সম্পর্কও রাখবে না এবং দুনিয়ার মানুষ যেসব বাঁকা পথে চলেছে সেসব পথের দিকে একবার ভুল করেও তাকাবে না।

১০৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে কোনভাবে অন্য কাউকে শরীক করে কখ্খনো তাদের অন্তরভুক্ত হয়ো না। এ অন্য কেউ তারা নিজেরাও হতে পারে আবার অন্য কোন মানুষ, মানব গোষ্ঠী, কোন আত্মা, জিন, ফেরেশতা অথবা কোন বস্তুগত, কাল্পনিক বা আনুমানিক সত্তাও হতে পারে। কাজেই পূর্ণ অবিচলতা সহকারে নির্ভেজাল তাওহীদের পথ অনুসরণ করার মত ইতিবাচক পদ্ধতির মধ্যেই শুধু দাবীকে আটকে রাখা হয়নি। বরং নেতিবাচক অবস্থার ক্ষেত্রে এমনসব লোকের থেকে আলাদা হয়ে যাবার দাবী জানানো হয়েছে যারা কোন না কোন প্রকারে শিরক করে থাকে। শুধু আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয় কাজে-কর্মে ও ব্যক্তি জীবন ধারায়ই নয় সামষ্টিক জীবন বিধানের ক্ষেত্রেও, ইবাদাতগাহ ও উপাসনালয়েই নয় শিক্ষায়তনেও, আদালত গৃহে, আইন প্রণয়ন পরিষদে, রাজনৈতিক মঞ্চে, অর্থনৈতিক বাজারে সর্বত্রই যারা নিজেদের চিন্তা ও কর্মের সমগ্র ব্যবস্থাই আল্লাহর আনুগত্য ও গায়রুল্লাহর আনুগত্যের মিশ্রণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। সব জায়গায়ই তাদের

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

যদি আল্লাহ তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে, এ বিপদ দূর করতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, "হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। এখন যারা সোজা পথ অবলম্বন করবে তাদের সোজা পথ অবলম্বন তাদের জন্যই কল্যাণকর হবে। এবং যারা ভুল পথ অবলম্বন করবে তাদের ভুল পথ অবলম্বন তাদের জন্যই ধ্বংসকর হবে। আর আমি তোমাদের ওপর হাবিলদার হয়ে আসিনি।" হে নবী! তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে যে হেদায়াত পাঠানো হচ্ছে তুমি তার অনুসরণ করো। আর আল্লাহ ফায়সালা দান করা পর্যন্ত সবর করো এবং তিনিই সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

পদ্ধতি থেকে নিজেদের পদ্ধতি আলাদা করে নাও। তাওহীদের অনুসারীরা জীবনের কোন ক্ষেত্রে ও বিভাগেও শিরকের অনুসারীদের অনুসৃত পথে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তাদের শিরকের অনুসারীদের পেছনে চলার তো প্রশ্নই ওঠে না এবং এভাবে পেছনে চলার পরও তাদের তাওহীদবাদের দাবী ও চাহিদা নিশ্চিন্তে পূরণ হতে থাকবে একথা কল্পনাই করা যায় না।

তারপর শুধুমাত্র সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শিরক (শিরকে জলী) থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং অস্পষ্ট শিরক (শিরকে খফী) থেকেও পুরাপুরি ও কঠোরভাবে দূরে থাকারও আদেশ দেয়া হয়েছে। বরং অস্পষ্ট শিরক আরো বেশী বিপজ্জনক এবং তার ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আরো অনেক বেশী। কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি অস্পষ্ট শিরককে হাল্‌কা শিরক মনে করে থাকেন। তারা ধারণা করেন, এ ধরনের শিরকের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট শিরকের মত অতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ অস্পষ্ট (খফী) মানে হাল্‌কা নয় বরং গুপ্ত ও গোপনে লুকিয়ে থাকা। এখন চিন্তা করার ব্যাপার হচ্ছে, যে শত্রু

দিন-দুপুরে চেহারা উন্মুক্ত করে সামনে এসে যায় সে-ই বেশী বিপজ্জনক, না যে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বা বন্ধুর ছদ্মাবরণে এসে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছে সে-ই বেশী বিপজ্জনক? যে রোগের আলামত একেবারে পরিষ্কার দেখা যায় সেটি বেশী ধ্বংসকারক, না যেটি দীর্ঘকাল সুস্থতার ছদ্মাবরণে ভেতরে ভেতরে স্বাস্থ্যকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে সে-ই বেশী ধ্বংসকর? যে শিরককে প্রত্যেক ব্যক্তি এক নজর দেখেই বলে দেয় এটি শিরক তার সাথে তাওহীদী দীনের সংঘাত একেবারে মুখোমুখি। কিন্তু যে শিরককে বুঝতে হলে গভীর দৃষ্টি ও তাওহীদের দাবীসমূহের নিবিড় ও অতলস্পর্শী উপলব্ধি প্রয়োজন, সে তার অদৃশ্য শিকড়গুলো দীনের ব্যবস্থার মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যে, সাধারণ তাওহীদবাদীরা তা ঘুণাক্ষরেও টের পায় না তারপর ধীরে ধীরে অবচেতন পদ্ধতিতে সে দীনের সার পদার্থসমূহ এমনভাবে খেয়ে ফেলে যে, কোথাও কোন বিপদ-ঘন্টা বাজাবার সুযোগই আসে না।